প্রচ্ছদ শিল্পী : গৌতম রায় / প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেসন হাউস

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে / দে'জ পাবলিশিং
৩১/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড / কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী / সরস্বতী প্রেস
১২, পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরমকল্যাণভাজন—

ডক্‌টর শ্রীমান শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ডক্‌টর শ্রীমান সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৺সজনীকান্ত দাস
শ্রীমান নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূমের সাহিত্য-সেবকগণের

করকমলে

নিয়ত আশীর্ব্বাদক

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পদারেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্‌॥

বাল্যকাল হইতেই কীর্ত্তন শুনিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা সন তের শত পাঁচ সালে প্রথম প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া গণেশ দাসের কীর্ত্তন শুনি। তখন আমার বয়স নয় বৎসর। তৎপূর্ব্বেই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া রসিক দাসের কীর্ত্তন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর হইতে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার নানাস্থানে, বাঙ্গালার বাহিরে শ্রীধাম বৃন্দাবনাদি তীর্থক্ষেত্রে বহু কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন শুনিয়াছি। কীর্ত্তন যতবার শুনিয়াছি, শুনিবার পিপাসা উত্তরোত্তর বাড়িয়াছে। সে পিপাসা আজিও মিটে নাই। কীর্ত্তনের কথা ও স্থর আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাহার ফলে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনাই আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন হইয়াছে। কীর্ত্তন শুনিয়া পদাবলীর অনুসন্ধান করিয়াছি। অনুসন্ধান ব্যপদেশে ত্রিপুরা হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। অনেক নূতন পদ ও পদের নূতন পাঠ সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও কীর্ত্তনীয়াগণের সঙ্গে পাঠ ও ব্যাখ্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছি, এবং আজীবন যথাবুদ্ধি এই পাঠ ও ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছি।

পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি পাঠের ভাগ্যোদয় ঘটে। শুনিয়াছিলাম এই গ্রন্থদ্বয়ে লৌহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত রসায়ণ ও তাহার সার্থক প্রয়োগ পদ্ধতির পরিচয় আছে। পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম; দেখিলাম কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মানব হৃদয়ের ভাব-নিবহ কিরূপে ভগবদ্ভাবে রূপান্তরিত হইতে পারে, এই জীবনেই কেমন করিয়া জন্মান্তর ঘটে, এই দেহ সিদ্ধ দেহে, শ্রীভগবানের বিলাসমন্দিরে পরিণত হয়, শ্রীপাদ রূপ তাহার গোপন রহস্যের সন্ধান দান করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির সঙ্গে পদাবলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পদাবলী মন্ত্র, আর সিন্ধু ও নীলমণি তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতির আকর গ্রন্থ। অভিজ্ঞ রহস্যবেত্তা ও সুদক্ষ শিল্পীর সঙ্গলাভ করিয়াও

জীবন আমার ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু আমি সর্ব্বসাধারণকে ইহার সন্ধান দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। দুর্ভাগ্য,—দেশে এরূপ গ্রন্থের সমাদর নাই। বন্ধুবর শ্রীহরিদাস দাস (শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর) একক একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রকাশ করিয়া ঋণের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। শচীনন্দন বিদ্যানিধির উজ্জ্বলচন্দ্রিকা বীরভূম রতন-লাইব্রেরী হইতে কয়েকশত খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও এখন পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত কারণে এবং পদাবলীর পঠন-পাঠনেব জন্য তথা কীর্ত্তন গাহিতে ও শুনিতে হইলে যে যে বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, তত্তৎবিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মূলক 'পদাবলী-পরিচয়' গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার আশায় বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। অর্থাভাবে আমার চেষ্টা সফল হয় নাই। অপরের সাহায্য সংগ্রহেও বিফল মনোরথ হইয়াছি। অবশেষে প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েব শরণাপন্ন হই। তিনি ভার গ্রহণ না কবিলে এই পুস্তক প্রকাশিত হইত না। তিনি আমার বহুদিনের বন্ধু, তাঁহার নিকট আমি নানারূপে কৃতজ্ঞ। পুস্তক সংকলনে অগ্রজ প্রতিম প্রভুপাদ শ্রীল গৌরগোপাল ভাগবতভূষণ মহাশয়ের উপদেশে উপকৃত হইয়াছি। দেশ-বিদেশে সুপরিচিত প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক বন্ধু ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাচার্য্য সাহিত্য-বাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার মাত্র আমার প্রতিই প্রীতির পরিচয় নহে। বাঙ্গালার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম অবদানের প্রতি ইহা তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অপর এক উদাহরণ। অগ্রজ প্রতিম কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' হইতে 'পদাবলীর ছন্দ' ও 'পদাবলীর অলঙ্কার' অংশ দুইটি আমাকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। ডক্টর শ্রীমান্ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই পুস্তক সংকলনে আমি শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, অলঙ্কার-কৌস্তভ, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, রসমঞ্জরী (ভানুদত্ত ও পীতাম্বর দাস প্রণীত দুইখানি পৃথক গ্রন্থ) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। প্রধানতঃ উজ্জ্বলনীলমণির আধারেই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। উদাহরণমূলক অধিকাংশ পয়ার ত্রিপদী উজ্জ্বলচন্দ্রিকা হইতে গৃহীত।

পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পথপ্রদর্শক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আচার্য্য হরপ্রসাদ, জগবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সারদাচরণ মিত্র, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, রমণীমোহন মল্লিক, কালিদাস নাথ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ক্ষণদা গীতচিন্তামণি-সম্পাদক কৃষ্ণপদ দাস, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ কাবাসী, সতীশচন্দ্র রায় ও বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধা সহকাবে স্মরণ করিতেছি।

*　　*　　*　　*　　*

শিক্ষিত সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন গানের প্রচারে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে কীর্ত্তন শিক্ষা করিতে ও শিক্ষাদান করিতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, নিত্যধামগত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ বসু, জগদ্বন্ধু আশ্রমের শ্রীগোপীবন্ধু দাস, দেশবন্ধুর জামাতা স্বর্গগত সুধীরচন্দ্র রায় এবং কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী যথেষ্ট যত্ন লইয়াছেন। ব্রজবাসীর নাম চিরস্মরণীয়।

পুস্তক প্রকাশ জন্য কলিকাতায় অবস্থিতিকালে সঙ্গীতাভিজ্ঞ কীর্ত্তনানুরাগী স্নেহভাজন শ্রীমান্ রণীন্দ্রনাথ ঘোষ ও তদীয় পত্নী কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুকণাদেবীর (১৯৮, বিবেকানন্দ রোড) শ্রদ্ধা, স্নেহ ও যত্নে আমি আমার বয়স ও অসুস্থতার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদ প্রান্তে শ্রীমান্ ও শ্রীমতীর কল্যাণ কামনা করিতেছি।

আমার কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধামদনগোপাল প্রভু জীউ। এইজন্য একটি পদে আমি গোপালদাস ভণিতা দিয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নামও গোপাল। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ কাব্যতীর্থ এই পুস্তকের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। * * * পুস্তকপাঠে কাহারো কোন উপকার হইলে উদ্যম সার্থক মনে করিব।

সারদা কুটীর
কুড়মিঠা (বীরভূম)
১৩৫৯।২রা আশ্বিন
৺মহালয়া

বিনয়াবনত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় পদাবলী-পরিচয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মাত্র দশ শতখানি পুস্তক, নিঃশেষ হইতে দীর্ঘ সাত বৎসর লাগিল। অর্থাৎ বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীগণ মিলিয়া সাত বৎসরে এই দশ শত পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। অথচ উপন্যাস ছোটগল্প বৎসরে হাজার হাজার বিক্রীত হয়। কোন কোন উপন্যাসের এক বৎসরেই দুইটি সংস্করণ বিকাইয়া যায়। এই দিকে আমি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যাহা হউক আমার জীবদ্দশায়, সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইলাম। আমার মত অযোগ্যের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই অহৈতুকী কৃপায় নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

"অষ্টকালীয় নিত্যলীলা" এই সংস্করণের নূতন সংযোজন। রস ও ভাব পরিচ্ছেদে "রসের পরকীয়া" লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহাদের সুসম্পাদিত গ্রন্থ ধ্বন্যালোক গ্রন্থখানি আমাকে দান না করিলে ইহা সম্ভবপর হইত না। তাঁহাদের ধ্বন্যালোক বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট সম্পাদক যুগলের অভিনব অভ্যুদয় কামনা করিতেছি। ছাপার ভুলের জন্য শুদ্ধিপত্র দিতে বাধ্য হইয়াছি।

আমার দুরদৃষ্টবশতঃ প্রভুপাদ গৌর গোপাল, হরিদাস দাস ও হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ইহধাম হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশে শোকার্ত্ত অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি সমর্পণ করিলাম।

পরিশেষে বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া প্রীতিভাজন শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঘোষ কীর্ত্তন-রস-বারিধি এবং তাঁহার যোগ্যতমা সহধর্ম্মিণী কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুকণা দেবীকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ স্নেহ-সুমধুর আশ্রয় এবারেও আমাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীমতীর সেবা আমার জীবনের পাথেয় হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের, তাঁহাদের ভক্তবৃন্দের এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বর-তাল-লয়-শুদ্ধ রূপ গুণ ও লীলাগানের প্রচার শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমান্ ও শ্রীমতীর কল্যাণ কামনা করিতেছি।

ইতি—

সারদা কুটীর
কুড়মিঠা, (বীরভূম)
সন ১৩৬৬ সাল
তারিখ ২১শে ফাল্গুন
৺দোলযাত্রা, শ্রীগৌর পূর্ণিমা

বিনয়াবনত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

বিগত খ্রীষ্টীয় বর্ষশতকের প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালীকে তাহার ভাষার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল বিদেশীয় খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরির দ্বারা। গত শতকের প্রথম দশকেই কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংশোধিত সংস্করণ শ্রীরামপুরের বাপ্তিস্ত মিশন ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়, এবং এইভাবে গতানুগতিক পদ্ধতিতে (অর্থাৎ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে কেবল ধর্মগ্রন্থ রূপে) মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে, নবীন যুগের উপযোগী রীতিতে, তাহার সাহিত্যেব একখানি মহাগ্রন্থ বিশেষ ব্যাপকভাবে প্রচারলাভ করে। মুদ্রাযন্ত্রেব প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় উপলব্ধ অন্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর প্রতি প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, এবং দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই ছাপার অক্ষরে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল উঠিল, ও ধীরে-ধীরে অন্য গ্রন্থও সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়া জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। চতুর্থ দশকে এইরূপ লক্ষণীয় প্রকাশ হইতেছে কতকগুলি বৈষ্ণব মহাজন পদের সংগ্রহ। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই মুদ্রিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন, মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক পুষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া। কলিকাতার বটতলা-পল্লীর সুলভ-গ্রন্থ-প্রকাশক মণ্ডলীগুলি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, কতকগুলি পদাবলী সংগ্রহ, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, রামেশ্বরের শিবায়ন প্রভৃতি বই ছাপাইয়া, ফেরিওয়ালাদের মারফৎ গ্রামে-গ্রামে বিক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং ক্রেতারা জ্ঞাতসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে ও অজ্ঞাতসারে অন্যতম মুখ্য মানসিক রসায়ন-রূপে সাগ্রহে এগুলির পাঠ চিরাচরিত রীতিমত অব্যাহত রাখিলেন। কথক বা পুরাণ-পাঠক, বৈষ্ণব আখাড়া, সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী, কালীকীর্ত্তন-মণ্ডলী, রামায়ণ পদ্মপুরাণ ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতির গায়ক-মণ্ডলীর মতই, এই-সমস্ত বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থের অধ্যয়ন ও আলোচনা প্রাচীন ধারারই অন্তর্গত রহিল।

কিন্তু শিক্ষিত—অর্থাৎ সংস্কৃতে এবং ইংরেজীতে শিক্ষিত—বাঙ্গালীর কাছে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল্য তেমন ছিল না। তবে ইহাও লক্ষণীয় যে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন পূর্ণপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ, যিনি নিজ জীবনে প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি উভয়কেই মূর্ত করিয়াছিলেন, তিনি মাতৃভাষার সাহিত্যকে উপেক্ষা করেন নাই। বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন নূতন নূতন সুসাহিত্যের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া উহার প্রসার বৃদ্ধি করিলেন ও উহাকে উন্নত ও মার্জিত করিয়া তুলিলেন, তেমনই অন্যদিকে তিনি মেঘদূত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের মতই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সাহিত্যপ্রেমীর উপযোগী এক অভিনব সংস্করণ বাহির করিলেন। কিন্তু তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নাই।

প্রথম আসিল সাহিত্যে নব-নব সর্জনা। কারয়িত্রী প্রতিভা প্রথমে দেখা দিল, আমরা মধুসূদনের কাব্য ও নাটক, বঙ্কিমের উপন্যাস, ভূদেবের নিবন্ধ প্রভৃতি পাইলাম। তৎপরে দেখা দিল ভাবয়িত্রী দৃষ্টি—সাহিত্য-বিচার, নিজ মাতৃভাষায় এই নবীন সাহিত্য-সম্ভারের অধিকারী হইবার পরেই, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বলা চলে, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এই কার্য্যে জন বীম্‌স্ এবং জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন প্রমুখ দুই-চারি জন বিদেশী পণ্ডিতের কৌতূহল ও আগ্রহ অনেকটা জীয়ন-কাঠির কাজ করিয়াছিল। বিগত বর্ষশতকের অন্তিম দুই বর্ষদশকের মধ্যে, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কারে, অধ্যয়নে ও বিচারে আত্মনিয়োজিত হইল। রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮০ সালের পূর্বেই Arcydae (অর্থাৎ R C D এই ছদ্মনামে) ইংরেজীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন, জগবন্ধু ভদ্র মহাজন-পদাবলী বাহির করিলেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে বিদ্যাপতির সত্যকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলেন, এবং প্রথমে সারদাচরণ মিত্র বিদ্যাপতির ব্রজবুলী পদাবলী প্রকাশিত করিলেন ও পরে চুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সংগ্রহ' নাম দিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ-কথা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত করিলেন, এবং জগবন্ধু ভদ্র তাঁহার 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'তে বাঙ্গালীর কাছে চৈতন্য-চরিতের পদাবলীর প্রকাশ করিয়া দিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লিখিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলা

পুস্তকাগারের বার্ষিক সভায় নূতন করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদকারদিগের কথা শুনাইলেন, রমণীমোহন মল্লিক বিশেষ যত্ন-সহকারে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর সম্পাদনায় অবতীর্ণ হইলেন, এবং দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করিলেন। ওদিকে ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদও প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পুনরাবিষ্কার করিল, এবং এই সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও কবিদৃষ্টি-সম্পন্ন সমালোচকদের সহায়তায় নিজ সাংস্কৃতিক জীবনে এই প্রাচীন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া গবেষণা এখন উচ্চ শ্রেণীর মানসিক চর্য্যার অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে--উচ্চ কোটির শিক্ষায়, কলেজের শিক্ষায়, এতদিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার যোগ্য সমাদরপূর্ণ স্থান কতকটা পাইয়াছে। এই যোগ্য স্থানকে আরও সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করিবে প্রস্তুত "পদাবলী-পরিচয়" পুস্তকখানি।

রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান গৌরব যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব গীতিকবিতা, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, পথিকৃৎ কবি মধুসূদন, এবং স্বয়ং বিশ্বকবি বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব গীতিকবিতার মোহে পড়িয়া গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে শ্রেষ্ঠ কতকগুলি পদ চয়ন করিয়া 'পদরত্নাবলী' প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহার ভানুসিংহ ঠাকুরের 'পদাবলী' এই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যেরই অনুপ্রেরণার ফল। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যে কয়খানি শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রস-সর্জনা আছে, সেগুলি ততটা বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য নহে, যতটা বৈষ্ণব ও অন্য গীতিকবিতা। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য অপরিমেয়, কবিকঙ্কণের ও অন্য মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের কাব্য-সৃষ্টিতে মধ্যযুগের বাঙ্গালীর চরিত্রের ও সমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার, আশা ও আশঙ্কার চিত্র প্রতিফলিত আছে; এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যরস শিক্ষিত বিদগ্ধ জনেরই উপযোগী। কিন্তু বৈষ্ণব পদের মধ্যে, সহজিয়া বাউল প্রভৃতি গীতিকবিতার মধ্যে, নিখিল মানবের চিত্তমন্থনকারী রসবস্তু বিদ্যমান। সুতরাং আজকালকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় যে বৈষ্ণব পদাবলীর একটা বড় স্থান নির্ধারিত হইবে, তাহা বিচিত্র বা অনুচিত নহে।

এই গৌড়ীয় বা বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের একজন একপত্রী পণ্ডিত, গবেষক ও ব্যাখ্যাতা হইতেছেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যরত্ন। বিশেষ আনন্দের কথা, ইনি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের রসাস্বাদনে সহায়তা করিবার জন্য এই "পদাবলী-পরিচয়" পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পদাবলী সাহিত্যের পূর্ণ রস পাইতে হইলে, তাহার পারিপার্শ্বিক ও বাতাবরণ, তাহার ভাবধারা ও প্রকাশ-ভঙ্গী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। অধ্যাপনার সময়ে অধ্যাপকগণ নিশ্চয়ই আনুষঙ্গিক আবশ্যক বিষয়সমূহের যথাযথ বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি এই বিষয়ে একখানি Handbook-এর, যন্মধ্যে হস্তামলকবৎ সব কিছু সহজেই আয়ত্ত করিয়া দেখা যায়, তাহার আবশ্যকতা, ছাত্র ও সাধারণ পাঠক, গবেষক ও শিক্ষক, সকলেরই নিকট অনুভূত হইতেছিল। "পদাবলী-পরিচয়" সেই আবশ্যকতা বা অভাবকে অনেক অংশে দূরীভূত করিবে। ইহার বিভিন্ন অধ্যায়গুলির শীর্ষক বা শিরোনাম হইতে ইহার ক্ষেত্র ও উপযোগিতা বুঝা যাইবে ঃ—পদাবলী, পদাবলী-সাহিত্যের ভূমিকা, শ্রীগৌরচন্দ্র, কীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন, বিপ্রলম্ভ (অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস), সম্ভোগ, পদাবলীর নায়ক, পদাবলীর নায়িকা, শ্রীরাধা, সখী, দূতী, রস ও ভাব, পদাবলীর ছন্দ, পদাবলীর অলঙ্কার, সংকীর্ত্তনে বাদ্য ও নৃত্য। এই সূচী দৃষ্টে বইখানিকে 'পদাবলী-জগৎ'-এর একখানি সম্পুট বলা যাইতে পারে। যুবাবস্থায় কলেজে অধ্যয়নকালে যখন প্রথম পদাবলী সাহিত্যের অধ্যয়ন করি, তখন এইরূপ একখানি পথনির্দেশগ্রন্থ পাইলে কত না খুশী হইতাম! এ যুগের ছাত্র-ছাত্রী ও পদাবলী-রসিকগণ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণের মত পথপ্রদর্শক পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আমি অভিনন্দিত করি।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলি যে, এই বিষয়ে এই প্রকার সুযোগ্য পথ-প্রদর্শক দুর্লভ। ইনি যে কেবল পণ্ডিত, অর্থাৎ গ্রন্থ-বিলাসী, তাহা নহে, ইনি বহু দিবস ধরিয়া শ্রদ্ধার সহিত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা করিয়া, এই পদাবলী কীর্ত্তনের ধারার মধ্য দিয়াই নিজ পরিচয়ের পথ করিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারার মধ্য দিয়া নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অতি সহজেই গঠিত করিয়া লইয়াছেন, সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিও বর্জ্জন করেন নাই—শ্রদ্ধা ও

বিচারের এই সমন্বয় ইহার পদাবলী আলোচনাকে বিশেষরূপে মার্জিত ও দীপ্তিযুক্ত করিয়াছে।

আশা করি এই পুস্তকের উপযুক্ত সমাদর ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যপ্রেমী, সর্ববিধ পাঠক-সমাজে ও কীর্ত্তন-গায়ক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে হইবে, এবং এই পুস্তক পদাবলী-সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

"সুধর্ম্মা"
কলিকাতা
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক
মহালয়া, ১৩৫৯।২০০৯

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১। পদাবলী

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

—শ্রীগীতগোবিন্দ।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'পদাবলী' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশ্বসাহিত্যে 'পদাবলী' বাঙ্গালীর অন্যতম অবদান। রবীন্দ্র-পূর্ব্ববর্ত্তী যে কয়জন বাঙালী কবি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন—তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জন, রায়শেখর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, নরোত্তম-দাস, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং ভারতচন্দ্র অন্যতম। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যপ্রণেতা হইলেও বৈষ্ণব কবিগণের ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব কবি-গোষ্ঠীর শেষ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করি।

কবি জয়দেব স্বরচিত মধুর কোমলকান্ত সঙ্গীতের নাম দিয়াছেন "পদাবলী"। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই পদাবলী শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এবং পরবর্ত্তী কবি রায়শেখর কবিরঞ্জন প্রভৃতির রচিত সঙ্গীতসমূহ পদাবলী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিতগণের মতে পদাবলী শব্দটি দেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত। কিন্তু শব্দটি বহু পুরাতন। আচার্য্য ভরতের নাট্যসূত্রে "পদ" শব্দের উল্লেখ আছে।

মার্গ এবং দেশী ভেদে সঙ্গীত দ্বিবিধ। সঙ্গীতপারিজাতে উল্লিখিত আছে—

মার্গ-দেশীবিভেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচ্যতে।
বেধা মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায়াব্রবীৎ স্বয়ং॥
ব্রহ্মণোঽধীত্য ভরতং সঙ্গীতং মার্গসংজ্ঞিতম্।
অপ্সরাভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্।
তদ্দেশীয়মিতি প্রাহুঃ সঙ্গীতং দেশভেদতঃ॥

স্বয়ং ব্রহ্মা ভরতকে যে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই মার্গ-সঙ্গীত, আর অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ যে গান মহাদেবের সম্মুখে গাহিয়াছিলেন দেশভেদে তাহাই দেশীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু আচার্য্য মতঙ্গ স্ব-প্রণীত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

আলাপাদিনিবদ্ধো যঃ স চ মার্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আলাপাদিবিহীনস্তু স চ দেশী প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যাহা হউক, ভরত সঙ্গীতকে "গান্ধর্ব্ব" বলিয়াছেন, এবং এই গান্ধর্ব্বকলার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বাক্য ও সঙ্গীত দুই অর্থেই পদ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

গান্ধর্ব্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্।
গন্ধর্ব্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাৎ গান্ধর্ব্বমুচ্যতে॥
... ...
গান্ধর্ব্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্।
পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বরতালানুভাবকম্॥
যৎ কিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎ সর্ব্বং পদসংজ্ঞিতম্।
নিবদ্ধঞ্চানিবদ্ধঞ্চ তৎ পদং দ্বিবিধংস্মৃতম্॥

মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে সঙ্গীত অর্থে **'পদ'** শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—
"মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিত**পদং** গেয়মুদ্‌গাতুকামা"—(উত্তরমেঘ—২৫)।
আবার মেঘদূতে বাক্য অর্থেও 'পদ' শব্দের উল্লেখ আছে—"**ত্বামুৎকণ্ঠা** বিরচিত**পদং** মন্মুখেনেদমাহ" (উত্তর মেঘ—৪২)।

আচার্য্য ভরতের বহু পরবর্ত্তী শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী স্বপ্রণীত ভক্তিরত্নাকরে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতেও অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ গীতের উল্লেখ আছে। তিনিও সঙ্গীতের অঙ্গ নিরূপণে পদের উল্লেখ করিয়াছেন। অনিবদ্ধ গীত স রি গ ম আ তা না, রি প্রভৃতি স্বরালাপ। নিবদ্ধ গীত—

ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হইলে নিবদ্ধাখ্য হয়।
শুদ্ধ ছায়ালগ ক্ষুদ্র নিবদ্ধ এ ত্রয়।
... ...

নিরূপিল নিবদ্ধ গীতের ভেদত্রয়।
শুদ্ধ সালগ সংকীর্ণ ঐছে কেহ কয়।
... ...
কেহো কহে নিবদ্ধ গীতের সংজ্ঞাত্রয়।
প্রবন্ধ বস্তু রূপক এ প্রসিদ্ধ হয়॥

শুদ্ধ বা প্রবন্ধ গীতের চারি ধাতু এবং ছয়টি অঙ্গ। কেহ কেহ পাঁচটি ধাতুর কথা বলেন। ধা অতুর্থাৎ অবয়ব বা বিভাগের নাম উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। যাঁহারা পঞ্চ ধাতুর কথা বলেন তাঁহারা ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে একটি অংশের নাম দেন অন্তরা। সঙ্গীতের ছয়টি অঙ্গ—স্বর, বিরুদ, পদ, তেন, পাঠ, তাল। নরহরি বলিতেছেন—

স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল।
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল॥
স্বর স রি গ ম প ধা দিক নিরূপয়।
গুণ নাম যুক্ত মতে বিরুদ কহয়॥
পদ শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে।
তেনা তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে॥
পাঠ বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা ধিলঙ্গাদি।
তাল চচ্চৎপুট যত্যাদিক যথাবিধি॥
এ ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য্য নিরূপয়।
বাক্য স্বর তাল তেনা চারি কেহ কয়॥

স্বর—স রি গ ম ইত্যাদি আলাপ। বিরুদ—প্রশংসা বা গুণবাচক। পদ—যাহা অর্থ প্রকাশ করে, সুতরাং সঙ্গীতের সমস্ত অংশকেও পদ বলা যায়। তেন শব্দ মঙ্গলবাচক, পূর্ব্বে সঙ্গীতজ্ঞগণ "ওঁ হরি ওঁ" এইরূপ আলাপ করিতেন। পাঠ—বাদ্যর সঙ্গে মুখে "বোল" উচ্চারণ। তাল—পরিমিত সময়ে যতি বা বিরাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাক্য, স্বর, তাল ও তেনা এই যে চারি অঙ্গের কথা বলিয়াছেন—এখানে বাক্য ও পদ একার্থবাচক। শুদ্ধ বা প্রবন্ধ গীত পঞ্চ জাতিতে বিভক্ত।

প্রবন্ধের জাতি পঞ্চ মেদিনী নন্দিনী।
দীপনী পাবনী তারাবলী কহে মুনি ॥

ছয় অঙ্গযুক্ত গানের নাম মেদিনী, ইহাতে স্বর বিরুদাদি সমস্তই থাকিবে। স্বর, পদ, তেন, পাঠ, তাল এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত সঙ্গীত নন্দিনী ; বাক্য, স্বর, তেনা ও তালযুক্ত গান দীপনী ; বাক্য, স্বর ও তালযুক্ত গান পাবনী এবং বাক্য ও তালযুক্ত সঙ্গীত তারাবলী নামে অভিহিত হইবে। এই সমস্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় পদ শব্দটি প্রাচীন। সঙ্গীতের অপরনামই পদ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ।

আচার্য্য হরপ্রসাদ নেপাল হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা বৌদ্ধ গানের পুঁথি আনিয়া সন ১৩২৩ সালে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নাম দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। ভূমিকায় তিনি এই গানের নাম বলিয়াছেন "চর্য্যাপদ"। সুতরাং "পদ" শব্দটি যে হাজার বছর পূর্ব্বে চলিত ছিল, এবং তাহা গান অর্থেই ব্যবহৃত হইত, সে সম্বন্ধে তর্কের কোন অবসর নাই। চর্য্যাপদের সংস্কৃত টীকায় "ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নাহ", "দ্বিতীয় পদেন", "চতুর্থ পদমাহ" প্রভৃতি উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে পদ অর্থে গানের পংক্তি বা ছত্র। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় পদ নানার্থে ব্যবহৃত হইত। এই চর্য্যা-গানগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় রচনা প্রায় পদাবলীর মত, এবং গায়কগণ এই সমস্ত গানে অধুনা প্রচলিত কীর্ত্তনের রাগ-রাগিণীই ব্যবহার করিতেন। এইজন্য আমি বলিয়াছি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্বেও কীর্ত্তন ছিল, তবে তাহা আকারে ও ভঙ্গীতে পৃথক ছিল।

চর্য্যাপদ বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে ধাতুবদ্ধ নিবদ্ধ গানের শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র, শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ, অথবা প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক এই যে তিনটি শ্রেণীর কথা বলিয়াছি, বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীতগুলি ইহার শেষের শ্রেণীর গান। এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ বা রূপকের আবার চারিটি ভাগ আছে। ভক্তি-রত্নাকরে বর্ণিত আছে—(পঞ্চম তরঙ্গ)

তাল ধাতুযুক্ত বাক্য মাত্র ক্ষুদ্র গীত।
ধাতু পূর্ব্বে উক্ত উদ্‌গ্রাহাদি যথোচিত ॥
শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্র গীত হয়।
ইথে অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রে কয় ॥

ক্ষুদ্র গীত ভেদ চারি চিত্রপদা আর।
চিত্রকলা ধ্রুবপদা পাঞ্চালী প্রচার ॥

চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পাঞ্চালী বা পাঁচালী। সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া নিত্যধামগত অবধূতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদাবলী ও পাঁচালীর পার্থক্য নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন পদাবলী সমধ্রুবা, আর পাঁচালী বিষমধ্রুবা। বাঙ্গালার মঙ্গল গানগুলি পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণমঙ্গল, শিবমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল সব গান একই ধরণে গাওয়া হয়। একটি উদাহরণ দিতেছি। রামায়ণ গান হইতেছে, মূল গায়ক বর্ণন করিতেছেন—পবননন্দন অশোকবনে আসিয়া মা জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। তিনি সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের কুশল-সংবাদ দিয়া শ্রীরাম-দত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় সমর্পণ করিতেছেন এবং অভয় দিতেছেন। মূল গায়ক প্রথমে বেশ সুরে তালে ধুয়া ধরিলেন—"ও মা এই নাও রামের অঙ্গুরী"। দোহাররা সকলে মিলিয়া ধুয়াটি সুরে তালে আবৃত্তি করিলেন। তারপব মূল গায়ক গান ধরিলেন—"শমনদমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম।" দোহাররা সুর ধরিলেন "আ আহা রি"। মূল গায়ক পুনরায় পরের ছত্র আবৃত্তি করিলেন—"শমনভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম" ॥ দোহাররা তখন ধুয়াটিই সমস্বরে গান করিলেন "এই নাও রামের অঙ্গুরী" ॥ এই জন্যই পাঁচালী বা মঙ্গল গান বিষমধ্রুবা। পদাবলীতে এরূপভাবে ধ্রুবপদ গীত হয় না। মূল গায়ক ও দোহার সকলে মিলিয়া ধ্রুবপদ গান করেন। মঙ্গল গানের মত তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। এই জন্য পদাবলীর নাম সমধ্রুবা।

উদ্‌গ্রাহক আদির উদাহরণ—

॥ রাগ পঠমঞ্জরী ॥

উদিত পূরণ নিশি নিশাকর কিরণ করু তম দূরি।
ভানুনন্দিনী পুলিন পরিসর শুভ্র শোভিত ভূরি ॥ উদ্‌গ্রাহক ॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল চলত মলয় সমীর।
ভ্রমরগণ ঘন ঝঙ্করু কত কুহরে কোকিল কীর ॥ মেলাপক ॥
বিহরে বরজ কিশোর।
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী পেখি পরম বিভোর ॥ ধ্রুব ॥

দেব দুলহ সু-রাসমণ্ডলে বিপুল কৌতুক আজ।
বংশী কর গহি অধর পরশত মোদ ভরু হিয় মাঝ॥
রাধিকা গুণ চরিত ময়বর বিরচি বহুবিধ গীত।
গান রত রতিনাথ মদভর হরণ নীরুপম নীত॥ অন্তরা॥
কঞ্জ লোচনে ললিত অভিনয়, বরিষে রস জনু মেহ।
ভণব কিয়ে ঘনশ্যাম প্রকটত জগতে অতুলিত নেহ॥ আভোগ।
ষড়ঙ্গা মেদিনী গীতের উদাহরণ—
জয় জনরঞ্জন কঞ্জ নয়ন ঘন অঞ্জন নিভ নব নাগর ঐ ঐ।
গোকুল কুলজা কুলধৃতি মোচন চন্দ্রবদন গুণ সাগর ঐ ঐ॥
নন্দতনুজ ব্রজ ভূষণ রসময় মঞ্জুলভুজ মুদবর্দ্ধন ঐ ঐ।
শ্রীবৃষভানু তনয়ী হৃদি সম্পদ মদনার্ব্বুদ মদমর্দ্দন ঐ ঐ॥
গীত নিপুণ নিধুবন নয় নন্দিত নিরুপম তাণ্ডবপণ্ডিত ঐ ঐ।
ভানুতনয়া পুলিনাঙ্গন পরিসর রমণী নিকর মণি মণ্ডিত ঐ ঐ॥
বংশীধর বর ধরণীধর কৃত বন্ধু অধরারুণ সুন্দর ঐ ঐ।
কুন্দরদন কিবা কমনীয় কৃশোদর বৃন্দা বিপিন পুরন্দর ঐ ঐ॥
কৃষ্ণকেলি কলহৈক ধুরন্ধর ধা ধা ধি ধি ত গ ধে ন্না ঐ ঐ।
স স্বরি গরি নরহরি নাথ এ ই অ ইতি অই অই অতেন্না ঐ ঐ॥

বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও পদাবলীর ভাষা সাধারণতঃ "ব্রজবুলি" নামে পরিচিত। এই ব্রজবুলি শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা অর্থাৎ ব্রজমণ্ডলের কিম্বা ঐ অঞ্চলের ভাষা নহে। ব্রজবুলি বৈষ্ণব-কবিতার ভাষা, কবিগণের সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা। মিথিলার দেশীয় ভাষার মিশ্রণে আসাম, বাঙ্গালা, উড়িষ্যায় একই সময়ে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। মিথিলার বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তাহা ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্রজবুলির উপর মৈথিল প্রভাব কতটুকু সে বিচার পণ্ডিতগণ করিবেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মিথিলায় বিদ্যাপতি এবং বাঙ্গালায় চণ্ডীদাস দেশীয় ভাষায় যে মধুর এবং সুন্দর কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন— জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক পরবর্ত্তী কবিগণ সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সেকালে বাঙ্গালা ও মিথিলার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। বাঙ্গালা মুসলমান অধিকৃত হওয়ার পরেও স্বাধীন মিথিলায় হিন্দু রাজা

রাজত্ব করিতেছিলেন। বাঙ্গালার বিদ্যার্থী মিথিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিত। বাঙ্গালার চণ্ডীদাসের গান মিথিলায় লইয়া যাইত, মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গালায় বহিয়া আনিত। শকাব্দের ষষ্ঠ শতকে ভাস্কর বর্ম্মা রাঢ দেশ জয় কবিয়া কর্ণসুবর্ণে জয়স্কন্ধাবাব স্থাপন করেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ও আসাম পরস্পরের সংস্রবে আসিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গেশ্বর কুমার পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব আসাম জয় করিয়া তথাকার অধীশ্বর হন। কামরূপ ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। আসামে বাঙ্গালায় যাতায়াত বহুকালের। আসাম এবং মিথিলাও পরস্পর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। আসামেব প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক আচার্য্য শঙ্কবদেব তীর্থ-পর্য্যটন-ব্যপদেশে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী উড়িষ্যায় পুরীধাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেন। রায় রামানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন। সময় সময় বাঙ্গালাব অংশ বিশেষ উড়িষ্যার রাজগণ অথবা উড়িষ্যার অংশ বিশেষ বাঙ্গালাব বাজগণ অবিকার করিয়া লইতেন, সে অধিকার কখনো কখনো দীর্ঘস্থায়ী হইত। মুদ্রণযন্ত্র, বেতাব যন্ত্র, বেলপথ ও আকাশপথের সুবিধা না থাকিলেও এইরূপ নানাবিধ উপায়ে একদেশেব সঙ্গে অপর দেশের ভাষা ও ভাবের, সভ্যতা ও সংস্কৃতিব আদান-প্রদান ঘটিত। ব্রজবুলির সৃষ্টি ইহারই অন্যতম পরিণতি।

আসামেব সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীমান্ রাজমোহন নাথ শ্রীশঙ্করদেবের বরগীত এবং মাধবদেবের বরগীত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্কবদেবেব রুক্মিণীহরণ নাটও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্কবদেব চতুর্দ্দশ শকাব্দাব প্রথম দিকে বর্ত্তমান ছিলেন। বাঙ্গালার যশোরাজখান এবং উড়িষ্যার রায় রামানন্দ ইঁহাদের সম-সাময়িক। নিম্নে ইঁহাদের রচনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীশঙ্করদেবের রুক্মিণীহরণ নাট হইতে—

বসতি দিগন্তর নাথ হামারু। ভেণ্ট কেমনে হোই স্বামী মুরারু॥
হামু কিঙ্করী হরি নাথ হামার। কহ শঙ্কর রুক্মিণীক ব্যবহার॥

শ্রীমাধবদেবের বরগীত হইতে—

ধ্রুং॥ আলো মই কি কহবো দুখ।
পরাণ নিগরে নে দেখিয়া চান্দমুখ॥

পদ ॥ কত পুণ্যে লভিলোঁ গুণের নিধি শ্যাম।
বঞ্চিয়া নিলেক নিকরুণ বিধি বাম ॥
শ্যাম কানু বিনে মোর ন রহে জীবন।
হা শ্যাম বুলিতে আকুল করে মন ॥
দিবস না যাই দুখে ন যাই রয়নী।
চান্দ চন্দন মন্দ পবন বৈরিণী ॥
কোথা যাওঁ কোথা থাকোঁ কিবা করে মন।
কানাইর নেউছনি দেও সব বন্ধু জন ॥
শ্যাম বন্ধু বিনে জীবনর কিবা কাজ।
বিরহ অনল জ্বলে হৃদয়র মাঝ ॥
না জানোঁ দারুণ বিধি কি করে বিপত্তি।
কহয় মাধব রাঙ্গাপদে মোর গতি ॥

পণ্ডিতগণ ব্যাকরণ বিচার করিবেন। সাধারণের দৃষ্টিতে উদ্ধৃত পদের সঙ্গে ব্রজবুলি-রচিত পদাবলীর এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ও বাঙ্গালায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। শ্রীমাধবদেবের পদটি অতি অল্পায়াসেই ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত করিয়া লওয়া যায়। নিম্নে যশোরাজ খানের পদ উদ্ধৃত হইল।

এক পয়োধর চন্দন লেপিত আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূধর কোরে মিলল জোর ॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে চাঁদ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ সেহ এহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভণে যশোরাজ খান ॥

মিলল, রহল, পূজল প্রভৃতি প্রয়োগ প্রাচীন বাঙ্গালায় দুষ্প্রাপ্য নহে। তুয়া, সেহ, এহ প্রভৃতি শব্দও বিদেশ হইতে আসে নাই। অথচ এই পদটি বঙ্গদেশে বাঙ্গালী কবির রচিত ব্রজবুলি পদের প্রায় প্রথম নিদর্শন বলিয়া কথিত হইয়া

থাকে। সুতরাং স্বীকার কবিতে হয় এ ভাষা আসামেও যেমন বাঙ্গালাতেও তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপেই উদ্ভূত হইয়াছে। যশোরাজ খান ব্রজবুলিতে কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, অথবা খণ্ড খণ্ড রূপে পদ রচনা করিয়াছিলেন, নিশ্চয়রূপে কিছু বলা যায় না।

শ্রীরামানন্দ রায় গোদাবরীতীবে বিদ্যানগরে (অধুনা রাজমাহেন্দ্রী নামে পরিচিত) উড়িষ্যার মহাবাজা প্রতাপরুদ্রেব অধীন প্রদেশপাল ছিলেন। তাঁহার জগন্নাথবল্লভ নাটক পুরীধামেই রচিত হইয়াছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, সেই সময় শ্রীপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ কবিয়াছিলেন। গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে শ্রীমহাপ্রভু রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর স্বরচিত কড়চায় এই মিলনলীলা সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চবিতামৃতে রামানন্দমিলন বর্ণনে স্বরূপের কড়চার অনুসরণ কবিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দরচিত যে পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যরচিত মহাকাব্যেও পদটি উদ্ধৃত আছে। পদটি ব্রজবুলিতে রচিত। রামানন্দ রায় এইরূপ আর কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তিনি জগন্নাথবল্লভে শ্রীজয়দেবের অনুসরণে সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন। আমাদের উদ্দিষ্ট পদটি এই—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্য ভেল।
অনুদিন বাঢল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠাম কহবি বিছুরহ জনি;
না খোজলুঁ দূতি না খোঁজলু আন।
দুঁহুক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতি।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রায় রামানন্দ কবি ভাণ॥

এই পদের রাগ, নয়ন প্রভৃতি অধিকাংশ শব্দই তৎসম শব্দ। .ভেল, ভেলি, গেল, বাঢ়ল প্রভৃতি শব্দ চর্য্যাপদ এবং কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোচনায় অসমীয়া উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষা একই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া যেমন, ছন্দ সম্বন্ধেও তেমনই, সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তাঁহারা অজস্র উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন ; সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মূল ছন্দ অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন, আবার বিবিধ ছন্দের মিশ্রণে কয়েকটি নূতন ছন্দেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ অনেকেরই আদর্শ গ্রন্থ ছিল। শ্রীগীতগোবিন্দের বহু ছন্দ পরবর্ত্তী পদাবলীতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পদাবলীর ছন্দ মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং মিশ্র। মাত্রাবৃত্তে অক্ষরের গুরু লঘু মাত্রাই প্রধান বিচার্য্য, অক্ষরবৃত্তে অক্ষরসংখ্যাই প্রধান অবলম্বন। মিশ্র ছন্দে গুরু লঘু মাত্রা ও অক্ষরসংখ্যা উভয়েরই মিশ্রণ ঘটিয়াছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আট, বার ও ষোল মাত্রার সম ও বিষম লঘু চতুষ্পদী—ভঙ্গ পয়ার, পয়ার, একাবলী প্রভৃতি, তেইশ, পঁচিশ, আটাইশ মাত্রার লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী এবং সাতচল্লিশ ও একান্ন মাত্রার দীর্ঘ চতুষ্পদী ছন্দের প্রাচুর্য্য লক্ষণীয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও এইরূপ চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার, আট, দশ, বার অক্ষরের ভঙ্গ পয়ার, একাদশ অক্ষরের একাবলী, কুড়ি অক্ষরের লঘু ত্রিপদী, ছাব্বিশ অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদী, মিশ্র ছন্দে মিশ্র পয়ার, মিশ্র ত্রিপদী, আটত্রিশ ও পঁয়তাল্লিশ অক্ষরের দীর্ঘ চতুষ্পদী এবং ধামালী প্রভৃতি ছন্দ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব কবিগণ প্রায় সকলেই অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা যেমন অতি যত্নে ভাবানুরূপ শব্দ চয়ন করিয়াছেন, তেমনই ব্যঞ্জনাময় ভাষায় রচিত কবিতা-সুন্দরীকে মনোহর অলঙ্কারেও সাজাইয়াছেন। ব্যতিক্রম আছে, কেহ কেহ হয়তো অলঙ্কারের গুরুভারে কবিতার স্বভাব-সৌন্দর্য্যের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন, কিন্তু অনেকেরই এই বিষয়ে সামঞ্জস্যজ্ঞান আমাদের বিস্ময়োৎপাদন করে। পদাবলীতে অনুপ্রাস, যমকাদি শব্দালঙ্কারের ও উপমা রূপকাদি অর্থালঙ্কারের যথাযোগ্য সুষ্ঠু প্রয়োগ আজিও অনবদ্য কবিতার উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতা গীতি কবিতা। কিন্তু এই কবিতা আবৃত্তির জন্য নহে,

প্রধানতঃ গাহিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। সুগায়ক রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়ার মুখে না শুনিলে পদাবলীর মাধুর্য্য অনুভূত হয় না ; সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। কীর্ত্তনের আসরে গায়কগণ এবং শ্রোতৃবৃন্দ যেন একাত্মতা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে অতীতের বৃন্দাবনলীলা যেন বর্ত্তমানের রূপ ধরিয়া বাস্তবে জীবন্ত হইয়া উঠে। মর্ম্মোচ্ছলিত রসভাব প্রেম-ভক্তির সান্দ্রতায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহে আকার পরিগ্রহ করে। অন্তর বাহির একাকার হইয়া যায়।

বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই প্রকৃত কবি—দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা। ইঁহারা শ্রীধাম বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে বৃন্দাদেবীর অন্তেবাসী। কেহ কেহ অন্তরালের সজ্জা-গৃহের প্রযোজক, নেপথ্য-বিধানের বিধায়ক। ইঁহারা লীলাসঙ্গী, লীলা যেমন দেখিয়াছেন, যেমন আস্বাদন করিয়াছেন, ছন্দে শ্লোকে তাহারই কথঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। সুগভীর রসানুভূতি, সুনিবিড় ভাব-সম্ভূতি, অকৃত্রিম আকূতি এবং প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি বৈষ্ণব কবি-গোষ্ঠীর সহজাত সম্পদ।

আত্মগত সাধনায় এবং ধ্যান তন্ময়তায় তাঁহারা জগৎ এবং জীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাই একের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অনেকের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাই বৈষ্ণব কবিতায় লৌকিক অলৌকিকের সীমারেখা মুছিয়া গিয়াছে। তাই ব্যক্তির বেদনা জাতির চিরন্তন আস্বাদনের বস্তু হইয়া আছে।

অনেকের মতে ধর্ম্মমূলক কবিতা কবিতা হয় না। বৈষ্ণব কবিগণ এই মত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মূলে বৈষ্ণব কবিতা ধর্ম্মমূলক কবিতা, আমরা এইভাব লইয়াই বৈষ্ণব কবিতা পাঠ করিয়া থাকি। কীর্ত্তন গান শ্রবণ করিয়া থাকি। বৈষ্ণব কবিগণের ধর্ম্ম—প্রেমধর্ম্ম। যে প্রেমের কোন হেতু নাই, যে প্রেম কোন বাধা মানে না, যে প্রেম কোন প্রতিদান চাহে না, যে প্রেমে আত্মসুখের কোন কামনাই নাই, যে প্রেম ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, যে প্রেম মৃত্যুকে ভয় করে না, যে প্রেম মরণজয়ী, বৈষ্ণব কবিগণের প্রেম সেই প্রেম। এই প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রকে তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই প্রেম তাঁহাদের বাস্তব বস্তু। এই প্রেমই তাঁহাদের জগৎ, প্রেমই তাঁহাদের জীবন। তাই তাঁহাদের কবিতা ধর্ম্মমূলক হইয়াও কবিতা হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতা পদাবলী, সুর তাল সংযোগে গীত হয়। ইহা পাঠ করিয়া যে

আনন্দ পাওয়া যায়, কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠে শুনিয়া তাহার শত গুণ আনন্দ লাভ হয়। পদাবলীর "পদ" একটি বিহঙ্গম, ভাব তাহার দেহ, রস তাহার প্রাণ, আর কথা ও সুর তাহার দুইটি পাখা। কীর্ত্তনীয়ার গানে শ্রোতার মন এবং প্রাণ এই পাখায় ভর করিয়া বিহঙ্গের সঙ্গে আনন্দের শাশ্বত কল্পলোকে উধাও হইয়া যায়। কীর্ত্তন কি বস্তু না শুনিলে তাহা বুঝা যায় না।

পদাবলীর ভাষা বাঙ্গালা ও মৈথিল মিশ্রিত এক কৃত্রিম ভাষা, পদাবলীর ছন্দ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীত হইতে গৃহীত। তথাপি এই ভাষা, এই ছন্দ সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্যে, দোঁহা ও মঙ্গলকাব্যের রাজ্যে একেবারে অভিনব, সম্পূর্ণ নূতন। বিষয়বস্তু পুরাতন হইলেও বলিবার ভঙ্গীতে ভাষা ও ছন্দের গুণে তাহা চিরনূতন হইয়া আছে।

বলিয়াছি বৈষ্ণব কবিগণের প্রেমই ধর্ম্ম। এই প্রেম ভক্তিরই পরিণতি, ইহা আনন্দ চিন্ময় রস। তাই এই প্রেমের কবিতা প্রাকৃত জগতের ভাষায় কথা কহিয়াও অপ্রাকৃত জগতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, আজিও এই মর জড়ের ধূলি-স্তরে অমরলোকের অমৃতবৃষ্টি করিতেছে। তাই পদাবলী বৈষ্ণব সাধকের ধ্যানমন্ত্র, উপাসনার অবলম্বন। পদাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠক ও শ্রোতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য ইহার সঙ্গে "গৌরচন্দ্রিকা" সংযুক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বরাগাদি যে বিভাগের পদ পাঠ বা শ্রবণ করি, সঙ্গে সঙ্গে তদ্ভাবভাবিত সেই আদর্শ সন্ন্যাসী—সেই প্রেম-বিগ্রহ—সেই অভিনব জঙ্গম হেমকল্পতরু শ্রীগৌরচন্দ্রকে বন্দন ও স্মরণ মনন করিয়া পাঠের বা শ্রবণের জন্য চিত্তকে প্রস্তুত করিয়া লই। তাঁহার জীবন-ভাষ্য দিয়া পদাবলীর অর্থ গ্রহণে সচেষ্ট হই। পদাবলী গীতি কবিতা, পদাবলী সঙ্গীত, কিন্তু পদাবলী ভগবদ্ভজনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না। পাঠক ও শ্রোতৃগণের প্রতি মহাজনগণের ইহাই নির্দ্দেশ, আমাদের ইহাই অনুরোধ। পদাবলীর অন্য নাম মহাজন-পদাবলী। অর্থ—মহাজনের দ্বারা রচিত, মহাজনগণের দ্বারা আস্বাদিত। সাধারণভাবে পাঠ করিবার জন্য তো বহু কবিতা আছে, শুনিবার বহু সঙ্গীত আছে। পদাবলী না হয় একটু স্বতন্ত্র হইয়াই থাকুক। পদাবলী পাঠ করিতে বাধা নাই, শুনিতে বাধা নাই, মাত্র ভক্তিপূতচিত্তে পাঠ করিতে, নিষ্ঠা ভক্তি লইয়া শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। উপসংহারে এই অনুরোধের সমর্থনে আমি অপর সম্প্রদায়ের একজন মহাজন—স্বনামধন্য প্রাচীন আচার্য্য

অভিনব গুপ্তের মহাবাণী উদ্ধৃত করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকের টীকা রচনা করিতে গিয়া অভিনব গুপ্ত বলিতেছেন—

যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টি র্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ম্
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ত্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্॥

হে সমুদ্র-শয্যাশায়ি, কবিদিগের যে নবীন দৃষ্টি রসসমূহকে রসান্বিত করিতে ব্যাপৃত থাকে, পণ্ডিতদিগের যে দৃষ্টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বিষয়ের উন্মেষে নিয়োজিত—আমরা এই দুইটিকেই অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে নিঃশেষে বর্ণনা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তোমার প্রতি ভক্তির তুল্য সুখ আমরা একেবারে পাই নাই। (শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালিপদ ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ।)

—

২। পদাবলী-সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা—বিশেষ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকথাই পদাবলীর বিষয়বস্তু। পদাবলীর মধ্যে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ সংখ্যায় বেশী নহে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলার পদের সংখ্যাও কম। পদাবলীতে মধুর রসের—শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসের পদের সংখ্যা প্রচুর। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মাথুরলীলা পর্য্যন্ত অবলম্বনে শত শত কবি সহস্র সহস্র পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা লইয়া কবিতা ও গীতি-কবিতা রচনার আজিও বিরাম নাই। পদাবলীতে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকথা অবলম্বনে রচিত পদের সংখ্যাও প্রচুর।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা কতদিনের পুরাতন, কেহ জানে না। পুরাণের বয়স লইয়া নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন। অন্ধ্র-ভৃত্যবংশীয় নরপতি হালের সঙ্কলিত গাথা-সপ্তশতীর মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় রচিত কবিতায় রাই, কানু ও গোপীগণের কথা আছে। গাথা-সপ্তশতী কমবেশী প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বহু কবির রচিত খণ্ড কবিতায়, কাব্য-নাটকের নান্দীশ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা গ্রথিত রহিয়াছে। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন প্রায় বার শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অমর গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোক' সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক দুইটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটি শ্লোকে দ্বারকা-লীলার ইঙ্গিত আছে। শ্লোকটি এই—

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়া-তীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনমৃদুচ্ছেদোপযোগেঽধুনা-
তে জানে জরঠী ভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আছেন। মথুরা হইতে দূত গিয়াছে দ্বারকায়। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ওগো ভদ্র, গোপবধূগণের বিলাসসুহৃদ, রাধার নির্জ্জন কেলির সাক্ষী সেই যমুনারতীরবর্ত্তী লতাকুঞ্জগুলির কুশল তো? (পরে নিজেই স্বগতোক্তি করিতেছেন,—কুশলই বা কি করিয়া বলি) বিলাসশয্যা-রচনার

প্রয়োজন তো আর নাই, তাই তমাল-কিশলয় চয়নের প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে, সুতরাং সেগুলি ঝরিয়া পড়িয়া শুকাইয়া যাইতেছে।

ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার-চরিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে। তিনি জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। তাঁহার রচিত গোপীদিগের এই বিরহ-গান জয়দেবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

ললিত-বিলাস-কলা-সুখ-খেলন-ললনা-লোভন-শোভন-যৌবন-
মানিত-নবমদনে।
অলিকুল-কোকিল-কুবলয়-কজ্জল-কাল-কলিন্দসুতামিব লজ্জল-
কালিয়কুল দমনে॥
কেশি-কিশোর-মহাসুর-মারণ-দারুণ-গোকুল-দুরিত-বিদারণ-
গোবর্দ্ধন-ধরণে।
কস্য ন নয়নযুগং রতিসঙ্গে-মজ্জতি-মনসিজ-তরল-তরঙ্গে
বররমণী-রমণে॥

জয়দেবের জীবদ্দশায় অথবা তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র বাঙ্গালী শ্রীধরদাস 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' নাম দিয়া প্রাচীন ও সমসাময়িক কবিগণের রচিত সুভাষিতাবলী সংগ্রহ করেন। ইহারই কিছু পূর্ব্বে বা পরে আর একখানি গ্রন্থও বঙ্গদেশেই সঙ্কলিত হয়, তাহার নাম 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'। সংগ্রহ দুইখানির মধ্যে বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী বহু কবির রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলা তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাত্মক শ্লোক আছে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ এই গ্রন্থ দুইখানি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর সঙ্কলিত অনুরূপ গ্রন্থ পদ্যাবলী হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছিলেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ বা অংশত জয়দেবের পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই গ্রন্থে দুইটি পদাংশ পাওয়া যায়—

॥ রাগ গান্ধার ॥

কেশব কমলমুখী কমলম্
কমলনয়নকলয়াতুলমমলম্॥
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্॥ ধ্রু॥
সুরুচিরহেমলতামবলম্ব্য তরুণতরুং ভগবন্তম্।
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমহ্ন কলয়তি সা তু ভবন্তম্॥

॥ রাগিণী শ্রী ॥

রসিকেশ কেশব হে ॥

বসসবসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসনিবহে ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা লইয়া শকাব্দার চতুর্দ্দশ শতকের দিকে যে খণ্ড-কবিতা ও কাব্য রচিত হইতেছিল, এই কবিতা দুইটি এবং "হরিচরিত" কাব্য তাহার অন্যতম প্রমাণ। দুর্দ্দান্ত হাবশীরা যেদিন রাজপ্রাসাদের শুদ্ধান্তঃকক্ষে রাজমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলায় প্রমত্ত ছিল, সমগ্র গৌড় রাজধানী ছিল সন্ত্রস্ত, সেদিন ঐ রাজধানীরই কোন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া কবি চতুর্ভুজ হরিচরিত রচনা করিয়াছিলেন। হাবশী-বিপ্লব দমনে সাহায্য করিয়া বাঙ্গালী প্রজাগণ যে-বৎসর হুসেন শাহকে গৌড়-সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন, সেই বৎসরে ১৪১৫ শকাব্দায় হরিচরিত রচনা সমাপ্ত হয়। চতুর্ভুজ পণ্ডিতবংশের সন্তান, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্ণরেখ বাঙ্গালার সম্রাট্ ধর্ম্মপালের নিকট হইতে করঞ্জ গ্রাম দান-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাঢ়ের কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু ১৪০২ শকাব্দায় শ্রীমদ্ভাগবতের আংশিক অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত গ্রন্থের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। মালাধর বসু, শ্রীখণ্ডের মহাকবি দামোদর, ছোট বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন, যশোরাজ খান প্রভৃতি অনেকেরই গৌড়রাজ দরবারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গালায় ধীরে ধীরে একটি নূতন ভাষার ও নবীন কবি-গোষ্ঠীর অবলম্বন হইয়া উঠিতেছিল। চণ্ডীদাসের রচিত কৃষ্ণলীলার পদ—বিশেষ করিয়া দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বাঙ্গালার কবিগণকে তথা রসিক-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

শ্রীখণ্ডের কবি রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শ্রীকবিরঞ্জন দামোদর মহাকবি।

যশোরাজ খান আদি সবে রাজ-সেবি ॥

নব জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দূরদর্শী কীর্ত্তিমান্ গৌড়েশ্বর, হিন্দুকুলতিলক মহারাজা দনুজমর্দ্দন দেবের (রাজা গণেশ) সহৃদয় সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষা রাজসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী কবি রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বরগণ বিশেষতঃ সদাশয় হুসেন শাহ রাজা গণেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বসুকে

"গুণরাজখান" উপাধি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহই দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন নরপতি হাবশী বিদ্রোহে বিব্রত ছিলেন। কাহারো কাহারো ভাগ্যে রাজ-সিংহাসন দুই তিন বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্ব ও অশান্তির মধ্যে এইরূপ গুণ গ্রহণ ও উপাধিদান সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। ১৪০২ শকাব্দায় শ্রীকৃষ্ণবিজয় সমাপ্ত হয়। ১৪১৫ শকাব্দায় হুসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রন্থ রচনার পরে প্রজাসাধারণের আনুকূল্যে রাজ্যারোহণ বৎসরেই উৎসব উপলক্ষ্যে হয়ত সুলতান এই উপাধি দান করিয়াছিলেন। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। উপাধি-প্রাপ্তির পর হাতে লেখা পুঁথিতে উপাধি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। নকলকারকগণ তদনুরূপ নকল করিয়া লন। হুসেন শাহের দরবারেই মালাধর ভিন্ন আরো কয়েকজন বাঙ্গালী গুণী ব্যক্তি এইরূপ উপাধি পাইয়াছিলেন। ইহাদের একজন শ্রীখণ্ডের কবি যশোরাজ খান। যশোরাজ খান রাজদত্ত উপাধি, ইঁহার নাম জানি না। অন্যজন মালাধরের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত বসু। ইনি উপাধি প্যাইয়াছিলেন "সত্যরাজ খান"। যশোরাজ খানের রচিত একটি পদ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। শ্রীচৈতন্য-সমকালীন পদ-রচয়িতাগণের ইনিই অগ্রদূত।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পদ-রচয়িতাগণের মধ্যে কবিরঞ্জন, রায়শেখর এবং গোবিন্দ আচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। দেবকিনন্দন ও মাধবের বৈষ্ণব-বন্দনায় এবং কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গোবিন্দ আচার্য্য রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কাব্য রচয়িতা এবং গীত-পদ্যকারকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। রামগোপালদাসের রসকল্পবল্লীতে "অথ ঢামালী কৃষ্ণপ্রিয়াণাম্" উল্লেখে গোবিন্দ আচার্য্যের পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার ভাষাও ব্রজবুলি-মিশ্রিত।

কবিরঞ্জন এবং রায়শেখর পদকর্ত্তাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবিরঞ্জনের নাম ছিল রঞ্জন, উপাধি ছিল ছোট বিদ্যাপতি। ইঁহার এবং রায়শেখরের কয়েকটি পদ মিথিলার বিদ্যাপতির নামে চলিতেছিল, আমি সেগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি। উদাহরণস্বরূপ কবিরঞ্জনের—"নমুয়াবদনী ধনী বচন কহসি হসি" এবং "উদসল কুন্তল ভারা" আর রায়শেখরের "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্যমন্দির মোর" এবং "গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই" প্রভৃতি পদের উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের ব্রজবুলি-রচিত পদের তুলনা পদাবলী সাহিত্যেও খুব কমই পাওয়া যায়। কবিশেখর, রায়শেখর একজনেরই উপাধি। ইহার

নাম দৈবকিনন্দন সিংহ। ইনি সংস্কৃতে গোপাল-চরিত মহাকাব্য, গোপীনাথ-বিজয় নাটক, বাঙ্গালায় গোপাল-কীর্ত্তনামৃত (রাধাকৃষ্ণলীলা পদাবলী) এবং গোপালবিজয় পাঁচালী রচনা করেন। রায়শেখর শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্য-লীলা অবলম্বনে রচিত ইঁহার "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী" বৈষ্ণব সাধকগণের নিত্য উপাসনার অবলম্বন। ইনি অসাধারণ কবিত্বের অধিকারী ছিলেন।

ইঁহাদের সমসাময়িক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস, কবি কর্ণপূর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার পদ-রচনায় বাসু ঘোষের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর এই ধারার আদি কবি। কিন্তু ইঁহারা সকলেই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর নিকট ঋণী, আচার্য্য প্রভুই ইঁহাদের প্রেরণাদাতা। প্রধানতঃ তাঁহার আবাহনেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ-বন্দনার পদ-রচনারও তিনিই প্রবর্ত্তক।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ডে বর্ণিত আছে—

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই অতি॥
শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখভরি গাই আজ শ্রীচৈতন্য রায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞী॥
যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত উদ্ধার।
আমা সবা লাগি যে গৌরাঙ্গ অবতার॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত॥
নাচি আমি তোমরা চৈতন্য যশ গাও।
সিংহ হই গাই পাছে মনে ভয় পাও॥
প্রভু যে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সবার এই ডর॥

তথাপি অদ্বৈত বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাহিতে লাগিল চৈতন্য অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্য-মঙ্গল॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি॥
"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥"

—এই দুইটি পংক্তি আমি শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রথম পদ বলিয়া মনে করি। এই সময় পুরীধামে বাঙ্গালার বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, অনেকেই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। এতদিন যাঁহারা শ্রীচৈতন্যলীলা লইয়া পদ রচনার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিতেন, আজ তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল; তাঁহারা মহা আনন্দিত হইলেন। আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্য-চরিত লইয়া কাব্য রচনার প্রেরণাও কবিগণ এই সূত্র হইতেই পাইয়াছিলেন। এই কীর্ত্তনে শ্রীচৈতন্যদেব উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যেমন প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হয়, আজিও বুঝি তাহাই হইতেছে। কিন্তু আসিয়া যখন শুনিলেন সকলে পরমানন্দে তাঁহারই নাম, গুণগান করিতেছে, তখন তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া গম্ভীরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বিষণ্ণচিত্তে শয়ন করিয়া রহিলেন। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। গোবিন্দ প্রভুকে ভক্তগণের আগমন সংবাদ দিলে, মহাপ্রভু সকলকে কাছে আসিতে বলিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ তোমরা কি কীর্ত্তন করিতেছিলে? "ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। কি গাইলা আমারে তা বুঝাহ এখন॥" শ্রীবাস বলিলেন, জীবের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই, ঈশ্বর যাহা বলাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছি। হস্ত দ্বারা কি সূর্য্য আচ্ছাদন করা যায়?

এমন সময় ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি নানা স্থানের যাত্রিগণ যাঁহারা জগন্নাথ দেখিতে আসিয়াছিলেন, সকলেই শ্রীচৈতন্যের গুণগান করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গাহিতে লাগিলেন—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ ভক্তি রস কুতূহলী॥
জয় জয় পরম সন্ন্যাসী রূপধারী।
জয় জয় সংকীর্ত্তন-লম্পট মুরারি॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
জয় জয় সর্ব্বজগতের উপকারী॥
জয় কৃষ্ণ-চৈতন্য শচীর নন্দন।
এই মত গাই নাচে শত সংখ্যাজন॥

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান্ সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে" সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য হইতে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া পদাবলীর পূর্ব্বরূপের আভাস দিয়াছেন।

বাঙ্গালীর ইহা জানা একান্ত প্রয়োজন, শকাব্দ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতকের বাঙ্গালীর জাতীয়-সাধনার ফল্গুধারা শকাব্দার পঞ্চদশ শতকে কেমন কলনাদিনী তটিনীর নটনভঙ্গীতে এক আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীর মানস-শতদল শকাব্দার পঞ্চদশ শতকে কেমন শোভায়, সৌন্দর্য্যে, রূপে, রসে, অলিকুলগানের অভিনন্দনে এক পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। আমি কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার মধুময়ী স্মৃতি শকাব্দার একাদশ শতকেরও পূর্ব্বে বাঙ্গালার কবিচিত্তে কি আনন্দলোকের সৃষ্টি করিত, কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে তাহার উদাহরণ— (শ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি)

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রবাহ্যুপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজলতাং তামেব পুষ্পাসবাম্
ইত্থং নির্ব্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রী নো হরিঃ পাতু বঃ॥

(শ্রীরাধা) "দ্বারে ও কে?" (শ্রীকৃষ্ণ) "হরি" (অর্থান্তরে বানর), "উপবনে যাও", "শাখামৃগের এখানে কি?" "প্রিয়ে আমি কৃষ্ণ।" "তাহা হইলে আরো ভয়ের কথা, বানর কি কালো হয়?" "মুগ্ধে আমি মধুসূদন" (অর্থান্তরে মধুকর), "ফুলফোটা লতার কাছে যাও তবে।" এইরূপে প্রিয়া কর্ত্তৃক নিরুত্তর লজ্জিত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

সাগর নন্দীর “নাটক-লক্ষণ-রত্নকোশে” বাক্‌বেণীর উদাহরণ—

কস্ত্বং কৃষ্ণোঽস্মি, বর্ণং তে নাহং পৃচ্ছামি নাম কিম্ ?
কেশবোঽহং, চিরাল্লব্ধং কুর্য্যাং ত্বাং খলু কেশবম্ ॥

কে তুমি ? আমি কৃষ্ণ। তোমার গায়ের রং জিজ্ঞাসা করিতেছি না। নাম কি ? আমি কেশব। অনেক দিন পরে পাইয়াছি। তোমাকে কেশব করিতেছি। (মারিয়া ফেলিয়া জলে ভাসাইতেছি।)

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে শ্রীবাধাকৃষ্ণেব উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক এইরূপ কয়েকটি শ্লোক আছে। ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫ সংখ্যক এই চারিটি শ্লোক তুলনীয়। দুইটির রচয়িতাব নাম নাই। একটি চক্রপাণির, অন্যটি হরিহরের।

এই সমস্ত শ্লোকের সঙ্গে তুলনীয় পদ—পদকল্পতরু, ২য় শাখা ৩১০ পদ—

কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
হরি হাম জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরি-কন্দব মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ॥
সো নহ ধনি মধুসূদন হাম।
চলু কমলালয় মধুকরী ঠাম॥
শ্যাম মুরতি হাম তুঁহুঁ কি না জান।
তারা-পতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥
ঘরহুঁ রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার॥
রাধারমণ হাম কর পরতীতি।
রাকা-রজনি নহ তমোময়ী রাতি॥
পরিচয় পদ যবে সব ভেল আন।
তবহি পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথ শূর।
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পুর॥

বর্ষা রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিয়া দেখিলেন, দ্বার অর্গলবদ্ধ। শ্রীরাধা পূর্ব্বেই

আসিয়া কুঞ্জের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—কে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে? তাই শ্রীরাধা বলিলেন, কে এখানে বারবার চীৎকার করিতেছে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি হরি। শ্রীরাধা হরি শব্দে সিংহ অর্থ ধরিয়া বলিলেন, গিরিকন্দর পরিহার করিয়া কুঞ্জমন্দিরে মৃগরাজ কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি মধুসূদন। শ্রীরাধা বলিলেন, (মধুসূদন) ভ্রমর, কমলিনীর নিকট যাও। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি শ্যাম। শ্রীরাধা শ্যাম অর্থে অন্ধকার ধরিয়া বলিলেন, চন্দ্রের ভয়ে বুঝি, তা মন্দিরে তো রত্নদীপ জ্বলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি রাধারমণ। শ্রীরাধা রাধা শব্দে অনুরাধা নক্ষত্র এবং তাহার নায়ক পূর্ণিমার চন্দ্র—এই অর্থ করিয়া বলিলেন, এ তো জ্যোৎস্না রাত্রি নহে, অন্ধকার রাত্রে পূর্ণিমার চন্দ্র কিরূপে উদিত হইবে? পরিচয় বৃথা হইল, শ্রীকৃষ্ণ পরাভব স্বীকার করিলেন। এদিকে অন্ধকার রাত্রি হইলেও মন্মথ-সূর্য্য উদিত হইয়া হৃদয় আলোকিত করিল। ঘনশ্যামের (এক অর্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্য অর্থে পদকর্ত্তা) মনোরথ পূর্ণ হইল, তিনি শ্রীরাধার সঙ্গলাভ করিলেন। (পদকর্ত্তার মনোরথ পূর্ণ হইল, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন দর্শন করিলেন।)

কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে—

ধ্বস্তং কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঞ্জনং নেত্রয়োঃ।
রাগঃ কেন তবাধরে প্রমথিতাঃ কেশেষু কেন স্রজঃ।
তেনা (শেষজ) নৌঘকল্মষমুষা নীলাব্জ ভাষা সখি
কিং কৃষ্ণেন ন যামুনেন পয়সা কৃষ্ণানুরাগস্তব॥

কে কুচযুগের বিলেপন মুছিয়া দিল? কে চোখের কাজল ঘুচাইল? কে তোমার অঙ্গরাগ প্রমথিত করিল? কবরীতে মালা নাই কেন? সখি, (এ কাজ হইয়াছে) সেই অশেষ জনসমূহের মালিন্য-বিধ্বংসী নীলপদ্মকান্তির দ্বারা। কি কৃষ্ণের দ্বারা। না যমুনার জলে। তোমার কৃষ্ণ বর্ণেই অনুরাগ।

তুলনা করিতেছি না, কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া পদাবলী হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

অবহু রভস রস কয়লহি ধাধস ঝামর দুষ্কর বেলি।
উলটল কবরি অম্বর নাহি সম্বরি কহ কেবা গারি বা দেলি।

সখি কোন এতহু দুখ দেল।
বিকচ কমল ফুল লোচন ছল ছল অব কাহে মুদিত ভেল॥
তাম্বুল অধর মধুর বিম্বফল কির দংশন কিবা দেল।
কুচ ছিরিফল পর বিহগ কিয়ে বৈঠল তাহে অরুণ রেখ ভেল॥
কাজর কপোল লোল অমিয়ফল সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ চলহ চলহ সখি রাইক মিলাহ সিনানে॥

কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে অভিসার সাধনার এই শ্লোকটি আছে—

মার্গে পঙ্কিনি তোযদান্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য রসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলে নাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছাল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি॥

পদাবলীতে ইহার অনুরূপ পদ—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল চলতহি অঙ্গুলী চাপি॥
—হরি অভিসারকি লাগি।
দূতর পন্থ-গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানকি আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণীমুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ॥

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী ধৃত কয়েকজন বাঙ্গালী কবির রচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার শ্লোক হইতেও বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ব্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের এই শ্লোকে দূতী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতির সঙ্কেত জানাইতেছেন—

পন্থাঃ ক্ষেমময়োঽস্তু তে পরিহর প্রত্যূহসম্ভাবনাম্
এতন্মাত্রমধারি সুন্দরী ময়া নেত্রপ্রণালীপথে।
নীরে নীলসরোজমুজ্জ্বলগুণং তীরে তমালাঙ্কুরঃ
কুঞ্জে কোঽপি কলিন্দশৈলদুহিতুঃ পুংস্কোকিলঃ খেলতি॥

তোমার পথ মঙ্গলময় হউক। বিঘ্নর লেশমাত্র আশঙ্কা করিও না। সুন্দরি, আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম, কালিন্দী-নীরে একটি উজ্জ্বল নীলপদ্ম, তীরে একটি নবীন তমালতরু, এবং কুঞ্জে একটি কোকিল খেলা করিতেছে।

গোবিন্দ ভট্ট কৃষ্ণের বেণুধ্বনির মোহিনী শক্তির বর্ণনা করিতেছেন—

সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ সত্যং কুলং নির্ম্মলং
সত্যং নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ।
তৎ সর্ব্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে
চেতুন্মাদ-মুকুন্দ-মঞ্জু-মুরলীনিঃস্বান-বাগোদ্‌গতিঃ॥

সখি, তুমি যথার্থই বলিতেছ, খলবাক্য দুঃসহ। ইহাও সত্য যে আমার কুল নিষ্কলঙ্ক, এবং এই সহচর নিষ্ঠুর। যমুনাতীর অনেক দূর ইহাও সত্য। তথাপি সখি, এ সমস্তই আমি তখনই ভুলিয়া যাই, যে মুহূর্ত্তে মুকুন্দের মধুর মুরলী-নিঃসৃত উদ্দাম রাগিণী আমার কর্ণে প্রবেশ করে।

কেশব ভট্টাচার্য্য মাথুর-বিরহের পদ রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধা উদ্ধবকে বলিতেছেন—

আস্তাং তাবদ্ বচনরচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি॥
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি॥

সাক্ষাতে পরস্পর বাক্যালাপের অবকাশ দূরে থাকুক, তোমার তনু স্পর্শ-লাভের সম্ভাবনা সুদূর হউক, কেবল বার বার প্রণতি করিয়া এই প্রার্থনা জানাইতেছি - তুমি স্বজন-গণনার কালে আমার নামেও একটি রেখাপাত করিও।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর উদ্ধব-সন্দেশ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিলাম। সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

কারুণ্যাব্ধৌ ক্ষিপসি জগতীং হা কিমেভির্বিলাপৈঃ
ধেহি স্থৈর্য্যং মনসি যদভূরধ্বগে বদ্ধরাগা
ত্বত্তা বাণীমপি যদি নিজাং স ব্রজং নাজিহীতে
ধূর্ত্তোঽস্মাকং ত্রিজগতি ততস্তম্বি নির্দোষতাভুৎ॥

আহা কেন তুমি এইরূপ বিলাপ করিয়া সকলকে কাঁদাইতেছ? পথিককে মন সমর্পণ করিয়াছিলে, এই ভাবিয়া স্থির হও। সে ধূর্ত্ত যদি নিজের কথা না রাখে, ব্রজে না-ই আসে, ত্রিজগতে তো আমাদের দোষহীনতা প্রমাণিত হইল।

দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ড, লীলাকীর্ত্তনের অন্যতম বিষয়বস্তু। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের দুইটি বৃহৎ পালা পাওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ—জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদাবলী-রচয়িতা এবং মাধবাচার্য্য প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য-প্রণেতৃগণ সকলেই এই লীলা লইয়া পদ ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই দুইটি পালা ভিন্ন ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড প্রভৃতি আরো কয়েকটি পালা আছে। প্রাচীন কবিগণের রচনায় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উপপুরাণ ও রাধাতন্ত্রে নৌকাখণ্ডাদি কয়েকটি লীলার মূল পাওয়া যায়।

দানখণ্ডের বিষয় হইল বড়ায়ির সঙ্গে সখীগণকে লইয়া শ্রীরাধা মথুরার হাটে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ঘোলাদি বিক্রয় করিতে যাইতেছেন। পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ঘাটোয়াল পরিচয়ে পথরোধ করিয়াছেন। দানঘাটের রাজকর লইয়াই কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের বিবাদ। কৃষ্ণের প্রার্থিত রাজকর অর্থ নহে, দধি ঘৃতাদিও নহে, গোপীগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সৌন্দর্য্য এবং কণ্ঠহারাদিই রাজকর। ইহাতেই গোপীগণের আপত্তি। আচার্য্যগণের মতে গর্গের জামাতা ভাগুরি রামকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনায় যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞে শ্রীরাধা সখীগণসহ দুগ্ধ, ঘৃত দান করিতে গিয়াছিলেন। পথে শ্রীকৃষ্ণ দানলীলা করেন। পদাবলীতে এইরূপ পদও আছে।

রাধাপ্রেমামৃত বা গোপালচরিত নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে বস্ত্রহরণ-খণ্ড, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও দানদণ্ড লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। সামান্য পাঠান্তরে এই গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক পদ্যাবলীতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর পূর্ব্বে রচিত বা সঙ্কলিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন দানখণ্ডের অপর কোন পৌরাণিক মূল পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ের "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা" শ্লোকের বৃহত্তোষিণী টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে গদাধর দাসের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের দানলীলার উল্লেখ আছে। শ্রীনিত্যানন্দ গদাধরের গৃহে আসিয়া দেখিলেন গদাধর দাস মাথায় গঙ্গাজলের

কলসী লইয়া—"কে দুগ্ধ কিনিবে" বলিয়া গোপীভাবে মত্ত হইয়া আছেন। আর—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সে সময় দানখণ্ড গান প্রচলিত ছিল। ইহা চণ্ডীদাসের দানখণ্ডও হইতে পারে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী দানলীলা লইয়া "দানকেলিকৌমুদী" নাম দিয়া একখানি ভাণিকা রচনা করিয়াছিলেন।

পদ্যাবলীতে দৈত্যারি পণ্ডিত-রচিত শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বংশী চুরির শ্লোক (সংখ্যা ২৫৪) আছে। নৌকাখণ্ড লীলাও বহু প্রাচীন। প্রাকৃত পৈঙ্গলে নৌকাবিলাসের কবিতা—

অরে-রে বাহিহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুঁহ এখনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি॥

ওরে রে কৃষ্ণ (তুমি) নৌকা বাহিতেছ। ডগমগ (নৌকা টলানো) ছাড়, দুরবস্থা করিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দাও, যা চাও তাই লও।

পদ্যাবলীধৃত শ্লোক (সংখ্যা ২৭৫) রচয়িতা মনোহর—

পয়ঃপূরৈঃ পূর্ণা সপদি গতঘূর্ণা চ পবনৈঃ
গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিরেষা প্রবিশতি।
অহো মে দুর্দ্দৈবং পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ো
হরির্বারম্বারং তদপি করতালিং রচয়তি॥

"এই জলপূর্ণা তরণী পবনে ঘূর্ণিতা হইয়া গভীর যমুনাজলে প্রবেশ করিতেছে। হায় আমার একি দুর্দ্দৈব, তথাপি হরি পরম কৌতূহলে বারম্বার করতালি দিতেছেন।" রাধাপ্রেমামৃত বা গোপাল-চরিতে ইহার অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়। রাধাতন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস লীলার বর্ণনা আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নামে একখানি উপপুরাণ আছে। পূর্ব্ব খণ্ডের নাম "রামহৃদয়", উত্তর খণ্ডের নাম "রাধাহৃদয়"। রাধাহৃদয়ে ভারখণ্ডের বর্ণনা পাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ভিন্ন

পদাবলীর মধ্যে ভারখণ্ড লীলার কোন পদ পাওয়া যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৫ সংখ্যক পুঁথির ১০ (খ) পৃষ্ঠায় এই ভণিতাহীন পদটি আছে—

রাধার পিরিতে মন মজাইতে নিজ কান্ধে লয়্যা ভার।
মথুরা যাইতে দুস্তর তরীতে নাইয়া হইয়া করি পার।
এত লঘু কাজ করি ব্রজ মাঝ কিছুই না ভাবি দুখ।
মোরে রসবতি ভালবাসে অতি এই মনে বড় সুখ॥

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানে মান, মাথুর, কলঙ্কভঞ্জনের সঙ্গে 'নৌকাবিলাস' গান করিতেন। গোবিন্দের যাত্রার দলের চল্‌তি দেখিয়া হুগলী শ্রীরামপুরের রাধাকৃষ্ণ দাস যাত্রার দল করেন। তিনি "দানখণ্ড" পালা গাহিতেন। ইহা প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

রাঢ়দেশে "পটুয়া" নামে একটি সম্প্রদায় আছে। অতি প্রাচীনকালে ইহারা "যমপট্টিক" নামে পরিচিত ছিল। প্রায় বারশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত কবি বাণভট্টের "হর্ষচরিতে", তাহারও পূর্ব্বে রচিত বিশাখ দত্তের "মুদ্রা রাক্ষসে" যমপট্টিকের উল্লেখ আছে। বিশাখ দত্তের মতে ইহারা চাণক্যের গুপ্তচরের কার্য্য করিত। আজিও ইহাদের প্রত্যেক 'পটের' শেষে যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের এবং নরক ও যমদূতের ছবি দেখিতে পাই। বর্ত্তমানে ইহাদের বংশ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমাদের গ্রামের পাশে কুলতোড় গ্রামে বহু পটুয়ার বাস ছিল। বাল্যকালে ইহাদের পট দেখিয়াছি। সিউড়ীর নিকট পান্থড়িয়া গ্রামে এখনো কয়েকঘর পটুয়া আছে। পূর্ব্বে ইহারাও পট দেখাইয়া বেড়াইত। মুর্শিদাবাদ জেলার আউগা হইতে শ্রীতিনু চিত্রকর নামে একজন পটুয়া আমাদের বীরভূমে "পট" দেখাইতে আসিত। তাহার নিকট কৃষ্ণলীলার বস্ত্রহরণ, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ডের একখানি পুরাণো পট ছিল। ভারখণ্ডের পটে—আগে শ্রীরাধা, তাহার পিছনে বড়াই, মাঝখানে ভার-কান্ধে শ্রীকৃষ্ণ এবং সর্ব্বপশ্চাতে পসরা মাথায় তিন জন সখীর ছবি আছে। তিনু গাহিত—

সব সুবর্ণের বাঁক খানি বিনানো পাটের শিকা।
কৃষ্ণ নিলেন দধির ভাণ্ড চলিলা রাধিকা॥
আগে যায় সুন্দরী পিছনে পিছনে বড়াই।
মধ্যখানে যায় শ্রীনন্দের কানাই॥

নৌকাখণ্ডের পট দেখাইয়া তিনু গান করিত—(গোপীগণ বলিতেছে)

পার কর হে ধীবর মাঝি বেলাপানে চেয়ে।
দধি দুগ্ধ নষ্ট হলো বিকী গেল বয়ে॥

(কৃষ্ণ) সব সখীকে পার করিতে লব আনা আনা।
শ্রীরাধাকে পার করিতে লই কানের সোনা॥

রাঢ়ে পল্লীগ্রামের বহু রমণীর মুখে আজিও এ ছড়া শুনিতে পাই।

বহু প্রাকৃত কবিতায়, জৈন, বৌদ্ধ এবং মধ্যযুগীয় সন্তগণের সাধন-সঙ্গীতে ও কবিতায়, এবং মরমিয়া সুফী সম্প্রদায়ের গানে বৈষ্ণব কবিতার ভাব-সাদৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধন-পদ্ধতির পার্থক্য থাকিলেও ভাবের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালায় জৈন বৌদ্ধগণ প্রায় দুই হাজার বৎসরের অধিবাসী। শকাব্দার সপ্তম শতক হইতেই সুফীগণ এদেশে আসিতে সুরু করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালেও এই অভিযান অব্যাহত ছিল। তীর্থ-পর্য্যটন ও বিদ্যালাভের জন্য উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বাঙ্গালীর যাতায়াতের ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। সুতরাং ভাবের আদান-প্রদানে কোন বাধা ছিল না। আমি "বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস" হইতে কয়েকটি কবিতা ও অনুবাদ তুলিয়া দিতেছি। প্রাকৃত পৈঙ্গলের কবিতা—

সো মহ কন্তা, দূর দিগন্তা। পাউস আএ, চেউ চলায়ে॥
সেই মোর কান্ত, (এখন) দূর দিগন্তে। প্রাবৃষ আসে, চিত্ত হয় চঞ্চলিত।
গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর। ফুল্লই নীব কি বুল্লই ভামর॥
একল জীঅ পরাহিণ অম্মহ। কীলউ পাউস কীলউ মম্মহ॥

মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, অম্বর শ্যামল, নীপ ফুটিয়াছে, ভ্রমর বুলিতেছে। আমার একলা জীবন পরাধীন ; প্রাবৃষ ক্রীড়া করুক, মন্মথও ক্রীড়া করুক।

ফুল্লিঅ কেসু চন্দ তহ পঅলিঅ
মঞ্জরি তেজ্জই চুআ।
দক্‌খিন বাঅ সীঅ ভই পবহই
কম্প বিওইণি হীআ॥

কেঅলি-ধুলি সব দিস্ পসরিঅ
পীঅর সব্বউ ভাসে।
আই বসন্ত কাই সহি করিহই
কন্ত ন থক্কই পাসে॥

কিংশুক প্রস্ফুটিত, চন্দ্রও প্রবল, চুতমঞ্জরী প্রকাশ পায়। দক্ষিণ বায়ু শীতল হইয়া প্রবাহিত হয়। বিয়োগিনার হৃদয় কাঁপে, কেতার ধুলি সব দিকে প্রসারিত, সব কিছু পীত বর্ণে রঞ্জিত, বসন্ত আগত। সখি কি করি, কান্ত যে পাশে থাকে না।

জৈন কবির দোহা—

জই কেঁবহ পাবীসু পিউ অক্কই কোডি করীসু।
পাণিউ ণবই সরাবি জিঁব সব্বংগে পইসীসু॥

যদি কোনমতে প্রিয়কে পাই (তবে উহাকে) গাঢ় আলিঙ্গন করি, এবং নূতন শরায় জলের মত সর্ব্বাঙ্গে শুষিয়া লহ।

বৌদ্ধ-সাধকগণের কবিতা—

উঠ ভড়ারো করুণমণু পেকখ্‌সি মহু পরিণাব।
মহাসুহ জোএ কাম মহু ইচ্ছ সুন্ন সহাব॥
তোমহা বিহুণে মরমি হউ উঠহি তুহুঁ হেবজ্জ।
ছাড় হি সুন্ন সহাবতা সবরিঅ সাঝউ কজ্জ॥
লোঅ নিমন্তিঅ সুরঅ পহু সুন্ন অচছসি কাস।
হউ চণ্ডালী বিন্ন ণমি তই বিণু উহমি ন দিস॥
ইন্দী আলো তুট্ট তুহুঁ হউ জানমি তুহ চিত্ত।
অম্হে ডোম্বী ছেঅমণু মা কর করুণ বিছিত্ত॥

উঠ স্বামি করুণামনা, আমার পরিণাম তুমি দেখ। মহাসুখযোগে কামমধু ইচ্ছা কর হে শূন্যস্বভাব। তোমা বিহনে আমি মরি, হেবজ্র তুমি উঠ, শূন্য স্বভাব ছাড়। শববার কার্য্য সিদ্ধ হউক। লোক নিমন্ত্রণ করিয়া হে সুরতপ্রভু, কেন শূন্য রহিয়াছ। আমি চণ্ডালী, বিজ্ঞ নই। তোমা বিনা দিশা পাই না। ইন্দ্রজাল তোড় তুমি, আমি জানি তোমার চিত্ত। আমি ডোম্বী বিরহকাতরা, করুণা বিক্ষিপ্ত করিও না।

সুফী কবিতা (শাহ ফরিদুদ্দীন)। ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ।—

তপি তপি লুপি লুপি হাথ মরোড়উ।
বাওলী হোই সো শহু লোরউ॥
তই সহি মন মহিঁ কীয়া রোষ।
মুঝ অওগণ সহি (তাস) নাহি দোষ॥
তই সাহিব কী মই সার ন জানী।
জোবন খোই পাছই পছতানী॥ ধ্রু॥
কালী কোইল তু কিতগুণ কালী।
অপনে প্রীতমকে (হউ) বিরহই জালী॥
পির হি বিহুন কতহি সুখ পায়ে।
জো হোই কৃপাল তা প্রভু মিলায়ে॥
বিদ্ধণ খুহী মুন্ধ ইকেলি।
না কো সাথী না কো বেলী॥
করি কিরপা প্রভু সাধসঙ্গ মেলী।
জা ফিরি দেখা তা (মেরা) অল্লাহ বেলী॥
বাটা হমারী খরীউ ভীনী।
খন্নি অহু তিখী বহুত পিঙ্গণী॥
উস উপর হই মারগ মেরা।
শেখ ফরীদা পন্থ সমহারি সবেরা॥

(বিরহ) জ্বরে পুড়িয়া পুড়িয়া আমি হাত জোড় করিতেছি, বাউলী হইয়া আমি সেই স্বামীকে খুঁজিতেছি। সখি, সে মনের মধ্যে রোষ করিয়াছে, আমারি গুণহীনতা, সখি, তাহার দোষ নাই। সেই স্বামীর আমি সার (মর্ম্ম) জানিলাম না, যৌবন খোয়াইয়া শেষে অনুতাপ (ভোগ) করিতেছি। কালো কোকিল, তুই কত গুণ কালো। আমার প্রিয়তমের বিরহে আমি জ্বলিতেছি। (বিরহ) পীড়া বিহীন (কোকিল) কত সুখ পায়। যে কৃপালু হয় সে প্রভুর সঙ্গে (আমাকে) মিলাইয়া দেয়। দুঃখের কূপে আমি একেলা নারী। না আছে কোন সাথী, না আছে কোন সাহায্যকারী। কৃপা করিয়া প্রভু সাধুসঙ্গ

মিলাইয়াছেন। (কিন্তু) যখন (ঘরে) ফিরিয়া দেখি তখন ঈশ্বরই আমার সহায়। পথ আমার দুর্গম দুরত্যয়, খড়্গের মত তীক্ষ্ণ ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহারই উপর দিয়া আমার পথ। শেখ ফরিদ, বেলাবেলি পথ চিনিয়া লইতে হইবে।

মহাপ্রভুর সম-সাময়িক ধর্ম্মপ্রচারক সাধু কবীরের রচিত এই ভাবের বহু কবিতা আছে। কবীর, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতায় কবিগণের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধ, জৈন বা সুফী প্রভাবের আভাস, অথবা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের কবিতায় কবীর প্রভৃতি সন্তগণের কবিতার ভাবের সাদৃশ্য যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, আমাদের তাহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই। শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী কবিগণের প্রেরণার উৎস ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তবে এই কবিগণের অনেকেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং প্রভাব থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপাই নাই যে, প্রকাশভঙ্গীতে ও বিষয়-গৌরবে বৈষ্ণব-পদাবলী সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা এবং ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে নূতন।

সংস্কৃত কাব্যে এবং খণ্ড কবিতায়, প্রাকৃত কবিতায় ও লোকসঙ্গীতে যে ভাবধারা কোথাও বা সিকতাতলবাহী ফল্গুধারার মত, কোথাও বা গিরিবক্ষ-বিলম্বিত নির্ঝরিণীর ন্যায় সমাজবক্ষে প্রবাহিত হইত, বৈষ্ণব-পদাবলীরূপে তাহাই একদিন বিপুল প্লাবনে উৎসারিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতাই বাঙ্গালা সাহিত্যের অতীত এবং বর্ত্তমানের সংযোগসূত্র।

৩। শ্রীগৌরচন্দ্র

তুর্কী আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিল। আচারে, অনুষ্ঠানে, অশনে-বসনে, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী এক বিজাতীয় সম্প্রদায় দেশের অধীশ্বর হইয়া বসিল। ইহাদের শাসনে শোষণে, বিজেতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে দেশবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের বিলাস-ব্যসনের উদ্দাম স্রোতে বহু নরনারী ভাসিয়া গেল। ইহাদের পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা, স্বধর্ম্ম প্রচারে হিংস্র নিষ্ঠুরতা দেশকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। হিন্দু সহজে পরাধীনতা স্বীকার করে নাই। মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়াছে, দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহ সার্থক হয় নাই, চেষ্টা সফলতা লাভ করে নাই। রাজনীতির খেলায় বাঙ্গালী হারিয়া গিয়াছে। কোন কোন নরাধমের দেশদ্রোহিতাই এই পরাজয়ের প্রধান কারণ। কর্ম্ম-বিমুখতা, বিলাসিতা, সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অনুসঙ্গে আরও কারণ ছিল। বাঙ্গালী-প্রধান কেহ কেহ তখন অন্য পথ ধরিলেন, তাঁহারা রাজার জাতির সঙ্গে অসহযোগ অবলম্বন করিলেন। সমাজ-পতিগণ স্বজাতিকে কর্মঠ বৃত্তি গ্রহণের বিধান দিলেন। কূর্ম্ম যেমন নিজের কঠিন পৃষ্ঠাবরণে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লুকাইয়া রাখে, ইহারাও তেমনই কঠোর আচার নিয়মের বিধি-বিধানের দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরালে জাতিকে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার ফল শুভ হইল না। জাতির জীবনস্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। ক্রমে তাহা শ্বাসরোধী বিষ-বাষ্পপূর্ণ দুর্গন্ধময় বদ্ধজলায় পরিণত হইল। একদিকে অশনে বসনে অনুকরণপ্রিয় রাজানুগ্রহপুষ্ট কর্ম্মচারী, জায়গীরদার, এবং নিয়োগী চৌধুরী সরখেল তরফদারের দল। সাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সাধারণের সুখ-দুঃখে উদাসীন, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা-মদমত্ত এই সম্প্রদায় সাধারণকে কৃপার চক্ষে দেখিতে লাগিল। অন্যদিকে জাতিলোপ ভয়ে সন্ত্রস্ত, ভীরু, শুষ্ক আচার-নিয়মের কঙ্কালালিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট, রুদ্ধশ্বাস বদ্ধজলার অধিবাসী মণ্ডূকবর্গ! এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিলেই মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, মানুষ দলে দলে ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিতেছে, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশের উপক্রম ঘটিল, বাঙ্গালী জাতিটাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, শান্তিপুরের শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইঁহারই তপস্যায় বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশ প্রসন্ন ও নির্ম্মল হইয়াছিল, এবং সেই আকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন।

আমরা দায়বদ্ধ জীব। পূর্ব্বাচার্য্যগণ আমাদিগকে অবশ্য-পরিশোধ্য তিনটি সহজাত ঋণের দায় দিয়া গিয়াছেন। এই তিনটি ঋণ—ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ এবং দেব-ঋণ। ইহাই ত্রিবর্গ,—ইহার অপর নাম ধর্ম্ম, কাম, অর্থ অথবা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা।

বিদ্যারম্ভের পর বালককে গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। গুরু শিক্ষার্থীকে বিদ্যাদান করিতেন। এখন বিদ্যা কেহ দান করে না, বিদ্যা ক্রয় করিতে হয়। এখনকার বিদ্যালয়, বিদ্যা-বিপণি। তথাপি এই ঋণ অবশ্য পরিশোধ্য। আমি কিনিলাম, কিন্তু অপরকে দান করিব, যতদিন এই মনোভাব না আসিবে, ততদিন দেশের কল্যাণ নাই। এই বিদ্যার ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। শিক্ষাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই শিক্ষা। মানব ধর্ম্মের, মনুষ্যত্বের সাধনাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। পরে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে সাহায্যদান-পূর্ব্বক এই শিক্ষার ঋণ—ঋষি-ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ইহা ব্রত, এই ব্রত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করিতে হইবে। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে সাহায্যদান এবং শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠাও এই ব্রতের অঙ্গ।

দ্বিতীয় ঋণ পিতৃ-ঋণ—ইহাই কাম, ইহার অপর নাম স্বাস্থ্য। বিদ্যাশিক্ষা সমাপনান্তে দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। সমাজ যাহাতে সবল সুস্থ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হয়,—তজ্জন্য নিজের এবং পত্নীর স্বাস্থ্য রক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তিলেকের তরেও একথা ভুলিলে চলিবে না। এই দেহ ভগবানের মন্দির, তাঁহার বিহারভূমি। এই দেহকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিতে হইবে। সংযমী হও, মিতাচারী ও মিতাহারী হও, তবেই তোমার পিতৃ-ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা জন্মিবে। তুমি যে ভাবধারার ধারক ও বাহক, তোমার স্থলাভিষিক্তের হস্তে যতক্ষণ সেই ভাবধারার আধার ব্রহ্মকমণ্ডলু ন্যস্ত না করিতেছ, ততক্ষণ তুমি ঋণী হইয়া থাকিবে। ঔষধ পথ্য বিতরণ, সেবা, এই ঋণ পরিশোধের অন্যতম পন্থা।

তৃতীয় ঋণ—দেব-ঋণ, ইহাকেই আমরা ত্রিবর্গের অন্যতম অর্থ বা জীবিকা বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। যজ্ঞই এই দেব-ঋণ পরিশোধের প্রকৃষ্ট উপায়। দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। পরার্থে আত্মোৎসর্গের নামই যজ্ঞ। এই জীবনটাই যজ্ঞ, "দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ"—এই পরস্পর ভাবনার সেতু হইল যজ্ঞ। যজ্ঞের দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। অজরামরবৎ বিদ্যা ও অর্থের চিন্তা করিবে, সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে, এবং সেই অর্থে সমাজের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে, ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠান করিবে। পঞ্চ যজ্ঞ আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয়।

এ পর্য্যন্ত আচার্য্যগণ অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যের কথাই বলিয়াছেন। এই সমস্ত কথায় তাঁহাদের সঙ্গে কাহারো বিরোধ নাই। কিন্তু অপর একটি ঋণের কথা তাঁহাদের মনেই হয় নাই। অথচ এইটিই প্রধান ঋণ, এমন কি আসল ঋণ। অপর তিনটি ঋণের সঙ্গেও এ ঋণের সম্বন্ধ আছে। এই ঋণের কথা বিস্মৃত হইয়া অপর তিনটি ঋণ পরিশোধ করিতে যাওয়া প্রায় "হস্তিস্নানবৃথৈব তৎ"। প্রাচীন ঋষি দুই চারিজন এই ঋণের কথা বলিয়াছেন। সনৎকুমার নারদকে ইহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই ঋণ আনন্দের ঋণ, মাধুর্য্যের ঋণ।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দেন প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"॥ যাঁহারা ব্রহ্মকে—মধু বলিয়া, রস বলিয়া, আনন্দ বলিয়া, ভূমা বলিয়া জানিয়াছেন—তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ঋষি, উত্তম দ্রষ্টা, প্রকৃত রসিক এবং ভাবুক। তাঁহারা বলিয়াছেন—শ্রীভগবান রসস্বরূপ, তিনি সচ্চিদানন্দময়। আনন্দ হইতেই ভূত সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আনন্দেই বাঁচিয়া আছে, শেষে আনন্দেই লয় পাইবে। ঋষি বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। আনন্দই অমৃত, এই অমৃতের আস্বাদনে—মানবের কোন ভয়ই থাকে না, এমন কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায়।

এই আনন্দের কথা মানুষ ভুলিয়াছিল। এক কথায় সে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, আপন অস্তিত্বের কথাই তাহার স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। "স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"—স্মৃতি ভ্রংশে বুদ্ধিনাশ ঘটে, বুদ্ধিনাশে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অখিল জগতের যখন এই দুরবস্থা, সেই সময়

সমগ্র বিশ্বের, সমস্ত মানবজাতির ঋণভার গ্রহণপূর্ব্বক সেই ঋণ পরিশোধের জন্য যিনি আবির্ভূত হইলেন, তিনি বাঙ্গালীর প্রাণ-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীগৌরচন্দ্র। এই আনন্দের ঋণ, প্রেমের ঋণই রাধা-ঋণ। শ্রীচৈতন্যদেব এই ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়া, এই ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, সারা পৃথিবীকে ঋণী করিয়া গিয়াছেন।

আনন্দই অমৃত, নিরানন্দই মৃত্যু। আনন্দিতের মৃত্যু নাই। তাই তো বলিয়াছি পূর্ব্বের যে তিনটি ঋণ, তাহাও যদি আনন্দের সঙ্গে পরিশোধ করিতে না পার, তবে তোমার ঋণ অপরিশোধ্যই থাকিবে। কর্ম্ম শুধু নিষ্কাম হইলেই চলিবে না। মহাপ্রভু কর্ম্মফল পরিত্যাগকেও "এহ বাহ্য" বলিয়াছেন। সর্ব্বকর্ম্ম ভগবৎ পদপ্রান্তে সমর্পণপূর্ব্বক আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সাক্ষাৎভাবে তাঁহারই জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, এই সাধনাই প্রকৃত সাধনা। আনন্দ সত্যবস্তু, আনন্দকে জান, আনন্দের আস্বাদন কর—"রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি"। আপনি আস্বাদন করিয়া সেই আনন্দ অপরকে দান কর, ইহাই আনন্দের ঋণ পরিশোধের উপায়।

আনন্দকে কেমন করিয়া জানিতে হয়, কেমন করিয়া আনন্দের আস্বাদন করিতে হয়, জগৎকে আনন্দ দান করিতে হয়, ব্রজগোপীগণ আপনি আচরি তাহা জগতের জীবকে শিখাইয়া গিয়াছেন। এই গোপীগণের মধ্যে প্রধানা হইলেন শ্রীমতী বাধা ঠাকুরাণী। আনন্দদানের পথ-প্রদর্শনে তিনি ত্রিভুবনধন্যা, ত্রিভুবনের অগ্রগণ্যা। তাই তাঁহারই ভাবকান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরচন্দ্রের অভ্যুদয়।

আনন্দ দান করিতে হইলে, আনন্দের আস্বাদন করিতে হইলে জগৎকে ভালবাসিতে হইবে। জগদীশ্বরকে ভাল না বাসিলে জগৎকে ভালবাসা যায় না। কেমন করিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া আপনা বিলাইয়া—তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়,—সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনায় শ্রীমতী রাধারাণীই তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার ভালবাসায় ঋণী হইয়া স্বয়ং আনন্দময়ই তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্যই সচ্চিদানন্দময় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অবতার গ্রহণ। এ ঋণ আজিও পরিশোধিত হয় নাই। তোমাকে, আমাকে, জগতের প্রত্যেক নর-নারীকে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য দায়।

আনন্দই মানবের চরম এবং পরম কাম্য। জানিয়া না জানিয়া মানুষ এই আনন্দের অনুসন্ধানেই প্রাণপাত করিতেছে। আনন্দের স্বরূপ না জানিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুই প্রকৃত আনন্দলোকের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিলেন। মানবকে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান দান করিলেন। বলিলেন—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছায় আনন্দ নাই, শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ। তিনি মানুষকে আনন্দাস্বাদনের পথ প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের আরও কয়েকটি নাম ছিল,—একটি নাম নিমাই, আর একটি বিশ্বম্ভর। দেহের বর্ণ স্বর্ণ জিনিয়া উজ্জ্বল গৌর ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকিত। নিমাই-এর পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শ্রীশচী দেবী। নিমাই দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মানবদুঃখ দূরীকরণে বাঙ্গালাকে কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন, নিমাই সেই শ্রীমাধবেন্দ্র-শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ কেশব ভারতী তাঁহাকে সন্ন্যাস দান করেন। শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীকেশব ভারতী দুইজনই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। সন্ন্যাসাশ্রমে নিমাইএর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইলেন। রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া, তাহারই সমান্তরালে, বাঙ্গালায় তিনি এক নূতন আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। তিনি বলিলেন, শ্রীভগবান আছেন। তিনি করুণাময়, আনন্দময়। জগৎ জীবের জন্য—জগতের স্থাবর জঙ্গম জড় চেতনের জন্য তাঁহার করুণার অন্ত নাই। আনন্দ বিতরণের জন্য তিনি ব্যাকুল। তিনি নন্দনন্দন, তিনি নন্দযশোদার দুলাল, ব্রজরাখালগণের বন্ধু, ব্রজ-গোপ-ললনাগণের প্রিয় দয়িত। তিনি ভালবাসার কাঙ্গাল, তিনিই সত্যবস্তু, তাঁহাকেই ভালবাসিতে হইবে। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, প্রেমই একমাত্র কাম্য বস্তু। এই প্রেম দিয়াই প্রেমময়ের উপাসনা মানবের চরম এবং পরম সাধন।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন—"জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস"। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই। চরিত্রই মানুষের মেরুদণ্ড, প্রেমই জগতের প্রাণ, এই প্রেমই মানুষ চিনিবার নিকষ পাষাণ। প্রেমিক যে সেই দ্বিজোত্তম, সেই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। এই প্রেম আনন্দ চিন্ময়রস, এই প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু। কোনও

সাধনায় এ প্রেম পাওয়া যায় না। অকপটে শ্রীভগবানের নাম, লীলা, গুণ গান করিলে একান্তভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে, তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গলাভ ঘটে। ভক্তগণের কৃপা হইলেই প্রেমলাভ হয়। তাই তিনি শ্রীভগবানের নাম—শ্রীহরি-নাম প্রচার করিয়াছিলেন, প্রচারের উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে নবদ্বীপেই ইহার শুভারম্ভ হয়, সেই হইতেই বাঙ্গালায় সংকীর্ত্তনের অভ্যুদয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মানুষ তাঁহাকে দেখিল, কষিত-কাঞ্চন-কান্তি, অশ্রুধৌত প্রেম-বিগ্রহ, করুণার অবতার। মানুষ দলে দলে আসিয়া তাঁহার চরণকমলে শরণ গ্রহণ করিল। ক্ষমতার তুঙ্গশিখরে সমাসীন পদবীধারী রাজবল্লভ, আভিজাত্যের প্রাকার-বেষ্টনে আবদ্ধ ঐশ্বর্য্যশালীর আদরের দুলাল, পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব-গৌরবে স্ফীত অধ্যাপক, বিত্তবান্ কুলপতি, বিদ্যামদোদ্ধত ছাত্র, সহায়-সম্বলহীন কদলীপত্র-বিক্রেতা, পরিচয়হীন ভিক্ষুক, সমাজে অবহেলিত অস্পৃশ্য—সব একসঙ্গে মিলিয়া সমাজের অভিনব সমতলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রবীণ ব্রাহ্মণ, আচারে পাণ্ডিত্যে মর্য্যাদায় সমাজের যিনি শিরোমণি ছিলেন, গৌরবের শীর্ষদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া ভগবদ্ভক্ত যুবক শূদ্রের চরণ বন্দনা করিলেন। ভুঁইমালী মোহান্ত পদবীতে উন্নীত হইলেন, সৎগোপ আচার্য্যের আসনে আসিয়া বসিলেন। যবন হরিদাস বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বন্দনীয় হইয়া উঠিলেন। এমন কি, মদ্যপ লম্পট স্বেচ্ছাচারী জগাই মাধাই প্রকৃত সাধুরূপে পুনরায় দ্বিজত্ব লাভ করিলেন। বাঙ্গালী নব জন্মগ্রহণ করিল।

শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। স্বরূপ বলিয়াছেন—"শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার যে মাধুর্য্য শ্রীরাধাকে মুগ্ধ করে, সেই মাধুর্য্যকিরূপ, আর সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দই বা কিরূপ, এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" শ্রীভগবানের বহুত্বে বিলাসের দুইটি ভূমি,—একটি নিখিল বিশ্ব, অপরটি শ্রীমহারাসমণ্ডল। রাস—ভাবের আধারে রসের হিল্লোল। ভাবের মিলনে রসের বিলাস। এই রাসমণ্ডলেই মহাভাবময়ী শ্রীরাধার নিকট শ্রীভগবান্ ঋণী হইয়াছিলেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্যই তাঁহাকে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। এই কথাই আর এক দিক দিয়া বলা যায়,—প্রকৃত মানব ভগবানকে

কেমনভাবে ভালবাসে, কিসের জন্য ভালবাসে, ভালবাসিয়া কি সুখ পায় ইহাই জানিবার জন্য ভগবানকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, কেন ভালবাসিতে হয়, ভালবাসায় কত সুখ জানাইবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ, ভাবের দ্বারা সেই রসকে আস্বাদন করা যায়। ভাবই রসকে প্রকাশ করে, রসের বিকাশ ঘটায়। তাই রসহীন ভাব থাকে না, ভাবহীন রস থাকে না। রসে ভাবে মাখামাখি। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ।

সাহিত্য—যাহা একজনের সঙ্গে আর একজনকে মিলাইয়া দেয়—তাহাও রস ভাবের সমন্বয়ে রচিত। আচার্য্যগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে রসভাবের মিলিত মূর্ত্তি বলিয়াছেন। তিনি আপনার প্রেমধর্ম্ম প্রচারে এই রসভাবকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রস এবং ভাবই তাঁহার ধর্ম্মের বিষয় এবং আশ্রয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর ছয় বৎসর দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে পর্য্যটন করেন। অধ্যাপক-জীবনে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বৎসর কাল শ্রীমহাপ্রভু পুরীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ দিন পুরীধামে রাজগুরু কাশী মিশ্রের প্রদত্ত আবাসবাটী গম্ভীরার গোপন কক্ষে—

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে গায় শুনি পরম আনন্দ॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

এই ধারা অনুসরণ করিয়াই বাঙ্গালায় নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়। কীর্ত্তনে রস এবং ভাবই প্রধান। এই দিক দিয়া আলোচনা করিলে বলিতে হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীনাম ও লীলা-কীর্ত্তনের ঘনীভূত বিগ্রহ। উড়িষ্যার কবি সদানন্দ মহাপ্রভুর নাম দিয়াছিলেন "হরিনাম-মূর্ত্তি"! আমরা বলি তাঁহার জীবন একখানি পরিপূর্ণ সাহিত্য—সুন্দর এবং মনোহর মহাকাব্য।

দনুজমর্দ্দন (রাজা গণেশ) দেবের অভ্যুদয়, তাঁহার গৌড়-সিংহাসন অধিকার, নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন, স্মৃতির নূতন নিবন্ধ প্রণয়ন জন্য বৃহস্পতি মিশ্রকে নিয়োগ, জালালউদ্দীন কর্ত্তৃক পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ, বৃহস্পতিকে রায়মুকুট উপাধিদান—বঙ্গেশ্বররূপে বাঙ্গালা ভাষাকে সমাদরে গ্রহণ, বাঙ্গালার ইতিহাসে বৃহত্তর ঘটনা। কিন্তু বাঙ্গালীর এই জাতীয় অভ্যুত্থান স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। রাজধানী হইতে দূর পল্লীতে এই ভাব-প্রবাহ ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল কিনা, সে

বিষয়েও সন্দেহ আছে। তথাপি ইহা ব্যর্থ হয় নাই। এই ঘটনায় বাঙ্গালী আপনাকে চিনিয়াছিল। বাঙ্গালী প্রধানগণের হৃদয়ে তীব্র দুঃখবোধ জাগ্রত হইয়াছিল। কয়েকজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এই জাগরণকে এক নবভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ইহার সূত্রধার। শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীলক্ষ্মীপতিপুরী, শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং রাঢ় বঙ্গের বহু মনীষী ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মাধবেন্দ্র-শিষ্য আচার্য্য অদ্বৈতকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপে ধীরে ধীরে একটি গণ-আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। জাতির বেদনা, জাতির হৃদয়াবেগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভাব-বোধ, অবিলম্বে এক **মহত্তর আবির্ভাবে** কেন্দ্রীভূত হইল। "বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া" শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অভ্যুত্থিত হইলেন। অপ্রাকৃত প্রেম, অমায়িক করুণা, অলৌকিক চরিত্র, অসাধারণ শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অপরিসীম ত্যাগ, অনুপম রূপ এক অপরূপ লাবণ্যবল্লরীর লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া বাঙ্গালায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। তিনি আপনাকে বিলাইবার জন্য—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল বাণী চ ॥

ঘনরসময়ী গভীরা, বক্রোক্তির (অর্থান্তরে বঙ্কিম প্রবাহের) জন্য সৌন্দর্য্যময়ী কবিদের দ্বারা আস্বাদিতা, অবগাহনে কৃতার্থতাদায়িনী, সুরধুনী-সদৃশা পবিত্রা বঙ্গবাণীকেই গ্রহণ করিলেন। জয়দেব হইতে চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল হইতে বিদ্যাপতি, তাঁহার মধ্যে আসিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। বসন্তের অকৃপণ দান যেমন তরু-তৃণ-লতা-গুল্মকে শোভায় ও সৌন্দর্য্যে একটি স্বতন্ত্র মহিমায় মণ্ডিত করে, বর্ষার ধারা-বর্ষণ যেমন প্রকৃতিকে শ্যাম সমারোহে কান্ত, কোমল ও সমুজ্জ্বল করে, পিক ও পাপিয়ার গানে স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার করিয়া দেয়, শ্রীচৈতন্যের সুনির্ম্মল প্রীতি ও সুগভীর করুণা, তেমনই বাঙ্গালী হৃদয়কে সুন্দর শ্যামল ও সঙ্গীতময় করিয়া তুলিল। ত্যাগে, তপস্যায়, দুঃখ-বরণে, সহিষ্ণুতায়, সংযমে ও শুচিতায় বাঙ্গালীর নব-জাতীয়তা গড়িয়া উঠিল। কত নাম না জানা ফুল, কত নাম না জানা পাখী, কত অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত, বাঙ্গালা জুড়িয়া উৎসব! ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, দীনদুঃখী, অধম, পতিত, দুর্গত, অস্পৃশ্য, কবি, গায়ক, সাধক দলে দলে আসিয়া সে উৎসবে যোগদান করিলেন।

৪। কীর্ত্তন

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমান্ প্রহ্লাদকে কৃষ্ণনামে ভুলানো গেল না। হিরণ্যকশিপু, ষণ্ড ও অমর্ক নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আদেশ দিলেন—প্রহ্লাদকে কৃষ্ণবিমুখ কর। কিছুদিন গত হইল, তিনি ষণ্ড ও অমর্ককে বলিলেন, পুত্রকে লইয়া আইস, কেমন অধ্যয়ন করিতেছে দেখি। অধ্যাপকদ্বয় শিষ্যকে লইয়া আসিলেন। সম্রাট্ পুত্রকে কোলে লইয়া আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বলতো বৎস, কেমন অধ্যয়ন করিতেছ? উদ্ধৃত শ্লোকে প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন—"বিষ্ণুর নাম-গুণ-লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং বিষ্ণুকে আত্মনিবেদন, এই নবলক্ষণা ভক্তি তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে সমর্পণ করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান, আমি পুরুষের উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি। শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে কীর্ত্তনের উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র জাতানুরাগ ভক্তের কথায় বলিয়াছেন—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভগবানের নাম, গুণ, লীলা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের প্রথা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় কীর্ত্তন একটি বিশেষ অর্থে অভিহিত হয়। কীর্ত্তন বলিতে একজনের গান বুঝায় না। কয়েকজনে মিলিয়া নির্দ্দিষ্ট সুর তাল লয়ে গীত এক স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে শ্রীভগবানের নাম-গুণ-লীলাত্মক যে গান, বাঙ্গালায় তাহাকেই কীর্ত্তন বলে। মহারাষ্ট্রীয় সাধু তুকারামের অভঙ্গের নাম কীর্ত্তন, কিন্তু তাহার সঙ্গে বাঙ্গালার কীর্ত্তনের কোন

সম্বন্ধ নাই। পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীভগবানের নামগুণাদি গানকে ভজন-সঙ্গীত বলে। বাঙ্গালায় বৈষ্ণব-পদাবলী গানই কীর্ত্তন নামে পরিচিত। কালী-কীর্ত্তন পরবর্ত্তী কালে রচিত।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—শ্রীভগবানের "নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্"।

নাম লীলা ও গুণাবলীর উচ্চভাষণকে কীর্ত্তন বলে। কীর্ত্তনের দুই রূপ—নামকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন। বেদাদি শাস্ত্রে এবং বিবিধ পুরাণে শ্রীভগবানের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিতে শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন একমাত্র ধর্ম্ম।

সত্যে যদ্ ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

সত্যযুগে ধ্যানে—ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে পরিচর্য্যায় এবং কলিতে হরি কীর্ত্তনে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

নাম করিতে গেলেই নামীর কথা আসিয়া পড়ে। তাঁহার রূপের কথা, তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার বিবিধ লীলার কথা স্মৃতিপথে আসিয়া উদিত হয়। নিষ্ঠাপূর্ব্বক নাম গান করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। নাম-গুণ-লীলার মধ্যে রূপের কথা মাখামাখি হইয়া আছে, তাই পৃথকভাবে রূপের উল্লেখ করা হয় নাই।

লীলা-গানের কথায় শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিত অনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত।

হে নৃসিংহ, তোমার চরণযুগল আশ্রয়কারী, মহাজ্ঞানী ভক্তগণের সঙ্গবলে, রাগাদি পরিহারপূর্ব্বক প্রিয় সুহৃদ ও পরদেবতাস্বরূপ তোমার বিরিঞ্চি-গীত

মহিমময়ী লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়া আমি সমস্ত দুঃখ তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞানে অতিক্রম করিব।

টীকাকার শ্রীধর স্বামী বিরিঞ্চিগীত অর্থে বলিয়াছেন—"বিরিঞ্চি হইতেই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।" ভাগবতধর্ম্মেও যেমন, সঙ্গীতেও তেমনই—ব্রহ্মা পুত্র নারদকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারদ হইতেই ভাগবতধর্ম্ম এবং মার্গ সঙ্গীত তথা ভগবানেব নাম, গুণ ও লীলা গান মর্ত্ত্যলোকে প্রচারিত হইয়াছে।

নাম, গুণ ও লীলা গানের দুইটি ধারা—একটি শুক-কীর্ত্তন, অন্যটি নারদ-কীর্ত্তন। নারদের শিষ্য মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস, ব্যাসশিষ্য (পুত্র) শুকদেব। শুকদেব শ্রীভগবানের নাম, লীলা ও গুণ-কীর্ত্তনের (শ্রীমদ্ভাগবত তথা পুরাণ-কথনের) পৃথক ধারার প্রবর্ত্তক। শুক-কীর্ত্তনে কাল বিচার নাই। পুরাণ-পাঠক দিবাভাগে শ্রীরাসলীলা ও রাত্রে গোষ্ঠলীলা কীর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু নারদ-কীর্ত্তন—লীলাকীর্ত্তনে কীর্ত্তন-গায়ক দিবায় রাস ও রাত্রে গোষ্ঠ গান করিতে পারেন না। প্রাচীনকালে মার্গসঙ্গীতেও রাগ-রাগিণী আলাপের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোন এক সময়ে কোন কোন রাগের আলাপ নিষিদ্ধ ছিল। স্বরের বৈচিত্র্য ও রঞ্জকতা অনুসারে রাগের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাগ-তরঙ্গিণী-প্রণেতা লোচন বলিয়াছিলেন—

'যথাকালে সমারব্ধং গীতং ভবতি রঞ্জকম্।
অতঃ স্বরস্য নিয়মাদ্ রাগোঽপি নিয়মঃ কৃতঃ'॥

অবশ্য লোচন ইহাও বলিয়াছেন—

"রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞায়াং কালদোষো ন বিদ্যতে"।

রঙ্গমঞ্চে এবং রাজসভায় গানের কালদোষ নাই। ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

এসব রাগের যে যে কালে গুণযুক্ত।
সে সকল সময় সঙ্গীত শাস্ত্রে উক্ত॥
অসময় গানে গায়কের দোষ হয়।
গুর্জ্জরী রাগাদি গানে সে দোষ নাশয়॥
সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবঃ।
শ্রেণীবন্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদম্॥

লোভান্মোহাশ্চ যে কেচিদ্‌গায়ন্তি চ বিয়োগতঃ।
সুরসা গুর্জ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে।
বসন্ত রামকেরী গুর্জ্জরী এই ত্রয়ে।
সর্ব্বকাল গানে কোন দোষ না জন্ময়ে॥
বসন্তো রামকেরী চ গুর্জ্জরী সুরসাপি চ।
সর্ব্বস্মিন গীয়তে কালে নৈব দোষাঽভিজায়তে।

নারদ ব্যবস্থা দিয়াছেন—

দশদণ্ডাৎ পরে রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্।

যদিও নারদ বলিয়াছেন, রাত্রি দশ দণ্ডের পর সমস্ত সুরেরই গান করা চলিবে, তথাপি কীর্ত্তনীয়াগণ এ বিষয়ে কঠোর নিয়ম মানিয়া চলেন। কারণ ইহার মধ্যে ভোরে ভৈরবী, সন্ধ্যায় পূরবী, এইরূপ রাগ-রাগিণী আলাপের প্রশ্নই নাই, ইহার মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাপর্য্যায়েব সময়েব প্রশ্নও আছে। যে সময়ে যে লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে লীলা সেই সময়ে গাইতে হইবে।

ঝুলন, নন্দোৎসব, দোল, ফুলদোল প্রভৃতি তত্তৎ পর্ব্বদিন ভিন্ন গাহিবার উপায় নাই। দিনে রাস, রাত্রে গোষ্ঠ গান নিষিদ্ধ। উত্তর-গোষ্ঠ অপরাহ্ণেই গাহিতে হইবে। কুঞ্জভঙ্গ ও খণ্ডিতা সকাল ভিন্ন গাওয়া চলিবে না। মান, কলহান্তরিতা বৈকালের গান নহে। এই সমস্ত গানে রাগ-রাগিণী সংযোজনে যেমন বিষয়বস্তু ও ভাবরসের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, তেমনই সময়েরও বিচার করা হইয়াছে।

আরও কয়েক শ্রেণীর গান আছে। যেমন প্রার্থনা গান, ইহা প্রায় নামকীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত। আত্মনিবেদনও প্রার্থনার পর্য্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত গানে কাল বিচার নাই। কিন্তু সূচক গান—শোক সঙ্গীত, শ্রীপাদ রূপাদির তিরোভাবে রচিত গান, তত্তৎ মহাজনগণের তিরোভাবে তিথি ভিন্ন অন্য সময় গাহিবার রীতি নাই।

আমরা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কীর্ত্তনের বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারি। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গ্রন্থ। ইতিপূর্বে দেব-কাহিনী লইয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। যেমন কৃত্তিবাসের 'রামমঙ্গল' রামায়ণ, গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'। দেবতা ও মানুষের কাহিনী

লইয়া কয়েকজন কবি ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। মানুষের কাহিনী লইয়া খণ্ড খণ্ড গীতও রচিত হইয়াছে, যেমন যোগিপাল-গীত ইত্যাদি। কিন্তু একজন মানুষকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মহত্তম আবির্ভাবের ঘোষণা প্রচারের জন্য মহাকাব্য রচনা এই প্রথম। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, কবি বৃন্দাবন দাসের এই প্রথম প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। শৈলী পৃথক হইলেও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আসলে মঙ্গলকাব্য। কারণ কবি ইহার নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও এই নামের উল্লেখ আছে। পরে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ ইহার নাম রাখেন—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। এই চৈতন্য-ভাগবতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনা এইরূপ—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

"যাঁহাদের ভুজযুগল আজানুলম্বিত, কান্তি কনকের মত নির্ম্মল, নয়ন কমলায়ত, যাঁহারা সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক, যুগধর্ম্ম-পালক ও প্রেমভক্তি দ্বারা বিশ্বপোষক, সেই দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ জগৎমঙ্গলকারক, করুণাবতার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি"। সংকীর্ত্তনের পিতা, সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ, ইহা সত্য কথা। কিন্তু এই অবতার-যুগলের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও দেশে কীর্ত্তন ছিল। কীর্ত্তন ছিল—তবে এমন সমবেতভাবে, সমাজের এমন অভিনব সমতলে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে মিলিয়া কীর্ত্তন গানের প্রথা বা পদ্ধতি ছিল না। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের পূর্ব্বে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের প্রচার কেহ করেন নাই। কীর্ত্তন এমনভাবে জাতিগঠনের কাজে প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং কবি সার্থক বিশেষণ দিয়াছেন "সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ।"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেই মঙ্গলচণ্ডী গানের উল্লেখ আছে। যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গানের কথা আছে। তাহারও বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সহজিয়া সাধকগণ গান গাহিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। সেই সমস্ত চর্য্যা-গানের কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে রাগ তালের উল্লেখ আছে। মঙ্গল গানে

আংশিকভাবে এবং কীর্ত্তন গানে বহুলাংশে এই রাগ তালের মধ্যে অনেকগুলি আজিও ব্যবহৃত হয়। কবি জয়দেবের অনুসরণে মিথিলায় কবি বিদ্যাপতি এবং বাঙ্গালায় বীরভূম নান্নুরের কবি চণ্ডীদাস যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও স্বর-সংযোগে গীত হইত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু পুরীধামে অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দের সহিত শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সঙ্গে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীও আস্বাদন করিতেন। শ্রীপাদস্বরূপ সুপণ্ডিত, সুরসিক, ভক্ত ও মধুকণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন। মহাপ্রভুব নিত্যসঙ্গী মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ, মাধব, বাসু ঘোষ, গোবিন্দাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গীতে সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রধানতঃ নাম-সংকীর্ত্তনের কথা স্মরণ করিয়াই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে 'সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ' এবং 'যুগধর্ম্মপাল' বলিয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়। অবশ্য একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লীলাকীর্ত্তনকে যে বিজ্ঞান-সম্মত সঙ্গীত-রীতিতে সুনিয়ন্ত্রিত ও প্রণালীবদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হস্তেই তাহার ভিত্তি সুগঠিত হইয়াছিল।

সংসারাশ্রমে থাকিবার সময় কেমন করিয়া অধ্যাপক নিমাই আপন ছাত্রগণকে কীর্ত্তন শিখাইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে তাহাব বর্ণনা আছে—

"শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাততালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া॥"

—মধ্যখণ্ড

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনের সময় শ্রীমহাপ্রভু তিনটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া গাহিয়াছিলেন এবং নাচিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মধ্যখণ্ড)

শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥

পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥
উষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথে যূথে হইল যত গায়ক সুন্দর ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায় ॥
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আর কতজন।
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন ॥

বৃন্দাবনদাস এই নৃত্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। এই পদাংশ বোধ হয় তাঁহারই রচিত।

চৌদিকে আনন্দধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইয়া সব পারিষদ সঙ্গে ॥
হরি ও রাম ॥ ধ্রু ॥

কাজি-দলনের দিনেও অদ্বৈত আচার্য্য, হরিদাস এবং শ্রীবাসকে লইয়া প্রধান তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। এ দিনের কীর্ত্তনে এই পদ গীত হইয়াছিল—

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গধর (শার্ঙ্গধর ?) তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে ॥

বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥

শ্রীমহাপ্রভুর এই কীর্ত্তনাভিযানের বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

বিজয় হইলা হরি নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা ॥

এই দুই ছত্র কবিতাও একটি পদাংশ বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্য একটি পদাংশ আছে, অনেকে ইহার ব্যাখ্যায় ভ্রমে পড়িয়াছেন। নিম্নে পদ ও ব্যাখ্যা তুলিয়া দিলাম। (আদিখণ্ড)

শ্রীরাগ ঃ

নাগ বলিয়া চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে ॥
কি আরে রামগোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র স্থরসিদ্ধ মুনীশ্বর আনন্দে দেখিছে ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, অনন্তরূপী শ্রীনিত্যানন্দ সহস্র বদনে নিরন্তর কৃষ্ণযশ গান করিতেছেন।

গায়েন অনন্ত শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু দোঁহে বলবন্ত ॥

এই কথাটি উদ্ধৃত পদাংশে পুনরায় বলিতেছেন—"নাগ (অনন্তদেব সহস্র মুখে) শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা বলিয়া বলিয়া মহিমাসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার জন্য চলিয়া যান। কিন্তু কৃষ্ণের যশের সিন্ধু কূল দেয় না। মহিমা-সমুদ্রের সীমা পাওয়া যায় না। মহিমা-সমুদ্র আরও উত্তাল হইয়া উঠে, অধিক অধিক বাড়ে। কি আহা, রাম (বলরাম—অনন্তদেব) এবং গোপালে (শ্রীকৃষ্ণে) এই মহিমাকথন ও মহিমা-সিন্ধুর আধিক্য-বৃদ্ধি-রূপ বিবাদ বাধিয়াছে। ব্রহ্মা, রুদ্র এবং অপরাপর দেবতা, সিদ্ধ ও মুনীশ্বরগণ এই (যশ বর্ণন ও যশোরাশি বৃদ্ধি) বিবাদ আনন্দে দেখিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও কীর্ত্তনের বর্ণনা আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া বাঙ্গালার ভক্তগণ পুরীধামে গিয়াছেন। তাঁহাদের দেব-দর্শন ও প্রসাদ-গ্রহণের পর—

সবা লঞা গেল প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈল মহাশয় ॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য চন্দন ॥
চারিদিকে চারিসম্প্রদায় করে সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল ॥

কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোকে ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥
পুরুষোত্তমবাসী লোকে আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমৎকারে ॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিঞা ॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার ॥
পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনানে ॥
বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায় ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হইলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর ॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ॥
চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ॥
চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা—একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময়—সাত সম্প্রদায় কীর্ত্তনীয়া গান করিয়াছিলেন।

তবে মহাপ্রভু সব লঞা নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইলা সবারে মাল্য চন্দন॥
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দুইয়ে হইলা আনন্দ।
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্য চন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক হৈল অষ্টজন॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিঞা।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিঞা॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপপ্রধান।
আব পঞ্চজন দিল তার পালি গান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভ সেন আর দুইজন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥

গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীনগ্রামের এক, কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥
শ্রীবৈষ্ণব ঘটা মেঘে হইল বাদল।
সংকীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি ওঠে সংকীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোধানের পর শ্রীনিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রের কর্ত্তৃত্বে যে তিনজন আচার্য্য বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নাম শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীল শ্যামানন্দ। উত্তর বঙ্গের খেতরীর ভূস্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীনরোত্তম শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ব্যাকরণ ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীস্বরূপ দামোদরের অন্তরঙ্গ শিষ্য; তিনি দামোদরের নিকট সঙ্গীতও শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বিরহকাতর, দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দাস গোস্বামী, উন্মাদের মত বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবক। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথের নিকট শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেব বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে এই সময় সঙ্গীতেব যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনের গুরুদেব অদ্বিতীয় সঙ্গীতসাধক শ্রীহরিদাস স্বামী এই সময় শ্রীধামে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নিকট অথবা তাঁহার কোন শিষ্যের নিকট নরোত্তম যে সঙ্গীত শিক্ষা প্রাপ্ত হন এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নরোত্তম বৃন্দাবন হইতে জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া পিতৃব্যপুত্র সন্তোষের অনুরোধে খেতরীতে কুটীর বাঁধিয়া বাস করেন, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তিনি খেতরীতে একটি বৈষ্ণব-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিলে শ্রীসন্তোষ এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এই উৎসবে তৎসাময়িক সমস্ত খ্যাতনামা বৈষ্ণব, সুপণ্ডিত সাধক, গায়ক ও বাদক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উৎসবের অধিনেত্রী ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীজাহ্নবী দেবী। এই সম্মেলনে নরোত্তম কীর্ত্তন গানের—রস-কীর্ত্তনের যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনেই প্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলা-কীর্ত্তন গানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। দেখিতেছি এই সম্মেলনে নিজে কীর্ত্তন গাহিবার জন্য নরোত্তম বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং একটি সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ও গঠন করিয়াছিলেন। নরোত্তম যে সুরে রস-কীর্ত্তন গান করিয়াছিলেন, খেতরী গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত বলিয়া পরগণার নামে সেই সুরের নাম হয় গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী। নরোত্তমের প্রধান বাদক দুইজনের নাম—শ্রীগৌরাঙ্গদাস ও শ্রীদেবীদাস। প্রধান দোহার গায়ক দুইজনের নাম—শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ। প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজে জনশ্রুতি শুনিয়াছি, ইঁহারা চারিজনে পুরীধামে গিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের নিকট গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। খেতরীর মহোৎসবে—

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিল দেবীদাসে॥

দেবীদাস গায়ক বাদকগণ লইয়া।
আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে হর্ষ হইয়া॥
... ...
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস তাল পাট আরম্ভয়ে।
প্রথমেই মন্দ মন্দ বাদ্য প্রকাশয়ে॥
... ...
এথা সর্ব্ব মোহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে॥
—নরোত্তম-বিলাস।

ভক্তিরত্নাকরে—

প্রথমেই দেবীদাস মর্দ্দল বামেতে।
করে হস্তাঘাত প্রেমময় শব্দ তাতে॥
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লব দাসাদি সহিত বিস্তারয়ে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদিক মনের উল্লাসে।
বায় কাংস্য, তালাদি প্রভেদ পরকাশে॥
অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ দ্বয়ে।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়ে॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥

রাঢ়দেশ সঙ্গীতের পীঠভূমি। রাঢ়দেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই জৈন, বৌদ্ধ, সৌর, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনক্ষেত্র। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধকগণের অনেক গীত রাঢ়েই রচিত হইয়াছিল। অতি পূর্ব্ব হইতেই রাঢ়ের সঙ্গীতের একটি নিজস্ব ধারা ছিল। উত্তরে রাজমহল হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত রাঢ়ের বিস্তীর্ণ সীমায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র ছিল। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত কেন্দ্রে এবং বহু নূতন প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে শাস্ত্র ও সঙ্গীতাদির শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ দুইটি পুরাতন কেন্দ্র শ্রীখণ্ড ও কান্দরা, এবং একটি নূতন কেন্দ্র ময়নাডাল। তিনটিই বীরভূমে

ছিল। প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীখণ্ড ও কান্দরা বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। খেতরীর উৎসব হইতে ফিরিয়া জ্ঞানদাস, বন্ধু মনোহর, কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের পৌত্র বদন, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ও ময়নাডালের মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরকে লইয়া রাঢ়ের প্রাচীন সঙ্গীতধারার সংস্কার সাধন করেন। কান্দরা মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত বলিয়া এই ধারার নাম হয় মনোহরসাহী। কান্দরা, ময়নাডাল, শ্রীখণ্ড মনোহরসাহী কীর্ত্তনের তিন প্রধান কেন্দ্র। ময়নাডালের চতুষ্পাঠী কীর্ত্তনের সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষা, এবং শ্রীখণ্ডের চতুষ্পাঠী ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষাদানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কীর্ত্তন-গানের অপর একটি প্রসিদ্ধ ধারার নাম রাণীহাটী বা রেণেটী। বর্দ্ধমান জেলার সাতগাছিয়া থানায় রেণেটী এখন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা পরগণে রাণীহাটীর অন্তর্গত। রেণেটীর নিকটবর্ত্তী দেবীপুর-নিবাসী বিখ্যাত পদকর্ত্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেণেটী পরগণার নামে একটি সুরের নামকরণ করেন 'রেণেটী'। কীর্ত্তনের অন্য একটি সুর মন্দারিণী, সরকার মন্দারণের নামে ইহার নামকরণ হয়। ইহা রাঢ়ের প্রাচীন সুর, মঙ্গলকাব্যের গানের সুর। কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল এই সুরে গীত হয়। প্রাচীনকালে ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলও এই সুরেই গাওয়া হইত, এখনও হয়। মন্দারিণীতে নয়টি তাল ব্যবহৃত হয়। কীর্ত্তনের আর একটি সুর আছে ঝাড়খণ্ডী। ইহাও রাঢ়ের প্রাচীন সুর, লোক-সঙ্গীতের সুর, মঙ্গলকাব্যের সুর। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৩৫৩০।৭১ বি ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ২২ পৃষ্ঠায় ত্রিপদী কবিতার সুর লেখা আছে ঝাড়িখণ্ডি। ৩৩ পত্রের পর পৃষ্ঠায় (২য় পৃঃ) ত্রিপদী কবিতার সুর লেখা আছে ঝাড়িখণ্ডি।

"পঞ্চকোট সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।
পূর্ব্ববাস কড়ই কবীন্দ্র ভক্ত্যাতুল ॥ (ভক্তি-রত্নাকর)

কড়ই-নিবাসী কবীন্দ্র গোকুল সেরগড় পরগণায় আসিয়া বাস করেন। সেরগড় ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। পূর্ব্বে বীরভূমের বক্রেশ্বর পর্য্যন্ত ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল। কবীন্দ্র গোকুল এই সুরের কিছু সংস্কার সাধন করেন। এই সুর এখন লুপ্ত হইয়াছে।

সুরের গতি আপন পরিমিত কালের মধ্যে আদ্যন্ত সমভাবে স্থায়িত্বলাভ করিলে তাহাই লয় নামে অভিহিত হয়। এই লয় প্রদর্শনের নামই তাল।

সঙ্গীতশাস্ত্রে তালই ছন্দ। ছন্দ আবার কতিপয় সমানুপাতিক ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির নাম মাত্রা।

গড়েরহাটী—বিলম্বিত লয়, দীর্ঘ ছন্দ, মাত্রার সারল্য ও প্রসাদ-গুণযুক্ত। মার্গসঙ্গীতে ধ্রুপদের সঙ্গে তুলনীয়। তালের সংখ্যা একশত আট।

মনোহরসাহী—লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, স্বরের কারিগরী ও মাত্রার জটিলতায় সমৃদ্ধ। মার্গসঙ্গীতে খেয়ালের সমতুল্য। চুয়ান্ন তালের গান।

গড়েরহাটী ও মনোহরসাহী স্বরে কীর্ত্তনে আখরের পরিপাটি বিশেষ লক্ষণীয়।

রেণেটী—লয় ও ছন্দ সংক্ষিপ্ত। তবল স্বর। আখর কম। ইহাকে ঠুংরীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু যাঁহারা বন্দীপুরনিবাসী আখরিয়া গোপালের ভাগিনেয় (হুগলী) বাসুদেবপুরের বেণীদাস কীর্ত্তনীয়ার রেণেটী স্বরের কীর্ত্তন শুনিয়াছিলেন, এইরূপ বহু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া নিত্যধামগত গণেশদাস প্রভৃতির মুখে শুনিয়াছি যে, রেণেটীর মাধুর্য্য মনোহরসাহী অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। তাল ছাব্বিশ।

কীর্ত্তনের এই পাঁচটি অঙ্গ—কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট।

কথা—সঙ্গীতশাস্ত্রেও লক্ষ্য লক্ষণের সমাবেশ আছে। লক্ষ্য অর্থে গান (কথা), লক্ষণ তাহার শাস্ত্র (রাগ ও নিয়মাদি)। কথার অন্য অর্থও আছে। শ্রীকৃষ্ণের, রাধার, বড়াইয়ের ও সখিগণের উক্তি প্রত্যুক্তি, এক গান হইতে অন্য গানের যোগসূত্র, গানের কোন একটি পংক্তির অর্থ গায়ককে কথা কহিয়া বিশদ করিয়া দিতে হয়। কীর্ত্তনে ইহাকেই কথা বলে।

দোঁহা—ছন্দে বদ্ধ দুই-চারি চরণে সূত্রাকারে অভিব্যক্ত বিষয়। বৌদ্ধদের রচিত হাজার বছরের পুরাণো দোঁহা-কোষ পাওয়া গিয়াছে। দোঁহা হইতে 'দোঁহার' কথার উৎপত্তি কিনা কে বলিবে? অনেকে বলেন, মূল গায়কের গাহিবার পর গান দুই হার—দুইবার গাহে বলিয়া ইহাদের নাম দোঁহার। দোঁহা শব্দে উভয় বুঝায়, দুই পার্শ্বের গাহিবার সঙ্গী; হয়তো এইজন্য বলে দোঁহার। ইহাদের গান দোহারী। সঙ্গীতে গানের সূত্র ধরাইয়া দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে স্বরের রেশ জমাইয়া রাখা দোঁহারের কাজ। চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের পয়ার বা ত্রিপদীর দুই-এক চরণ, হিন্দী কবির রচিত দোঁহা, 'উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকাংশ কীর্ত্তনে দোঁহা নামে পরিচিত।

আখর—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"কীর্ত্তনের আখর কথার তান।" মহাকবির যোগ্য ব্যাখ্যা। "আখর" কীর্ত্তনের আসরে শুনিয়া বুঝিতে হয়। ইহাকে কীর্ত্তন গানের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলিতে পারি। কীর্ত্তনের মাধুর্য্য-আস্বাদনে আখর প্রধান সহায়। পদকর্ত্তাগণের বিনা সুতায় গাঁথা মালার রহস্যগ্রন্থি উন্মোচনে আখর-ই একমাত্র উপায়। ইহা রসের ভাণ্ডার অনর্গল করিবার মন্ত্র, উন্মোচনের কুঞ্চিকা। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বার্ত্তিক।

তুক—অনুপ্রাসবহুল ছন্দোময়, মিলাত্মক-গাথা তুক আখ্যায় অভিহিত। কোন কোন তুকে গানের মত কয়েকটি "কলি" থাকে। এগুলি সাধারণতঃ তুক বা তুক্ক-গান নামে পরিচিত। তুক-কীর্ত্তন গায়কগণের গুরুপরম্পরাক্রমে সৃষ্ট। অনেক অজ্ঞাত পর-কর্ত্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (ভণিতাহীন) পদ বা পদাংশ তুক্ক বা তুক নামে চলিতেছে।

তুক গানের উদাহরণ—(গোষ্ঠ যাত্রা)

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পায় রহি রহি চলি যায়।
যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
বুঝি উহার কেহ আছে আসিতেছে অতি পাছে
তেঞি চায় ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গো ॥
হায় আমরা কি করিলাম নবনী পাসরি এলাম
খানিক রাখিতাম ননী দেখাইয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গো।
যদি ব্রজের বালক হতাম নেচে নেচে সঙ্গে যেতাম
শ্যাম মাঝে যেত নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো ॥
রাণী টানে ঘর পানে রাখাল টানে বন পানে
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো।
যদি ফুলের মালা হতাম শ্যাম অঙ্গে দুলে যেতাম
যেতাম হেলনে দোলনে দোলনে গো ॥
রবি বড় তাপ দিছে বন্ধু মুখ ঘামিয়াছে
কপালের তিলক যায় ভাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া গো।
হেন মনে করি মায়া মেঘ হয়ে করি ছায়া
বন্ধু যাক জুড়াইয়া জুড়াইয়া জুড়াইয়া গো ॥

(পাঠান্তর পাইয়াছি—বন্ধুর শ্রম নাশিয়া নাশিয়া নাশিয়া গো)

কলহান্তরিতার তুক—

তোমায় নিতে আসিনি।

গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠছো কি হে, তোমায় নিতে আসিনি।

আমি ফুল নিতে এসেছি। কৃষ্ণকলি ফুল নিতে এসেছি।

বাসি ফুলে হবে না। ঝরা ফুলে হবে না।

মান রাজার পূজা হবে, করবে পূজা কমলিনী॥

ছুট—তালেরই অপর নাম ছুট। ছুট গানও আছে।

কীর্ত্তনের আর একটি অঙ্গ "ঝুমর।" ঝুমর বা ঝুমরী একটি স্থর। পদাবলীতে পাই—"ঝুম্‌রী গাইছে শ্যাম বাঁশী বাজাইয়া।" ভক্তি-রত্নাকরে ঝুমরীর উল্লেখ আছে। কিন্তু "ঝুমর" অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কীর্ত্তনে পালা গান গাহিয়া মিলন গাহিতে হয়। কিন্তু দুই-তিনজন কীর্ত্তনীয়া একই আসরে পরপর যেখানে একই রসের পালা গান গাহিয়া থাকেন, সেখানে মিলন গাওয়া চলে না। সেখানে দুই ছত্র "ঝুমর" গাহিয়া কীর্ত্তনীয়াকে আসর রাখিতে হয়। শেষের গায়ক মিলন গাহিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করেন।

লীলা-কীর্ত্তন বা রস-কীর্ত্তন চৌষট্টি রসের গান বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজের মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উজ্জ্বল-নীলমণি না পাঠ করিলে কীর্ত্তন-গায়ক এবং শ্রোতা উভয় পক্ষকেই অস্থবিধায় পড়িতে হয়। উজ্জ্বল-নীলমণি রস-পর্য্যায় ও নায়ক-নায়িকা-লক্ষণের অপূর্ব্ব গ্রন্থ। উজ্জ্বল রস, আদি রস বা শৃঙ্গার রস প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। অনুরক্ত যুবক-যুবতীর প্রগাঢ় রতি অ-সমাগমে উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেছে না—এই অবস্থার নাম বিপ্রলম্ভ। আর নায়ক-নায়িকার পরস্পর মিলনে যে উল্লাস, তাহার নাম সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস—এই চারি ভাগে, এবং সম্ভোগ—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ—এই চারিভাগে বিভক্ত। এই আটটি রসের প্রত্যেকের আবার আট-আট করিয়া ভাগ আছে। একুনে মোট

চৌষট্টি রস। চৌষট্টি রসের নায়িকার অপর যে প্রভেদ, পরে তাহার উল্লেখ করিব।

বিপ্রলম্ভ

পূর্ব্বরাগ—নায়ক-নায়িকা উভয়েরই পূর্ব্বরাগ হয়। কিন্তু এখানে নায়িকার পূর্ব্বরাগের কথাই বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ১ সাক্ষাতে দর্শন, ২ চিত্রপটে দর্শন, ৩ স্বপ্নে দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, ৪ বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, ৫ দূতীমুখে শ্রবণ, ৬ সখীমুখে শ্রবণ, ৭ গুণীজনের গানে শ্রবণ, ৮ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ।

মান—মানও উভয়ের হয়। এখানে নায়িকার মানের বর্ণনা—শ্রীকৃষ্ণের অপরাধের কথা ১ সখীমুখে শ্রবণ, ২ শুকমুখে শ্রবণ, ৩ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনিতে অন্যা নায়িকার নামের আভাস, ৪ শ্রীকৃষ্ণের দেহে ভোগ-চিহ্ন দর্শন, ৫ প্রতিপক্ষ নায়িকার অঙ্গে ভোগ-চিহ্ন দর্শন, ৬ গোত্রস্খলন, (নায়ক কর্তৃক ভ্রমক্রমে বা স্বপ্নে অন্যা নায়িকার নাম কথন), ৭ স্বপ্নে অন্যা নায়িকার সঙ্গে দর্শন, কৌস্তুভ প্রতিবিম্বে নিজমুখ দেখিয়া অন্যা নায়িকা বলিয়া ভ্রম, ৮ সাক্ষাতে অন্যা নায়িকার সঙ্গে দর্শন।

প্রেম-বৈচিত্ত্য—নায়ক-নায়িকা দুইজনেই "দুঁহু কোড়ে দোঁহে কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"—ইহারই নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য। কিন্তু এখানে নায়িকার আক্ষেপানুরাগকেই প্রেম-বৈচিত্ত্য বলা হইয়াছে। প্রেমের বিচিত্রতা। ইহার মধ্যে বিরহের সুর আছে। ১ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, ২ মুরলীর প্রতি, ৩ নিজের প্রতি, ৪ সখীর প্রতি, ৫ দূতীর প্রতি, ৬ বিধাতার প্রতি, ৭ কন্দর্পের প্রতি, ৮ গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাস—নায়কের দূরে গমনে নায়িকার বিরহ। নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস। নিকট প্রবাস—১ কালীয় দমন, ২ গো-চারণ, ৩ নন্দমোক্ষণ, ৪ কার্য্যানুরোধে, ৫ রাসে অন্তর্ধানে সাময়িক অদর্শনজনিত বিরহ। দূর প্রবাস—১ ভাবি (প্রবাস গমনের বার্ত্তা শুনিয়া), ২ মথুরা গমন ও ৩ দ্বারকা গমন। ভবন্—বর্ত্তমান বিরহ এবং ভূত—অতীতস্মরণ।

সম্ভোগ

সংক্ষিপ্ত—১ বাল্যাবস্থায় মিলন, ২ গোষ্ঠে গমন, ৩ গো-দোহন, ৪ অকস্মাৎ চুম্বন, ৫ হস্তাকর্ষণ, ৬ বস্ত্রাকর্ষণ, ৭ বর্ত্মরোধন, ৮ রতি ভোগ।

সঙ্কীর্ণ—১ মহারাস, ২ জলক্রীড়া, ৩ কুঞ্জলীলা, ৪ দানলীলা, ৫ বংশী-চুরি, ৬ নৌকাবিলাস, ৭ মধুপান, ৮ সূর্য্যপূজা।

সম্পন্ন—১ সুদূর দর্শন, ২ ঝুলন, ৩ হোলি, ৪ প্রহেলিকা, ৫ পাশাখেলা, ৬ নর্ত্তকরাস, ৭ রসালস, ৮ কপটনিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান—১ স্বপ্নে বিলাস, ২ কুরুক্ষেত্র-মিলন, ৩ ভাবোল্লাস, ৪ ব্রজাগমন, ৫ বিপরীত সম্ভোগ, ৬ ভোজন-কৌতুক, ৭ একত্র নিদ্রা, ৮ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের সাক্ষাৎ দর্শনাদি প্রথম সাতটি হেতু গ্রহণীয়। শ্রীরাধার বংশী নাই। মান দুই প্রকার—সহেতু ও নির্হেতু। শ্রীকৃষ্ণের সহেতু মান অসম্ভব। তাঁহার মান নির্হেতু। শ্রীকৃষ্ণের আক্ষেপানুরাগের কোন সম্ভাবনা ঘটে না। শ্রীরাধার অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ আছে। কিন্তু শ্রীরাধার স্থানান্তরে গমন নাই। সম্ভোগেরও প্রকারভেদ আছে। যেমন মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্ভোগ। মুখ্য সম্ভোগ প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ ভেদে দুই প্রকার। গৌণ সম্ভোগ—স্বপ্ন-সম্ভোগ। সম্পন্ন সম্ভোগ—আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দ্বিবিধ। লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন আগতি, আর প্রেম সংরম্ভে অকস্মাৎ আগমন প্রাদুর্ভাব, যেমন রাসমণ্ডলে আবির্ভাব। উজ্জ্বল-নীলমণিতে পূর্ব্বরাগাদি বিষয়ের সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে।

কীর্ত্তনীয়াগণ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের চৌষট্টি বিভাগের কীর্ত্তনকেই চৌষট্টি রসের গান বলিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে মানের পর্য্যায়ে অভিসারিকাদির স্থান রহিয়াছে। নিম্নে নায়িকার অভিসারিকাদি অষ্টাবস্থার ও তাহার আট আট চৌষট্টি ভেদের বিবরণ দিলাম।

(১) **অভিসারিকা** (যিনি স্বয়ং অভিসার করেন, অথবা নায়ককে অভিসার করান)—

জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তামসাভিসারিকা, বর্ষাভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা (গ্রহণাদি উপলক্ষ্যে স্নান ছলে, দেবদর্শন ছলে অভিসার), উন্মত্তাভিসারিকা (বংশীধ্বনি শ্রবণে), অসমঞ্জসাভিসারিকা (যাহার বেশ বাস অসম্বৃত)।

(২) **বাসকসজ্জা** (কান্তের আগমন প্রতীক্ষায় কুঞ্জ সাজাইয়া এবং নিজে সাজিয়া অপেক্ষমাণা):—

মোহিনী (সুবেশধারিণী), জাগ্রতিকা (প্রতীক্ষায় জাগ্রতা), রোদিতা

(রোদনপরায়ণা), মধ্যোক্তিকা (কান্ত আসিয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন এইরূপ চিন্তা ও আলাপযুক্তা), সুপ্তিকা (কপটনিদ্রায় নিদ্রিতা), চকিতা (নিজাঙ্গ-ছায়ায় কৃষ্ণভ্রমত্রস্তা), সুরসা (সঙ্গীতপরায়ণা), উদ্দেশা (দূতী-প্রেরণকারিণী)।

(৩) **উৎকণ্ঠিতা** (কান্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠাযুক্তা), দুর্মতি (কেন খলের বাক্যে বিশ্বাস করিলাম, এই চিন্তায় অনুতপ্তা) :—

বিকলা (পরিতাপযুক্তা), স্তব্ধা (চিন্তিতা), উচ্চকিতা (পত্র-পতনে, পক্ষীর পক্ষ-সঞ্চালনে কান্ত আসিতেছেন, এই আশায় চকিতা), অচেতনা (দুঃখাভিভূতা), সুখোৎকণ্ঠিতা (কৃষ্ণ ধ্যান-মুগ্ধা, কৃষ্ণগুণকথননিরতা), মুখরা (দূতীর সঙ্গে কলহপরায়ণা), নির্ব্বন্ধা (আমারি কর্ম্মদোষে তিনি আসিলেন না, আমি বাঁচিব না—এইরূপ খেদযুক্তা)।

(৪) **বিপ্রলব্ধা** (সঙ্কেত করিয়াও প্রিয় কেন আসিলেন না, এই চিন্তায় নির্ব্বেদযুক্তা)—

বিকলা (কান্ত আসিলেন না, সমস্ত বিফল হইল, এইরূপ খেদান্বিতা), প্রেমমত্তা (অন্যা নায়িকার সঙ্গে কান্তের মিলন হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কান্বিতা), ক্লেশা (যাঁহার সব বিষময় মনে হইতেছে), বিনীতা (বিলাপযুক্তা), নির্দ্দয়া (কান্ত নির্দ্দয় ইত্যাদি বাক্যে খেদযুক্তা), প্রখরা (শয্যা এবং বেশভূষণাদি অগ্নিতে অথবা যমুনায় বিসর্জ্জন করিব, এইরূপ সঙ্কল্পযুক্তা), দূত্যাদরা (দূতীকে আদরকারিণী), ভীতা (প্রভাত হইতে দেখিয়া ভয়যুক্তা)।

(৫) **খণ্ডিতা** (অন্যা নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্ন-যুক্ত নায়ককে দেখিয়া কুপিতা)—

নিন্দা (কান্তকে নিন্দাকারিণী), ক্রোধা (অনুনয়রত কান্তকে তিরস্কারকারিণী), ভয়ানকা (কান্তকে সিন্দূর-কজ্জলে মণ্ডিত দেখিয়া ভীতা), প্রগল্ভা (কান্তের সঙ্গে কলহপরায়ণা), মধ্যা (অন্যা নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্নে লজ্জান্বিতা), মুগ্ধা (রোষবাষ্প-মৌনা), কম্পিতা (অমর্ষ-বশে রোদনপরায়ণা), সন্তপ্তা (কান্তের অঙ্গে ভোগ-চিহ্ন দর্শনে তাপযুক্তা)।

(৬) **কলহান্তরিতা** (প্রত্যাখ্যাত নায়ক চলিয়া গেলে পশ্চাত্তাপযুক্তা)—

আগ্রহা (আগ্রহযুক্ত নায়ককে কেন ত্যাগ করিলাম), ক্ষুব্ধা (পাদ পতিত নায়ককে কেন দুর্ব্বাক্য বলিলাম), ধীরা (পাদপতিত কান্তকে কেন দেখি নাই), অধীরা (সখী তিরস্কৃতা), কুপিতা (কান্তের মিথ্যা ভাষণ স্মরণে কোপযুক্তা), সমা

(কান্তের একা দোষ নাই, দূতীর দোষ, সময়ের দোষ এবং আমার নিজের দোষেই আমি ক্লেশ পাইলাম), মৃদুলা (পরিতাপে রোদনপরায়ণা), বিধুরা (সখীর প্রবোধ দানে আশ্বস্তা)।

(৭) **প্রোষিতভর্তৃকা** (পতি যাহার প্রবাসে)—

ভাবি (কান্ত প্রবাসে যাইবেন এই সংবাদে কাতরা), ভবন্ (বর্তমান বিরহ), ভূত (কান্ত মথুরায়), দশদশা (চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু। পদাবলীতে মূর্চ্ছাই মৃত্যুনামে অভিহিত), দূত-সংবাদ (উদ্ধবাদি মুখে), বিলাপা (বিলাপপরায়ণা), সখ্যুক্তিকা (যাহার সখী কান্তের নিকট গিয়া বিরহ-বেদনা নিবেদন করেন), ভাবোল্লাসা (ভাব-সম্মিলনে উল্লসিতা)।

(৮) **স্বাধীনভর্তৃকা** (নায়ক যাহার সদা বশীভূত)—

কোপনা (বিলাসে বাহ্য রোষযুক্তা), মানিনী (নায়ক অঙ্গে নিজকৃত বিলাসচিহ্ন দর্শনে), মুগ্ধা (নায়ক যাহাব বেশবিন্যাসাদি করেন), মধ্যা (নায়ক যাহার নিকট কৃতজ্ঞ), সমুক্তিকা (সমীচীন উক্তি-যুক্তা), সোল্লাসা (কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা), অনুকূলা (নায়ক যাহার অনুকূল), অভিষিক্তা (অভিষেকপূর্ব্বক নায়ক যাহাকে চামর ব্যজনাদি করেন)।

মিথিলার কবি ভানুদত্ত রসমঞ্জরী গ্রন্থে 'অনুশয়ানা' নায়িকার বর্ণনা কবিয়াছেন। সঙ্কেতস্থানের বিনাশে সন্তপ্তা নায়িকার নাম অনুশয়ানা। বর্ত্তমান স্থান নাশে দুঃখিতা, ভাবিস্থান নাশে দুঃখিতা, এবং সঙ্কেত স্থানে যাইতে না পারিয়া দুঃখিতা—এই তিন প্রকার অনুশয়ানা। সঙ্কেতস্থানে অ-গমন হেতু অনুশয়ানার উদাহরণ—

রসাল মুকুলরাজি দুলিছে শ্রবণে
পাণ্ডুর বরণ গণ্ড পরাগ-নিকরে।
এ হেন মাধবে রাধা হেরিয়া নয়নে
বরষে যে অশ্রুজল অবিরলধারে॥

(৺সতীশচন্দ্র রায়ের অনুবাদ)

শ্রীকৃষ্ণ আম্রকুঞ্জে মিলনের সঙ্কেত করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা অনিবার্য্যকারণে সেখানে যাইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে আম্রকুঞ্জে গিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধার

দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্য তিনি রসালমঞ্জরী কর্ণে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে দেখা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বুঝাইতেছেন—রসালকুঞ্জে তোমার গমনের কথা কানেই শুনিয়াছি, অদৃষ্টে দর্শন ঘটে নাই। আমি যে সেখানে গিয়াছিলাম, এই রসালমঞ্জরী তাহারই নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের এই অনুযোগে আপনার পরাধীনতার কথা স্মরণে শ্রীরাধা কাঁদিয়াছেন।

বাঙ্গালায় ঢপ কীর্ত্তন নামে কীর্ত্তনের একটি ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। যশোরের মধুসূদন কান এই ধারার একজন বিখ্যাত গায়ক। ইনি কীর্ত্তনে স্বরচিত পদও গান করিতেন। এই গান কম-বেশী প্রায় শতখানেক বৎসর চলিত হইয়াছে। এক সময় ইহা সারা বাঙ্গালায় প্রসারলাভ করিয়াছিল। প্রধানতঃ পণ্যা রমণীগণই এই গান শিখিয়া কীর্ত্তনের ব্যবসায় করিত। ইহারা কীর্ত্তনওয়ালী নামে পরিচিতা ছিল। অনেক গায়কও এই গান আয়ত্ত করিয়া ব্যবসায় চালাইতেন। এক সময় কলিকাতায় ধনী ও মধ্যবিত্ত-গৃহে, এমন কি, মফঃস্বলের কোন কোন বড়লোকের বাড়ীর শ্রাদ্ধ-বাসরেও ঢপ গানের, বিশেষতঃ কীর্ত্তনওয়ালীর বিশেষ সমাদর ছিল। আজকাল ঢপ গানের চলন কমিয়াছে।

গড়েরহাটী ও মনোহরসাহী কীর্ত্তনের প্রাচীন ধারাও প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। ডুপুখুরিয়া বাজারের (মুর্শিদাবাদ) শ্রীনন্দকিশোর দাস কীর্ত্তন রসসাগর এবং কলিকাতার শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঘোষ কীর্ত্তন রসসাগর প্রভৃতি দুই চারিজন মাত্র এই প্রাচীন ধারা রক্ষা করিতেছেন। কাঁদরার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। শ্রীখণ্ড ও ময়নাডাল কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে। প্রাচীন কীর্ত্তনাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের প্রভুপাদ গৌরগোপাল ভাগবতভূষণ নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীল গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মাত্র বর্ত্তমান আছেন। মুর্শিদাবাদ-কান্দীর দামোদর কুণ্ডু, পাঁচথুপীর কৃষ্ণদয়াল চন্দ, (বৃন্দাবনের খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্য অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী এই চন্দ বা 'চাঁদজীর' নিকটেই গান শিক্ষা করিয়াছিলেন), কাটোয়ার নিকটস্থ মেরেলার হারাধন সূত্রধর, বীরভূম ইলামবাজারের নিমাই চক্রবর্ত্তী, দীনদয়াল, মনোহর চক্রবর্ত্তী ও কেশব চক্রবর্ত্তী, ময়নাডালের রসিকানন্দ মিত্র ঠাকুর ও বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর, তাঁতিপাড়ার নন্দ দাস, কান্দরার শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতির মত গড়েরহাটী ও মনোহরসাহী সুরের কীর্ত্তনগায়ক বাঙ্গালার গৌরব ছিলেন। এই সেদিনও দক্ষিণখণ্ডের রসিকদাস, বারুইপাড়ার গণেশদাস, চাকটা আনখোনার অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়,

হাসনপুরের ফটিক চৌধুরী, শ্রীবৃন্দাবনের গদাধরদাস, ঠিবে গ্রামের অখিল মিস্ত্রী, দক্ষিণখণ্ডের বনওয়ারীদাস, রাধাশ্যামদাস, পায়র গ্রামের অক্ষয়দাস, মাণিক্য হারের শচীনন্দনদাস, মাদারবাটীর বিপিনদাস, মালিহাটীর প্রেমদাস এবং ময়নাডালের রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর—বাঙ্গালার মুখরক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজিকার দিনে নাম করিবার মত কয়জন আছেন ?

কীর্ত্তনের পালা গানে একজন কবির রচিত পদ লইয়াই পালা সাজানো নাই। কয়েকজন বিভিন্ন পদকর্ত্তার একই রসের পদ লইয়া এক একটি পালাগঠিত হইয়াছে। খেতরীর মহোৎসবে এইরূপে সাজানো পালা গানই গাওয়া হইয়াছিল। অনুমিত হয় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি" এইরূপ পালাগানের প্রথম সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কালানুরূপ লীলা স্মরণ-মনন-শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপযোগী পদগুলি সাজানো আছে। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র এবং বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু পদসংকলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কীর্ত্তনের সাজানো পালাগানগুলি এক একটি খণ্ডকাব্য। রসে, ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, এক একটি পদ আপন মাধুর্য্য-মহিমায় আপনি উজ্জ্বল হইয়া আছে। কীর্ত্তন-গায়ককে এই পদের নির্ভুল পাঠ ও ব্যাখ্যা জানিয়া লইতে হইবে। পালা গানের রস, ভাবের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। গানের ব্যাখ্যায় বা আখরে রসাভাস না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইজন্য তাহার সামান্য ব্যাকরণ-জ্ঞান ও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ আবশ্যক। তাহার পর তিনি যদি উজ্জ্বল-নীলমণিখানি অধিগত করেন, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়। সেই সঙ্গে গায়কের মার্গসঙ্গীতের রাগতালাদিতেও জ্ঞানসঞ্চয় প্রয়োজন। কীর্ত্তন গান মাধুর্য্যপ্রধান, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের স্থান নাই। এইজন্য আখরে, ব্যাখ্যায় কীর্ত্তনীয়াকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার হয়তো সামান্য প্রয়োজন আছে, তবে তাহা রূপকে রূপান্তরিত করিলে চলিবে না। অনেক স্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখীগণের, বিশেষতঃ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণের প্রতি রাধার কোন কোন উক্তি সাধক ভক্তের আবেদনের রূপ ধারণ করে। সাবধানে রসোদ্রেক ও ভাব সঞ্চার করিতে পারিলে তত্তৎক্ষেত্রে শ্রোতৃমণ্ডলী "ন বাহ্যং ন বেদনান্তরং" অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহাই কীর্ত্তন-গানের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

৫। নাম-কীর্ত্তন ও লীলা-কীর্ত্তন

বাঙ্গালা পদাবলী বৈষ্ণব সাধকের উপাসনার অবলম্বন হইয়াছে, ধ্যানের মন্ত্র হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়াছেন—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥
এই ত সাধন হয় দুই ত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

সাধন ভক্তির চতুঃষষ্ঠী অঙ্গ। এই চতুঃষষ্ঠী অঙ্গের মধ্যে—

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥

... .

বৈধি ভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন।
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে রতি॥
—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য—২২ পরিচ্ছেদ।

শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু নাম-শ্রবণ ও নাম-কীর্ত্তনের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু অন্তর সাধনে—মনে নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনা করিয়া ব্রজে রাত্রিদিনে শ্রীকৃষ্ণ-সেবনে লীলা-গান শ্রবণ, লীলা-কীর্ত্তনই প্রধানতম অবলম্বন। সুতরাং নাম ও লীলা-কীর্ত্তন উভয়ই সাধকের ধ্যানমন্ত্র। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিরপরাধে নাম লইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এখন তো অন্যায় আচরণ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করি, পরে হরিনাম লইয়া পাপ খণ্ডন করিব। এইরূপ অভিসন্ধি এবং আরও কয়েকপ্রকার অপরাধ নামাপরাধ নামে পরিচিত। অকপটে নাম লইতে হইবে, শ্রীভগবানের প্রীতির জন্যই নাম লইতে হইবে। অজ্ঞাতসারে নামাপরাধ ঘটিয়া গেলে, অপরাধ মুক্তির জন্য নামের নিকটেই প্রার্থনা করিতে হইবে।

নাম-কীর্ত্তনের বিষয়ে শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি—গম্ভীরায়—

স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন সনে।
রাত্রি দিনে করে রস গীত আস্বাদনে॥
নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥
সেই সেই ভাবে নিজে শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লইয়া॥
কোনদিন কোন ভাবের শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলির পরম উপায়॥

সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে-মজ্জন॥

... ...

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

নানাপরাধের কথায় মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণ প্রেম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্য—২০ পরিচ্ছেদ।

নাম-কীর্ত্তনের উদাহরণ—

চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত যে শাখা গুরু কীর্ত্তন কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ মধুলোভে অনুক্ষণ হরি বলি ফিরে চারি পাশ॥
গদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্র গোলোক অধিক সুখ তায়।
তিন যুগে জীব যত প্রেমবিন্দু উতপত তার তলে বসিয়া জুড়ায়॥

নিত্যানন্দ নাম ফল প্রেমরসে ঢল ঢল খাইতে অধিক লাগে মীঠ।
শ্রীশুকদেব মনে ফলের মহিমা জানে এ উদ্ধব দাস তাহে কীট॥

নাম-কীর্ত্তনের অপর একটি পদ—

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সত সঞে তরহ এ ভব সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখণ এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল জল জীবন টলমল ভজহুঁ হরিপদ নীত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাসী রে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে॥

পদকল্পতরু চতুর্থ শাখায় নাম-সংকীর্ত্তনের পদ আছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অমর গ্রন্থ "নরোত্তমের প্রার্থনা" নাম-কীর্ত্তনের পর্য্যায়ে পড়ে। এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

লীলা-কীর্ত্তন

লীলা-কীর্ত্তনে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ আছে, সেগুলি সংখ্যায় অল্প। শ্রীরাধাকৃষ্ণের, শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের জন্ম-লীলাদির পদ আছে, তাহারও সংখ্যা বেশী নহে। বাৎসল্য-রসের পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, নন্দোৎসব, ফলক্রয়-লীলা, নবনীহরণ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোষ্ঠাষ্টমীলীলা, শ্রীকৃষ্ণের বৎস-চারণাদি লীলা, শ্রীরাধার জন্মলীলা আদি উল্লেখযোগ্য। সখ্যরসের পদের মধ্যে গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ, যজ্ঞপত্নীগণের অন্নভোজন, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সঙ্গে বনবিহারের পদ পাওয়া যায়। গোষ্ঠলীলার মধ্যেও মধুর রসের পদ আছে, কারণ গোষ্ঠেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়াছে। দান ও নৌকাখণ্ডের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দানের যেমন দুইটি পালা—একটি শ্রীরাধা ও গোপীগণের মথুরায় দধি দুগ্ধ বিক্রয়, অপরটি ভাগুরি মুনির যজ্ঞে ঘৃত দান। নৌকা-বিলাসেরও তেমনই দুইটি পালা—একটি মথুরাযাত্রা-পথে যমুনায় নৌকা-বিহার, অপরটি শ্রীবৃন্দাবনেই মানসগঙ্গায় নৌকা-বিহার। গোবর্দ্ধন-ধারণলীলারও পদ আছে। ঝুলন ও

দোল মধুররসের পর্য্যায়ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির পদ নাই। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদ সুপরিচিত। শ্রীখণ্ডের নয়নানন্দ কবিরাজ-রচিত শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদ পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাসের রচিত বয়ঃসন্ধির পদই প্রচলিত।

বিদ্যাপতির রচিত বয়ঃসন্ধির পদ—

খেনে খেনে নয়ন কোণে অনুসরই।
খেনে খেনে বসনধূলি তনু ভরই॥
খেনে খেনে দশন ছটাছটি হাস।
খেনে খেনে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খেনে আঁচর দেই খেনে হয়ে ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কণেঠ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাসের দাসের শাখা-নির্ণয় গ্রন্থ হইতে নয়নানন্দ কবিরাজের বয়ঃসন্ধির পদের সংবাদ পাওয়া যায়। হেতমপুর রাজবাটীর বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সংগৃহীত পুঁথি হইতে নয়নানন্দের বয়ঃসন্ধির গৌরচন্দ্র ও একটি পদ পাইয়াছিলাম। উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

॥ গৌরচন্দ্র ॥ ॥ সুহই ॥

বিমল সুরধুনী তীর। কালিন্দী ভরমে অধীর॥
বিহরই গোর কিশোর। পুরব পিরিতি রসে ভোর॥
রাজপথে নরহরি সঙ্গে। খেনে হেরি গঙ্গ তরঙ্গে॥
গদাধর লাজে তেজে পাশ। মুরারীরে করু পরিহাস॥
কৈশোর যৌবন সন্ধি। নয়নানন্দ চিরবন্দী॥

॥ পদ ॥ ॥ ধানসী ॥

মাধব পেখলুঁ সো নব বালা। বরজ রাজপথ চাঁদ উজালা ॥
অধরক হাস নয়ন যুগ মেলি। হেম কমলপর চঞ্চরী খেলি ॥
হেরি তরুণী কোই করু পরিহাস। অন্তরে সমুঝয়ে বাহিরে উদাস ॥
শুনিয়া না শুনে জনু রস পরসঙ্গ। চরণ চলন গতি মরাল সুরঙ্গ ॥
বক্ষ জঘন গুরু কটি ভেল খীন। নয়নানন্দ দরশ শুভ দিন ॥

৬। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী আচার্য্যগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ মনন জন্য যে লীলা ক্রমের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী, স্মরণ মঙ্গল, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তাঁহারা এই ক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত ক্ষণদা গীত চিন্তামণি বৈষ্ণব কবিগণের রচিত পদাবলীর সংকলন গ্রন্থ। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত মন্ত্রের পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষায় বিরচিত এই পদাবলী সাধকগণের উপাসনার অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ শুক্লা ও কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পক্ষান্তকালের স্মরণোপযোগীরূপে পদগুলি সংকলন করিয়াছিলেন। অপরাপর কবিগণ এই ক্রম অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত। ইহাদের অনুসরণ ক্রম এইরূপ—

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নিকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্ট কালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও নক্ত এই অষ্টকাল। তন্মধ্যে প্রভাত, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন দিবাভাগের, আর সায়ং, প্রদোষ, নক্ত ও নিশান্ত রাত্রিকালের অন্তর্গত। প্রতিটি লীলা কালের পরিমাণ ছয়দণ্ড। কিন্তু মধ্যাহ্ন ও নক্ত লীলার কাল বারদণ্ড গণনা করিতে হয়। নিশান্ত লীলায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ইহার মধ্যে বিরহ আছে, এইজন্য সাধকগণ এবং কীর্ত্তনীয়াগণ নিশান্ত লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ত অর্থাৎ নিশীথ কালীয় সম্ভোগ লীলা পর্য্যন্ত স্মরণ, মনন এবং গান করেন। ইহারা প্রধানতঃ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থখানিরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীল গোবিন্দ লীলামৃতে নিশান্ত লীলা হইতে বর্ণনা সুরু হইয়াছে।

আমরা নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রকাশিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত হইতে সংক্ষেপে লীলা পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গ্রন্থখানি ত্রয়োবিংশ সর্গে বিভক্ত।

১ম সর্গে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য বৃন্দা কর্ত্তৃক শুক-শারী প্রেরণ, উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ, নিদ্রাবেশে স্বভাবসিদ্ধ নিশান্ত লীলা, গৃহে গমন ও স্ব স্ব শয্যায় শয়ন।

২য় সর্গে—প্রভাতকালীন লীলা, নন্দালয়ে পৌর্ণমাসীর আগমন, শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ জন্য বহুবিধ প্রয়াস। কৃষ্ণাঙ্গে নীলবসন ও ক্ষতচিহ্ন দর্শনে যশোদার বিলাপ। কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সখাগণের সঙ্গে গো দোহনার্থে গমন, গো দোহনাদি।

যাবটে জটিলা গৃহে মুখরার আগমন। পুত্রবধূর সূর্য্য পূজার ব্যবস্থা করিতে মুখরার প্রতি জটিলার আদেশ। শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ, রাধা অঙ্গে পীতবসন ও সম্ভোগ চিহ্ন দর্শনে মুখরা ও ললিতাদি সখীগণের উক্তি প্রত্যুক্তি। শ্রীবাধার প্রাতঃকৃত্য সমাপন, স্নান ও বেশ ভূষণাদি ধারণ।

৩য় সর্গে—প্রাতঃকালীন লীলা। রন্ধনোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন জন্য দাসীগণের প্রতি ব্রজেশ্বরীর আদেশ। শ্রীরাধাকে আনয়নের জন্য কুন্দলতাকে প্রেরণ, শ্রীরাধার নন্দগৃহে আগমন ও অন্নব্যঞ্জন রন্ধন।

৪র্থ সর্গে—প্রাতঃকালীন লীলা। শ্রীকৃষ্ণের গাভী দোহনান্তে গোষ্ঠ হইতে আগমন। স্নানাদি সমাপনান্তে সখাগণের সহিত ভোজন, গোচারণ জন্য গোষ্ঠে গমন। শ্রীরাধাকে যশোদার বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান।

৫ম সর্গে—পূর্ব্বাহ্ণ লীলা। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ গমনে নন্দ যশোদার খেদ, শ্রীকৃষ্ণের বিনয় বাক্য।

শ্রীরাধার গৃহে গমন। পুত্রবধূর সূর্য্য পূজার জন্য ললিতাদির প্রতি জটিলার উপদেশ। কৃষ্ণানুসন্ধান জন্য শ্রীরাধা কর্ত্তৃক বৃন্দা ও সুবলের নিকট তুলসীকে প্রেরণ। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা।

৬ষ্ঠ সর্গে—পূর্ব্বাহ্ণ লীলা। গোষ্ঠে সখীগণের নৃত্য গীত। বন-লতাদির প্রতি বৃন্দা-বাক্য। ভোজ্যদ্রব্যাদি লইয়া ধনিষ্ঠার আগমন। শ্রীকৃষ্ণের মানস গঙ্গায় জলকেলি ও সখাগণের সহিত ভোজন।

তুলসীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ, রাধাকুঞ্জে মিলন সঙ্কেত।

চন্দ্রাবলী সখী শৈব্যার আগমন, গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলীসহ মিলন জন্য শৈব্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ছলনা।

৭ম সর্গে—পূর্ব্বাহ্ণ লীলা। ললিতাদি সখীগণের কুঞ্জ ও শ্যাম কুণ্ডাদির শোভাবর্ধন। কুঞ্জাদি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণ জন্য বৃন্দার সুখদা কুঞ্জে গমন। বৃন্দা ললিতাদির কথোপকথন। শ্রীকৃষ্ণের মধুমঙ্গলের প্রতি পরিহাস।

৮ম সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীরাধাব উৎকণ্ঠা। ধনিষ্ঠা সহ শ্রীরাধার কথোপকথন। শ্রীরাধার সূর্য্য পূজাচ্ছলে বনে গমন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন।

৯ম সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। কুন্দলতাদি সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রহস্য পরিহাস। শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প যজ্ঞ ও নবগ্রহ পূজা।

১০ম সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সখীগণকে আলিঙ্গন, বংশীহরণ।

১১শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। বিলাসান্তে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকে অলঙ্কৃতকরণ। সখীগণের পরিহাস, বিবিধ ক্রীড়া।

১২শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীকৃষ্ণ করে বংশী সমর্পণ। শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন। শ্রীবৃন্দার বনশোভা বর্ণন।

১৩শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীকৃষ্ণ কতৃক বর্ষাদি ঋতুর শোভা বর্ণন। শুক-শারীর বিতণ্ডা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি।

১৪শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীরাধা, ধনিষ্ঠা ও ললিতাদির কথোপকথন। কৃষ্ণ অঙ্গে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেম বৈচিত্ত্য। মধুপান।

১৫শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। সম্ভোগ বিলাসাদি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন-ভোজন। কুঞ্জে শয়ন।

১৬শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান। শুক-শারী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা বর্ণন।

১৭শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শুক-শারী কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ বর্ণন। কৃষ্ণাষ্টক ও রাধাষ্টক।

১৮শ সর্গে—মধ্যাহ্ন লীলা। শ্রীরাধার সূর্য্য পূজা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শুক-শারীর দ্বারা পরস্পরের গুণ কথন। শ্রীকৃষ্ণের গ্রহাচার্য্য বেশে জটিলা বাক্যে শ্রীরাধার হস্তমুদ্রাদি পরীক্ষণ। মধুমঙ্গলের নিকট হইতে সখীগণের সূর্য্য পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ। প্রহেলিকা পাশক ক্রীড়া।

১৯শ সর্গে—অপরাহ্ণ লীলা। শ্রীরাধার গৃহে আগমন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিবিধ ভোজ্য প্রস্তুতকরণ। গোষ্ঠে দেবগণের কৃষ্ণস্তুতি। শ্রীকৃষ্ণের গোধন ও সখাসহ গৃহাগমন। ব্রজপথে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন।

২০শ সর্গে—সায়াহ্ন লীলা, শ্রীকৃষ্ণেব গো দোহনাদি। শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ভোজ্য প্রেরণ। শ্রীকৃষ্ণের স্নান ভোজনাদি। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ ভোজনাবশেষ গ্রহণ।

২১শ সর্গে—প্রদোষ লীলা। ব্রজবাজ সভায় নৃত্যগীতাদি। শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমন, শয়ন। গোপনে কুঞ্জে গমন। শ্রীবাধার যথাকালোচিত বেশে সখীসহ অভিসার। সঙ্কেত কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন।

২২শ সর্গে—নক্ত লীলা। পরস্পবেব সাক্ষাৎ, আলাপন, মিলন। শ্রীকৃষ্ণের বনশোভা বর্ণন। কৃষ্ণের উক্তিকে গোপীগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণ পক্ষে ব্যাখ্যা। সঙ্গীতাদি।

২৩শ সর্গে—রাসলীলা।

পদকর্ত্তৃগণ যে গোবিন্দ লীলামৃতেবই অনুসরণ করিয়াছেন, উদাহবণ দিতেছি।

দ্রুত কনক সবর্ণং সায়মেতন্মুরারে-
র্বসন মুরসি দৃষ্টং যৎ সখী তে বিভর্ত্তি।
কিমেদময়ি বিশাখে হা প্রমাদঃ প্রমাদো
ব্যবসিত মিদমস্তাঃ পশ্য শুদ্ধান্বয়ায়াঃ ॥

হেনই সময়ে বিশাখা দেখয়ে
উরপি পিয়ল বাস।
বিশাখাকে কহে কিবা দেখি ওহে
দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস ॥
হাহা পরমাদ বড় পরমাদ
এ কি পরমাদ হায়।
দ্রব হেম কাঁতি বসনের ভাতি
তোমার সখীর গায় ॥

সন্ধ্যাকালে কালি উরে বনমালী
দেখিয়াছি এই বাস।
সতী কুল হইয়া সেরূপে ভুলিয়া
ধরম করিল নাশ॥

স্বভাবান্ধে জালান্তর গত বিভাতোদিত রবি-
চ্ছটাজাল স্পর্শোচ্ছলিত কলকাঙ্গ দ্যুতিভরৈঃ।
বয়স্থায়াঃ শ্যামং বসনমপি পীতীকৃত মিদং
কুতো মুগ্ধে শঙ্কাং জরতি কুরুষে শুদ্ধমতিষু॥

মুখরা বচন শুনিয়া তখন বিশাখা চকিতা হইয়া।
দেখি পীতবাস আছে রাই পাশ একি একি ধীরে কৈয়া॥
মুখরাকে তবে কহে শুন এবে স্বভাব আন্ধল তুয়া।
একে এক দেখ আনে আন লখ নাহি কহ বিবরিয়া॥
রাইক কিরণ হেম দ্রব সম পিন্ধন নীলিম বাস।
তাহাতে বিহানে রবির কিরণে শোভে যেন পীতাভাস॥
গবাক্ষ জালেতে দেখ পরতেকে রবির কিরণ লাগে।
ইহার কারণে তোমার মরমে মিছা শঙ্কা কেন জাগে॥
শুদ্ধ সতি জনে হেন কহ কেনে অবুধ জনার মত
এ যদুনন্দন কহয়ে বিভ্রম কেন পরমাদ এত॥

৭। বিপ্রলম্ভ

বিপ্রলম্ভ—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে"। বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না। মিলনের পূর্ব্বে অথবা পরে পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার চুম্বন আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব, তাহাই বিপ্রলম্ভ।

পূর্ব্বরাগ—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

... ...

অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্যাচ্চারুতাধিকা॥

—উজ্জ্বলনীলমণি।

যে রতি মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নায়ক নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে, তাহারই নাম পূর্ব্বরাগ। যদিও মাধবের রাগই প্রথমে সমুৎপন্ন হয়, তথাপি মৃগাক্ষীগণের প্রথম রাগেই চারুতার আধিক্য কথিত হইয়া থাকে।

ব্রজদেবীগণের ললনানিষ্ঠ রতিতে দেখিবার, শুনিবার অপেক্ষা থাকে না। রূপ না দেখিয়া, গুণের কথা না শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণে রতি স্বয়ং উদ্বোধিত হয়, এবং অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তথাপি দর্শনশ্রবণাদিরও প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—কালীয়দমনদিনে গোপীগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল। ধেনুকবধের দিনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গোপীগণের পূর্বরাগের উদয় হয়। যদিও লীলা পর্য্যায়ে কালীয়দমন-লীলাই পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি লীলা-বর্ণন করিবার সময় শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী ধেনুক-বধই পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য্যগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণলীলারস-ভাবিত চিত্তের আবেশ-বশতঃ লীলার পৌর্ব্বাপর্য্য

রক্ষিত হয় নাই। আমাদের মনে হয়, তিনি লীলার চারুতা সম্পাদনের জন্যই, গোপীগণের পূর্ব্বরাগ পূর্ব্বে বর্ণন করিবার অভিপ্রায়েই অগ্রে ধেনুকবধ-লীলাই প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানদাস—"ধেনুকবধের দিনে আঁখিতে পড়িয়া গেল মোর" বলিয়া শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদে ধেনুকবধের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদে গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—"কালি-দমন দিন মাহ। কালিন্দীতীর কদম্বক ছাহ॥ কতশত ব্রজ নব বালা। পেখলুঁ জনু থিব বিজুরিক মালা॥ তঁহি ধনী মণি দুই চাবি। তঁহি মনোমোহিনী একু নারি॥ সো অব মঝু মন পৈঠে। মনসিজ ধুমেহু ঘুম নাহি দিঠে॥"

সাক্ষাৎ দর্শনেব গৌবচন্দ্র—

মবলে লাগিল গোবা না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল পারা॥
জলেব ভিতবে ডুবি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবন ময় গোরাচান্দ হৈল পারা॥
তেঁঞি বলি গোবারূপ অমিয়া পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে নব অনুবাগে।
সোনার ববণ গোরাচাঁদ হিয়াব মাঝে জাগে॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগে সাক্ষাৎ দর্শনেব একটি পদ—

সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল নন্দন, হরিল আমার মন, ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে॥
গোকুল নগরী মাঝে, আর কত নারী আছে, তাহে কোন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি, বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥
মল্লিকা চম্পকদামে, চূড়ার টালনি বামে, তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে, অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে॥
সে কি রে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম, নানাছান্দে বান্ধে পাক মোড়া।
শির বেড়া বেনানী জালে, নবগুঞ্জা মণিমালে, চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্বে হিলন গা, গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চন্দীদাসে কয়, না হইল পরিচয়, রসের নাগর বড় কালা॥

নায়িকা-ভেদে পূর্ব্বরাগের প্রকারভেদ আছে। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভার পূর্ব্বরাগ একরূপ নহে। "অভিযোগ" পূর্ব্বরাগের অপরিহার্য্য অঙ্গ। স্বপ্নেই হউক আর চিত্রপটেই হউক, কিংবা সাক্ষাদ্দর্শনেই হউক, যাহাকে দেখিয়াছি, দেখিয়া ভালবাসিয়াছি, সখীমুখে, দূতীমুখে, ভাটমুখে অথবা গুণিজনের গানে যাহার গুণের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, যাহার বংশীধ্বনি আমাকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছে, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য (নায়িকার) যে বিবিধ প্রচেষ্টা, তাহারই নাম অভিযোগ। অভিযোগে নায়কও বিশেষ পটু। নায়কেরও শ্রেণীভেদ আছে, কিন্তু অভিযোগ প্রয়োগে বোধ হয় সকল নায়কই সমান। কিশলয়-দংশনাদি ইহার উদাহরণ। এই অভিযোগ স্বভাবজ হইলে তাহার নাম অনুভাব, আর চেষ্টাকৃত হইলে তাহাকে স্বাভিযোগ বলে। মিলনের পরও অভিযোগ অন্তর্হিত হয় না, তবে তখন অনুভাবেরই প্রাচুর্য্য ঘটে, স্বাভিযোগের প্রায় প্রয়োজন থাকে না।

অভিযোগ তিন প্রকার—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ।

বাচিক—সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ-ভেদে দুই প্রকার। সাক্ষাৎ—গর্ব্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞাদি-ভেদে বহু প্রকার হয়। গর্ব্ব ও আক্ষেপাদিতে শব্দোত্থব্যঙ্গ ও অর্থোত্থব্যঙ্গ আছে। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই বলিতেছেন, কিন্তু সেই বলিবার ভঙ্গিতে শব্দগত ও অর্থগত ব্যঞ্জনায় অপর একটি গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হইতেছে। যাচ্ঞাও দুই প্রকার—আত্মার্থে যাচ্ঞা ও পরার্থে যাচ্ঞা। ছলপূর্ব্বক বলার নাম ব্যপদেশ, অর্থাৎ অন্য বর্ণনায় স্বাভিলাষ প্রকাশ। ব্যপদেশও দুইরূপ—শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গ ব্যপদেশ, অর্থোদ্ভব ব্যঙ্গ ব্যপদেশ। পূর্ব্বরাগে বাচিকের প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না, মিলনের পরেই ইহার আবির্ভাব স্বাভাবিক। উজ্জ্বলনীলমণিতে বাচিকের উদাহরণ আছে, উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা হইতে তাহার একটির অনুবাদ দিলাম।

আক্ষেপ হেতু অর্থোত্থব্যঙ্গ—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যামার উক্তি)

আমার আঁচলে মল্লিকার ফুল কেমনে দেখিলে তুমি ?
নিকটে আসিয়া কাড়িয়া লইলে কি করিতে পারি আমি ॥
যে দেখি তোমার বিপরীত রীত কাছে আসি কোন ছলে।
আমার গলার মুকুতার হার কাড়িয়া লইবে বলে ॥
গহন কাননে নাহি কোন জন অতি দূরে মোর ঘর।
কাহার শরণ লইব এখন হৃদয়ে লাগিছে ডর ॥

ইহার ব্যঞ্জনা—একেতো এই গহন বন, নিকটেও কেহ কোথাও নাই, আমার ঘরও অনেক দূর। এই সুযোগে তুমি যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। পূর্ব্বরাগে এই অভিযোগের স্থান নাই।

আঙ্গিক—

অঙ্গুলি স্ফোটন ছলে অঙ্গ সম্বরণ।
চরণে পৃথিবী লেখে কর্ণ কণ্ডূয়ন॥
নাসায় তিলক করে বেশ বিভূষণ।
ভুরুর নর্ত্তন আর সখী আলিঙ্গন॥
সখীর তাড়ন করে অধর দংশন।
হারাদি গাঁথয়ে আর ভূষণের স্বন॥
কৃষ্ণ আগে ভুজমূল প্রকাশিয়া রাখে।
চিন্তামগ্না হইয়া কৃষ্ণের নাম লেখে॥
তরুর অঙ্গে লতা দিয়া করায় মিলন।
আঙ্গিক বলিয়া তাহে কহে কবিগণ॥

পূর্ব্বরাগে মুগ্ধার পক্ষে চরণে পৃথিবী লিখনাদি অনুভাবরূপে গৃহীত হইতে পারে। অপর কয়েকটি উদাহরণ মধ্যা ও প্রগল্‌ভার পক্ষে স্বাভাবিক ও চেষ্টাকৃত—উভয় রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনভিজ্ঞা গ্রাম্য রমণীগণের মধ্যেও এইরূপ দুই চারিটি আঙ্গিকের অসদ্ভাব নাই। ইহা কোথাও বা চেষ্টাকৃত কোথাও বা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়া থাকে। রসকল্পবল্লী গ্রন্থে গোপালদাস একটি স্বরচিত পদে আঙ্গিকের উদাহরণ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে চাক্ষুষও আছে।

থির বিজুরি বরণ গোরি পেখলু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে নবমল্লিকার ফুলে॥
সই মরম কহিয়ে তোয়ে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসনে ব্যাকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া ধরয়ে লুফিয়া সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচ যুগে বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ যুগল মল্ল তোড়ল সুন্দর যাবক রেখা।
গোপাল দাস কয় পাবে পরিচয় পাল্টি হইলে দেখা॥

চাক্ষুষ—নেত্রের হাস্য, নেত্রের অর্দ্ধমুদ্রা, নেত্রান্তঘূর্ণন, নেত্রান্তের সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা অবলোকন এবং কটাক্ষাদির নাম চাক্ষুষ।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কটাক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যদ্ গতাগতিবিশ্রান্তিবৈচিত্র্যেণ বিবর্ত্তনম্।
তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞাস্তৎ কটাক্ষং প্রচক্ষতে ॥

নেত্রতারকার যে গতাগতিবিশ্রান্তি, অর্থাৎ লক্ষ্য পর্য্যন্ত গমন, তথা হইতে পুনরাগমন এবং গতাগতি মধ্যে লক্ষ্য সহ যে অল্পকাল স্থিতি ইত্যাদির চমৎকারিত্ব-রূপ বিবর্ত্তন, রসজ্ঞেরা তাহাকে কটাক্ষ বলেন। নাগরীগণ কটাক্ষবিক্ষেপ শিক্ষা করিয়া থাকেন। কবি কালিদাস ভ্রূবিলাস অনভিজ্ঞা জনপদবধূগণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বরাগে "**চাক্ষুষ**" চেষ্টাকৃত এবং নেত্রস্মিতাদি কোন কোনটি স্বাভাবিকও হইতে পারে।

কামলেখ—অনুরাগ-জ্ঞাপক পত্র নায়ক নায়িকা উভয় পক্ষ হইতেই প্রেরিত হইতে পারে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে 'নায়কের' পক্ষ হইতে কামাচার-মূলক উপায়ন প্রেরণের উল্লেখ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ বড়াই-এর হাত দিয়া শ্রীরাধার নিকট "পান ফুল" পাঠাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বরাগে অপ্রাপ্তিতে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বৈয়গ্র্য, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু অর্থাৎ মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত সঞ্চারী ভাব-সকলের উদয় হয়। এই রতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে তিন প্রকার।

সাধারণী—ভূ-শক্তি—অসুরাক্রান্তা-পৃথিবী কুব্জা। মথুরায় সাধারণী রমণী, কংসের মাল্যোপজীবিনীরূপে বন্দিনী। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মথুরার রাজপথে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন—তৎক্ষণাৎ কংসের ভয়াবহ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণকেই প্রার্থনা করিলেন—বলিলেন, আমি তোমার,—'তস্যৈবাহং', আমায় গ্রহণ কর। কুব্জার আত্মসুখের কামনা,—কিন্তু অন্যকে নহে,—কৃষ্ণকেই প্রার্থনা। তাই এই রতি সাধারণী। অন্যথা পণ্যা নারীকে নায়িকা রূপে গ্রহণ করা চলে না। কারণ অর্থের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ। পণ্যার প্রেম কোথায়? কিন্তু কুব্জার আত্ম-সুখের সম্বন্ধ থাকিলেও কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষ তো কাম্য নহে। তাই এই রতি অন্যা ভাগ্যবতীরও হইতে পারে। ইহাতে পূর্ব্বকথিত ব্যাধি হইতে মৃত্যুর

পরিবর্ত্তে বিলাপ পর্য্যন্ত ষোলটি ভাবের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই ভাবসমূহ তেমন গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় না।

সমঞ্জসা—শ্রীশক্তি—শ্রীরুক্মিণী এবং লক্ষ্মীরূপা অপরা মহিষীবর্গ। আমি যে কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াও তোমাকেই চাই। তুমি আমার, 'মমৈবাসৌ,'—আমায় গ্রহণ কর। এই সামঞ্জস্যের জন্যই ইহার নাম সমঞ্জসা। রুক্মিণী দ্বারকায় পত্র লিখিলেন—"আমি ক্ষত্রিয়কুমারী রাজকন্যা। পাপ শিশুপাল আমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছে। তুমি আসিয়া আমায় উদ্ধার কর, যেন সিংহের ভোগ্য শৃগালে স্পর্শ না করে। ওগো অজিত, তুমি গুপ্তভাবে বিদর্ভে এস। এস, কিন্তু একাকী নহে, এস তোমার অপরাজেয় যাদব সৈন্য এবং সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইয়া। এস, আসিয়া শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যবল মথিত করিয়া বীর্য্যশুল্কা আমি, আমাকে রাক্ষসবিধি অনুসারে বিবাহ কর। প্রকাশ্য দিবালোকে স্বজন এবং পরজনগণের সাক্ষাতে পট্টমহিষীর গৌরবে আমি তোমার সঙ্গিনী হতে চাই।"

ইহারা পরিণীতা পত্নী। সমঞ্জসা রতিতে—পূর্ব্বরাগে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। সমঞ্জসা নায়িকার অভিসারাদি নাই।

সমর্থা—লীলাশক্তি, শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁহারই। কৃষ্ণকে দান করিতে অপর কাহারো শক্তি নাই। তিনিই কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা। নারীধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম—এক কথায় সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি এবং তাঁহার অংশস্বরূপা অনুগামিনী, গোপীগণ কৃষ্ণের জন্যই কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছিলেন। এই রতিই রাগাত্মিকা রতি। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী সাধনার এই স্তরের নাম দিয়াছেন "মমৈবাসৌ"। আমিই তুমি, তুমিই আমি। কিন্তু ইহা অদ্বৈতবাদের সোঽহং নহে। ইহা অহংগ্রহ উপাসনা নহে। শ্রীকৃষ্ণানুধ্যানের প্রগাঢ় তন্ময়তায় সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ স্ফর্ত্তি হয়। দেহ স্মৃতিও থাকে না। আত্মবিস্মৃতি ঘটে। কবি জয়দেব শ্রীরাধার এই অবস্থার কথাতেই বলিয়াছেন—

মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥

মহারাস মণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর গোপীগণের এই দশা ঘটিয়াছিল। সকলে মিলিয়া কৃষ্ণলীলাব অনুকরণ করিয়াছিলেন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য এই চতুর্ব্বিধা রতি মধুরেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নায়িকা-শিরোমণি মহাভাব-স্বরূপিণীতেই সমস্ত ভাবের পর্য্যবসান। ইহাবই অপব নাম প্রৌঢ়রতি। ইহাতে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু অর্থাৎ মূর্চ্ছা এই দশ দশা।

লালসা—অভীষ্টপ্রাপ্তির প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা।—ঔৎসুক্য, চাপল্য, ঘূর্ণা শ্বাসাদি ইহার লক্ষণ।

উদ্বেগ—মনের চাঞ্চল্য। দীর্ঘনিশ্বাস, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ঘর্ম্ম আদি ইহার লক্ষণ।

জাগর্য্যা—নিদ্রাহীনতা। ইহাতে স্তম্ভ, শোষ রোগাদি উৎপন্ন হয়।

তামব—শরীরের কৃশতা। দৌর্ব্বল্য ও ভ্রমাদির জনক।

জড়িমা—ইষ্টানিষ্টজ্ঞানহীনতা। প্রশ্ন করিলে নিরুত্তর, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির অভাব। হুঙ্কার, স্তব্ধতা, শ্বাস, ভ্রমাদি লক্ষণ।

বৈয়গ্র্য—ভাবের অতলস্পর্শতা প্রযুক্ত অসহনীয় বিক্ষোভ। ইহা অবিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ, অসূয়া আদির জনয়িতা।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ-মাধবে উদাহবণ দিয়াছেন—নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন—

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্ত্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগীশমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং বত তস্য পশ্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি॥

দেবি, আশ্চর্য্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক যে কৃষ্ণে মনঃসংযোগের বাসনা করেন, এই বালা (শ্রীরাধা) কিনা সেই শ্রীকৃষ্ণে অমনোযোগী হইয়া বিষয়ে অভিনিবেশের চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়ে যাঁহার মুহূর্ত্ত মাত্র স্ফূর্ত্তির জন্য, যোগীশ্বরগণ সমুৎকণ্ঠিত হন, এই মুগ্ধা (শ্রীরাধা) সেই শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয় হইতে বিতাড়নের জন্য যত্ন লইতেছে।

ব্যাধি—অভীষ্টের অলাভে দেহের যে বৈবর্ণ্য ও গ্লানি। ইহার লক্ষণ—শীত, স্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাসপতনাদি।

উন্মাদ—সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র তন্মনস্কতা হেতু—ইহা তাহা নহে, এইরূপ ভ্রান্তি। ইহার লক্ষণ—"অত্রেষ্টদ্বেষ-নিশ্বাসঃ নিমেষঃ বিরহাদয়ঃ।"

মোহ—চিত্তের বৈপরীত্য। ইহাতে নিশ্চলতা ও পতনাদি ঘটে।

মৃত্যু—দূতী-প্রেরণাদিতেও যদি কান্ত না আসেন, তাহা হইলে মরণের উদ্যম ঘটে। বয়স্যাগণের প্রতি প্রিয়বস্তু সমর্পণ আদি ইহার লক্ষণ।

পদাবলীর মধ্যে, এই দশটি দশারই পৃথক পৃথক গৌরচন্দ্র ও পৃথক পৃথক পদ আছে। কাহারো কাহারো মতে পূর্ব্বরাগে প্রথম নয়নপ্রীতি—চারি চক্ষুর মিলন, পরে চিন্তা, আসক্তি, সঙ্কল্প, নিদ্রাহীনতা, তনুতা, বিষয়নিবৃত্তি, লজ্জাহীনতা, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু এই দশ দশা ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগেরও এই ক্রম।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ—দ্বিজ চণ্ডীদাস যেমন কৃষ্ণনাম শুনাইয়াই রাধার পূর্ব্বরাগের উদ্রেক করিয়াছেন—"সখি, কেবা শুনাইল শ্যামনাম", তেমনই বড়ু চণ্ডীদাস বড়াই-এর মুখে রাধার রূপের কথা শুনাইয়াই কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ উদ্রিক্ত করিয়াছেন—

"তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা শুনি। ধরিবারে না পারোঁ পরাণি ॥
দারুণ কুসুম শর সুদৃঢ় সন্ধানে। অতিশয় মোব মনে হানে ॥"

সাক্ষাদ্দর্শনের পদ—

যব গোধূলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা দন্দ পসারিয় গেলি ॥
ধনি অলপবয়সী বালা, জনু গাথনি, পহুপ-মালা।
থোরি দরশনে, আশ না পূরল, বাঢ়ল মদনজ্বালা ॥
গোরি কলেবর নূনা, জনু আঁচরে উজোর সোনা।
কেশরি জিনি, মাঝারি খিনি, দুলহ লোচন কোণা ॥
ঈসত হাসনি সনে, মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর, শ্রীকবিরঞ্জন ভণে ॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি—পূর্ব্বরাগে নায়ক নায়িকা—উভয়েরই অভিযোগ আছে, দূতী-প্রেরণ আছে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই আপ্তদূতী আছেন। পূর্ব্বরাগেও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য আছে। যেমন দীন চণ্ডীদাসের বাজীকর। অবশ্য মানের

পর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যের পদই প্রসিদ্ধ। মিলনের পর প্রেম প্রগাঢ় হইলে শ্রীরাধাও স্বয়ং দৌত্যে অগ্রসর হইয়াছেন। বনস্থলীতে উভয়ের স্বয়ং দৌত্যে পরস্পরের উত্তর প্রত্যুত্তর পদাবলীর বৈচিত্র্যেরই পরিচায়ক। মিলনের পূর্ব্বে সখীশিক্ষা, পরে সখী কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ। নবোঢ়া মিলনের পর রসালস ও রসোদ্গার।

নবোঢ়া মিলন—

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনতবয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরসিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ অগোরল গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥

দ্গার—

কাজর ভমর তিমির জনু তনুরুচি নিবসই কুঞ্জকুটীর।
বাঁশি নিশাসে মধুর বিষ উগরই গতি অতি কুটিল অধীর॥
সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয় চন্দনরুহে লাগল ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥
লোচন-কোণে পড়ত যব নাগরি রহই না পারই থির।
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পিবই কুলবতি বরত সমীর॥

এক অপরূপ নয়ন বিষ তাকর মেটয়ে দশনক দংশে।
ও বিষ ঔষধ বিষ অবধারল গোবিন্দ দাস পরশংসে ॥

ইহা নবোঢ়ার রসোদ্‌গার নহে।

রসোদ্‌গারের অপর একটি বিচিত্র পদ—

আধকি আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখ লুঁকান।
তব ধরি কোটি কুসুম শরে জর জর বহত কি যাত পরাণ ॥
সখি জানলুঁ বিহি মোরে বাম।
দুই নয়ন ভরি যো হরি হেরয়ে তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥
সুনয়নি কহত কানু ঘন শ্যামব মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ রসে ভাসত মঝু হৃদয়ে জলু আগি ॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জীউ তেজই চপল জীবনে মঝু আশ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতী রস-মরিজাদ ॥

৮। মান

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্তা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

—উজ্জ্বলনীলমণি।

স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন।
তাথে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ॥

—উজ্জ্বলচন্দ্রিকা।

পরস্পর অনুরক্ত ও একত্রে অবস্থিত নায়ক-নায়িকার দর্শন আলিঙ্গনাদি নিরোধক—মান। পৃথক অবস্থানেও মান সম্ভব হয়। যেখানে প্রণয়, সেইখানেই মান। মানের কারণ ঈর্ষা। ইহা সহেতু। নির্হেতু মানও হয়। নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চাপল্য, গর্ব্ব, অসূয়া, ভাব গোপন, গ্লানি, চিন্তা মানের পরিচায়ক।

নায়িকার মান সহেতু। সহেতু মান দুই প্রকার, উদাত্ত ও ললিত। উদাত্ত—দাক্ষিণ্যোদাত্ত ও বাম্যগন্ধোদাত্ত, এবং ললিত—কৌটিল্য ললিত ও নর্ম্মললিত, দুই দুই চারি প্রকার। নির্হেতু মান নায়ক-নায়িকা উভয়েরই হয়। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কৌস্তুভমণিতে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্যা নায়িকা ভ্রমে শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছিলেন। প্রণয়কলহে উভয়ের মান হইতে পারে। প্রেমদাস শ্রীরাধার লাবণ্য-তরঙ্গে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মানের পদ লিখিয়াছেন। রায়শেখর বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন—

বড় অপরূপ পেখলুঁ হাম।
কি লাগিয়া দুঁহে কয়ল মান॥
বিবরি কহিবে সজনি হে।
এ কথা শুনিলে আউলায় দে॥
এত অদভূত কোথা না শুনি।
নাগরী উপরে নাগর মানি॥
এহো অপরূপ কোথা না দেখি।
হেন প্রেম দুঁহু শেখর শাখী॥

সহেতু মানে অন্যা নায়িকার সঙ্গ-দর্শন অপেক্ষা প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শনের পদই সংখ্যায় বেশী। সহেতু মান আবার সাধারণ মান ও দুর্জ্জয় মান—এই দুই ভাগে বিভক্ত।

মানের প্রসঙ্গে অভিসারিকাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ: যিনি নিজে অভিসার করেন, অথবা নায়ককে অভিসার করান, তিনিই অভিসারিকা নামে পরিচিতা। নায়কের সঙ্কেতানুসারে নায়িকা অভিসার করিয়াছেন। তাহার পর বাসকসজ্জায়—কুঞ্জ সাজাইয়া নিজে সজ্জিতা হইয়া কান্তের আগমন আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন। কান্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। সঙ্কেত করিয়াও কান্ত কেন আসিলেন না, এই চিন্তায় বিপ্রলব্ধা খেদ করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রজনী জাগিয়া, বিলাস-চিহ্ন অঙ্গে মাখিয়া প্রভাতে আসিয়া শ্যাম শ্রীরাধার কুঞ্জে দর্শন দিলেন। শ্রীরাধার তখন খণ্ডিতা অবস্থা। তিনি কলহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জ হইতে যাইতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। এই অবস্থায় নায়িকার নাম কলহান্তরিতা। অতঃপর মান উপশমনের উপায় চিন্তা। শ্রীরাধা অনুতপ্তা হইয়াছেন, সখীগণ তিরস্কার করিয়াছেন, আশ্বাসও দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা রসান্তর এই ষড়্‌বিধ উপায়ে মান-ভঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। হাসি ও অশ্রু মানোপশমের লক্ষণ। বিনয় বাক্যের নাম সাম। ভেদ দুই রূপ, স্বমাহাত্ম্য-খ্যাপন (কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রচুর) ও সখীদ্বারা ভর্ৎসন। দান—ছল করিয়া বসন ভূষণ দান। নতি, পাদপতন। উপেক্ষা—মৌনত্ব, অথবা সাধ্য-সাধনা ছাড়িয়া অন্যের সঙ্গে আলাপ, অন্য বাক্য কথন। রসান্তর—আকস্মিক ভয়াদি। ইহা দুই প্রকার—দৈবাগত ও বুদ্ধিপূর্ব্বক। মানে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যের পদ প্রসিদ্ধ। বিদেশিনী বেশে, বীণা-বাদিনী বেশে, নাপিতানী বেশে, বকিনী বেশে, যোগী বেশে, গ্রহাচার্য্য বেশে, বাজীকর বেশে, আরও বহুবিধ-বেশে মিলনের পদ প্রচুর। শ্রীজয়দেবের মান-ভঞ্জনের পদ চিরপ্রসিদ্ধ। দুর্জ্জয় মান পাদ-পতনেও উপশমিত হয় না, তখনই অন্য উপায়ের অনুসন্ধান করিতে হয়। দুর্জ্জয়-মানে উদ্ধব দাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্পদংশন ছলনার পদ আছে। পদাবলীতে অভিসারিকা হইতে কলহান্তরিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পর্য্যায়ের পদ পাওয়া যায়। অষ্ট নায়িকার অপর দুইটি নায়িকা প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীন-ভর্ত্তৃকার পদেরও অপ্রতুল নাই।

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার—

জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর।
শেজ তেজি উঠয়ি নন্দকিশোর॥
সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি।
অবধি না পাওল ছুটল রাতি॥
জলধর রুচিহর শ্যামর কাঁতি।
যুবতি মোহন বেশ ধরু কত ভাঁতি॥
ধনি অনুরাগিণী জানি সুজান।
ঘোর আন্ধিয়ারে করল পয়ান॥
পরনারী পিরিতিক ঐছন রীত।
চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥
কুসুমিত কানন কালিন্দী তীর।
তাহা চলি আওল গোকুল-বীর॥
শেখর পন্থপর মিলল যাই।
আপনি নাগর ভেটলি রাই॥

শ্রীরাধার বর্ষাভিসার, সখী নিষেধ করিতেছেন—

মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দুরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

কলহান্তরিতার গৌরচন্দ্রিকা—

মান বিরহভরে পঁহু ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ।
অখিল জীবের মন লোচন-ফাঁদ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা।
প্রলাপ সন্তাপ আদি ভাব রসে ভোরা॥
কান্দিয়া কহয়ে পুন ধিক্ মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখলু কানু গুণনিধি॥
হইল মনের দুখ কি বলিব কায়।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নর নারী।
রাধামোহন কহে কছু নহিল হামারি॥

মানের প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা আছে। অনেকের চক্ষে খণ্ডিতার পদগুলি অশ্লীল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণ রাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্য্যও খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননার মধ্যে কাব্য-শ্রী অবমানিত হইয়াছে।"

আপন অধিষ্ঠানভূমি হইতে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব, বৈষ্ণব দর্শন এবং বৈষ্ণব সাধনার ঐতিহ্য হইতে পৃথক করিয়া, মাত্র সাহিত্য-হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীর বিচার কতখানি নিরাপদ বলিতে পারি না। তথাপি যদি সাহিত্য-হিসাবেই পদাবলীর আলোচনা করিতে হয়, তাহা হইলেও খণ্ডিতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত কামুক ছলনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকৃত নহে। চন্দ্রাবলীর অকপট প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি যাপন করিতে হইয়াছিল। ইহা কামুক ছলনা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কখনো এমনভাবে প্রভাতে আসিয়া শ্রীরাধার নিকট আত্মসমর্পণ

করিতে পারিতেন না। এই ঘটনায় শ্রীরাধার মর্য্যাদা বহু গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, কোনরূপ অবমাননার প্রসঙ্গই উঠিতে পাবে না। শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে সাধিয়া, শেষে পায়ে ধবিয়া শ্রীরাধার মান ভাঙ্গাইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে চন্দ্রাবলীর নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই, অথবা সেজন্য চন্দ্রাবলী তাঁহাকে কোনরূপ তিরস্কারও করেন নাই। আর ঘটনাটি যদি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকৃতই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নায়িকাগণ মধ্যে, সখী সমাজে শ্রীরাধার মান-বর্দ্ধনের জন্য, মহিমা-খ্যাপনের জন্যই তিনি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি যাপন করিয়াছিলেন। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্য রাধা-প্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনে পূর্ণ। শ্রীবাধার মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠার জন্যই চন্দ্রাবলীব অবতারণা। সুতরাং শ্রীরাধার তথা কাব্য-শ্রীর অবমাননা—আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা "প্রবাস" লীলায় এই শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছি।

আমি বাল্যকাল হইতেই খণ্ডিতা গান শুনিয়া আসিতেছি। দুইজন সিদ্ধ গায়কের খণ্ডিতা ও কুঞ্জভঙ্গ আমার বহুবার শুনিবার সৌভাগ্য হইযাছে। আমি রসিকদাস ও অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছি। আসরে শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু নরনারীর মেলা, কিন্তু চোখের জলে বুক ভাসে নাই, এমন কম লোকই দেখিয়াছি। রসিকদাস এবং অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গান করিতেন—

ভাল হইল আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥

আখর দিয়া ব্যাখ্যা করিতেন—

"এলে বন্ধু, এই সকালে এলে। কুঞ্জ সাজাইয়া, মালা গাঁথিয়া, ফুলশেজ বিছাইয়া, তোমার সেবার বহুবিধ উপকরণ লইয়া রাত্রি জাগিলাম, কত কান্দিলাম, তুমিতো আসিলে না। তাই এইমাত্র সেই গাঁথা মালা, সেই কুসুমশয্যা, সেই সেবার উপকরণ, সুবাসিত তাম্বুল সমস্তই যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি। তবু ভাল যে এই সকালে আসিলে। যদি জানতে পারি, তুমি এমনই সকালে আসিবে, এমনই কুঞ্জ সাজাইয়া, মালা গাঁথিয়া, সেবার উপকরণ লইয়া আমরা নিতুই জাগিব, নিতুই কান্দিব!" নরনারী এক অকথিত বেদনায় অস্থির হইত, জীবনের নিষ্ফল প্রতীক্ষার কথা স্মরণ করিয়া কান্দিয়া উঠিত। এইরূপ গান ও আখরের সঙ্গে

ইহাদের শ্লেষ ব্যঙ্গ এক অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় মুখরিত হইত। রসিকদাস যখন গাহিতেন—

"রাধে জয় রাজপুত্রি মম জীবনদয়িতে!
আর আমার কেউ নাই, এইবার আমায় দয়া কর।"

আসরের সমগ্র শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় উচ্ছ্বসিত আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিত। রসিকের মধুর উচ্চ কণ্ঠস্বর, প্রকাশের ব্যাকুলতা ও সুতীব্র আকুতি, আসরে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করিত। ক্ষণেকের জন্য হইলেও আপনার অসহায়তা স্মরণ করিয়া নরনারী যেন কাহার করুণা প্রার্থনায় ব্যাকুল হইত।

মানের একটি রহস্য আছে—কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীভগবানের উক্তি—

'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ স্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥'

প্রিয়া মান করেন—বলেন, তুমি শঠ, এত কপট কেন? আমি তো তোমাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, তথাপি কি তোমার তৃপ্তি হয় নাই? কিসে তোমার তৃপ্তি হয় তাহাও তো বল না। কেমন করিয়া সেবা করিলে সুখ পাও, তাহাও তো জানাইয়া দাও না। আমাকে তোমার মনের কথা বল না কেন? প্রিয়ার অভিমানের ইহাই কারণ।

ইহার আরো একটা দিক্ আছে। শ্রীরাধা মনে করেন—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়াই কি জীবন সর্ব্বস্ব আমার সুখী হইয়াছিলেন? আমি যে তাঁহার মনের কথা জানি। সুখী হইলে কখনই তিনি প্রভাতে আসিয়া আমার দর্শন প্রার্থনা করিতেন না, আমাকে দর্শন দিতেন না। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যতক্ষণ তিনি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলেন সর্ব্বক্ষণ আমার অনুধ্যানেই মগ্ন ছিলেন, নতুবা সারারাত্রি আমি এত যন্ত্রণা ভোগ করিলাম কেন? যেখানে আনন্দের পূর্ণতা নাই, সেখানে অনুরোধের বাধ্যতা কিসের জন্য?

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় শ্রীরাধার অন্তরের অভিপ্রায় সুব্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

এই শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ—

আমি কৃষ্ণপদদাসী তিঁহো রসসুখরাশি আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন জারেন মোর তনুমন তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ, অন্য নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ অনুক্ষণ মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দিয়া পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তিঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সকপট অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হইল মহাসুখ সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তার রূপে সতৃষ্ণ তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি লঞা যাঙ হাতে ধরি ক্রীড়া করাঞা তাঁরে কর সুখী॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ কৃষ্ণ পায় সন্তোষ সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান কৃষ্ণ তাতে সুখ পান ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে কৃষ্ণের মর্ম্ম নাহি জানে তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ পড়ুক তার শিরে বাজ কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে কৃষ্ণের করে সন্তোষে কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা তারে সেবো দাসী হঞা তবে মোর সুখের উল্লাস॥

৯। প্রেম-বৈচিত্ত্য

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

প্রিয়ের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে।
প্রেম-বৈচিত্ত্য হেতু বিরহ করি ভাবে॥

সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব-প্রণীত 'মুক্তাফল' গ্রন্থে পট্টমহিষীগণের গানে ইহার সুন্দর উদাহরণ আছে। পদাবলীতে ইহার উদাহরণ—

সজনি প্রেমিক কহবি বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতী কাতর কহত কানু পরদেশ॥
চাঁদক হেরি সুরজ করি ভাখয়ে দিনহি রজনি করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর প্রিয়ক বিরহ করি ভান॥
কব আওব হরি হরি সঞে পুছই হসই রোয়ই খেনে ভোরি।
সো গুণ গাই শ্বাস খেনে কাঢ়ই খণহি খণহি তনু মোড়ি॥
বিধুমুখী বদন কানু যব মোছল নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদন কান্ত কিয়ে ভাবিনি বল্লভ দাস সুখে মাতি॥

প্রেমের প্রগাঢ়তায় অনুরাগে প্রিয়কে যখন নিত্য নূতন বলিয়া মনে হয়—তখনই প্রীতির পরমোৎকর্ষে—

পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ॥

পরস্পর বশীভাব, প্রেম-বৈচিত্ত্য, অপ্রাণীমধ্যেও জন্মলাভের অতিশয় লালসা এবং বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি অনুভাব হইয়া থাকে।

তপশ্যামঃ ক্ষামোদরি বরয়িতুং বেণুষু জনু-
র্বরেণ্যং মন্যেথা সখি তদখিলানাং সুজনুষাং।
তপঃস্তামে নোচ্চৈর্যদিয়মুররীকৃত্য মুরলী
মুরারাতের্বিম্বাধর মধুরিমাণং রময়তি॥

—দানকেলিকৌমুদী।

শ্রীরাধা ললিতাকে কহিলেন—সখি, আমরা বেণু জাতিতে জন্ম প্রার্থনার নিমিত্ত তপস্যা করিব। অখিলে যত উৎকৃষ্ট জন্ম আছে, তন্মধ্যে বেণুজন্মই শ্রেষ্ঠ। কারণ এই মুরলী বহু তপস্যার ফলে মুরারীর বিম্বাধরমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছে।

প্রেম-বৈচিত্ত্য—প্রেমের বিচিত্রতা, ইহার মধ্যে বিরহের সুর আছে। প্রিয়তমের দর্শন না পাইলে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলিয়া মনে হয়, আবার মিলন হইলে সন্দেহ হয় পাইয়াছি তো? অভাগীর অদৃষ্টে এ সুখ স্থায়ী হইবে তো? হয় তো এখনই হারাইব! মিলনের দীর্ঘ সময়কেও পল বলিয়া মনে হয়, মনে হয় এই তো এখনই ফুরাইয়া গেল। সংসারে কেহ আপনার নাই, অপরে পরের ভাল দেখিতে পারে না। বিধাতাও বিরূপ, অন্য সব ছাড়িয়া যাহাকে আপনার বলিয়াছিলাম—আজ সেই পর বলিয়া মনে করিতেছে। তাহার ছায়াও দেখিতে পাই না। আমার যৌবন, এই বৃন্দাবন, অই যমুনা, অই কদম্বকানন, অই বংশীধ্বনি—আর সর্ব্বোপরি সুন্দর শ্যাম! সখি, আমি আপনা খাইয়া সর্ব্বস্ব হারাইলাম। ব্রজে আরো তো কত যুবতী আছে। যমুনায় জল আনিতে কে যায় না, মুকুন্দ মুখারবিন্দ কে দেখে না, বংশীধ্বনি কে শোনে না—কিন্তু কার এত জ্বালা! বাঁশী কেন আমারই নাম ধরিয়া ডাকে? বাঁশী কি জানে না আমি সহায়হীনা অবলা, আমি গৃহ-কারাগারে বন্দিনী, সংসারে কত বাধা, কত নিষেধ, পথে কত বিঘ্ন, আর তাহাতে আমাতে কত দূরতর ব্যবধান। ইহাই প্রেম-বৈচিত্ত্যের অপর দিক্। জীবনের ইহাও একটি অন্তর্নিহিত সুর। পদাবলী-সাহিত্যে কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে ইহার সূচনা। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে।

কৃষ্ণ কীর্ত্তনের—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন্ জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মো কৈল কোন দোষে॥

অঝর ঝরয়ে মোর নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥
আন্তর সুখায়ে মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডিদাসে॥

এই অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ পদ আক্ষেপানুরাগেরই পদ। কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসের—

বড়ায়ি গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলি ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর শুখাইল লো,
মুঞি নারী বড় অভাগিনী॥

এই সুর পদাবলী-সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

'সুখ দুখ পাঁচ কথা কহিতে না পাইলোঁ।
ঝালিয়ার জল যেন তখনই পলাইলোঁ॥'

এই তো সেই সুর, যাহার প্রতিধ্বনি পাই চণ্ডীদাসেরই অপর পদে—

একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোরে গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন বেথিত নাই শুনে যে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সবে একজন॥

কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, আপনার প্রতি, সখীর প্রতি, দূতীর প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি, গুরুগণের প্রতি,—আক্ষেপ কাহার প্রতি নাই? কেহ যে আপনার হইল না। এমন কি আমিও যেন আমার নই, আমার ইন্দ্রিয়গণ পর্য্যন্ত আমার বশীভূত নয়।

মানের দিনে কবি গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে গঞ্জনা দিয়াছিলেন—

শুনাইতে কানু মুরলীরব মাধুরী শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু তব মোরে রোখলি ভোর॥
সখি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে নেহা বাঢায়লি জনম গোঁয়ায়বি রোয়॥
বিনিগুণ পরখি পরখ সুখ লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোঁয়ায়লি ইহ রূপ লাবণি জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুঁহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদ-রস আশে।
সো অব নয়ন-ঘন-নীরে সিঞ্চহ কহতঁহি গোবিন্দদাসে॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে ইহার উত্তর আছে,—চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

এ পাপ নয়ন মোর ফিরান না যায়।
আন পথে যাই পদ কানু পথে ধায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম না লইব লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তথাপি দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥
যার কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক রহু এছার ইন্দ্রিয়গণ সব।
সদা সে কালিয় কানু হয় অনুভব॥
চণ্ডিদাস কহে রাই ভালভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

মানের দিনে গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—কুলবতী কেহ যেন নয়ন মেলিয়া পরপুরুষকে দেখে না। যদি দেখে, যেন কানুকে দেখে না।

যদি কানুকেই দেখে, যেন তাহার সঙ্গে প্রেম করে না। আর প্রেমই যদি করে, কখনো যেন কানুর উপর মানিনী হয় না।

প্রতি উত্তরে—জ্ঞানদাস বলিতেছেন—

শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ ভুলিয়া পিরিতি কৈলুঁ।
পিরিতি বিচ্ছেদে না রহে পরাণ ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥
সই পিরিতি দেসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন না শুনে ধরম কথা॥
পিরিতি মিরিতি (মৃত্যু) তুলে তৌলাইলুঁ পিরিতি গুরুয়া ভার।
পিরিতি বেয়াধি যায় উপজয়ে সে বুঝে না বুঝে আর॥
সভাই কহয়ে পিরিতি কাহিনী কে বলে পিরিতি ভাল।
কানুর পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে পাঁজর ধ্বসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে পিরিতি বেয়াধি হইল যাহার সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহ কানুর পিরিতি নিতি নৌতুন রঙ্গ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন "কানুর পিরিতি মরণ অধিক"। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

এক জ্বালা ঘর হৈল আর জ্বালা কানু।
জ্বালায় জ্বলিল দে সারা হৈল তনু॥

বলিয়াছেন—

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পিরিতির কথা॥

বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—

হইতে হইতে অধিক হৈল সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর পাগলী হৈয়া গেনু॥

আক্ষেপানুরাগের এমন অনেক পদ আছে, যে পদে একজনকে গঞ্জনা দিতে গিয়া আর একজনের কথা আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। কানুর কথা বলিতে গিয়া বাঁশির কথা উঠে, গুরুজনের কথা উঠে, আপনার নিরুপায় অসহায়তার কথা উঠে, ননদীর কথা উঠে। এইরূপ পদগুলিকে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করা চলে না।

কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপের একটি পদ—

বাঁশি বাজান জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে।
তুমি—নাম ধৈরা বাজাও বাঁশি, আমি মইরি লাজে॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
বিরহিণী নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥
যে ঝাড়ের বাঁশে বাঁশি সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
চাঁদকাজি বলে বাঁশি শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি॥

নিম্নের পদটি অনুরাগের পদ। সুর আক্ষেপানুরাগের—

সহি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন পুতলী করি লইয়াছি মোহন রূপ হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে মোকে না করিয়ে শ্রবণগোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারী গুপতে কহে পিরিতি এমতি হইলে তার যশ তিন লোকে গায়॥

পদাবলীর মধ্যে পূর্ব্বরাগে রূপের পদ আছে। রূপ দেখিয়া পূর্ব্বরাগের সঞ্চার করা হইয়াছে, কিন্তু তখনও প্রেম গাঢ় হয় নাই—তাই রূপের কথাই বলিয়াছেন। এই রূপ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে—অতি গোপনে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সখী কানে কানে এ কথাও বলিয়াছেন। তাহার অধিক বলিবার ভাষা ছিল না, সাহস ছিল না, কিন্তু রূপানুরাগের অবস্থা অন্যরূপ। এখন আর বলিতে লজ্জা নাই যে—

রূপ দেখি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

এখন এমন হইয়াছে—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালারূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিলে রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥

শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরালীরবে শ্রুতি পরিপূরল না শুনে আন পরসঙ্গ॥

সেই সুর, ইহার সঙ্গে আক্ষেপানুরাগের পার্থক্য খুব কম। কিন্তু পূর্ব্বরাগের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয়। পদ-কল্পতরুর মধ্যে রূপানুরাগ পৃথক-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১০। প্রবাস

পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানস্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥

—উজ্জ্বলনীলমণি।

পূর্ব্বসম্মিলিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে দেশ গ্রাম নদী বনাদি স্থানান্তরের ব্যবধান, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রবাস বলেন। পদাবলী-সাহিত্যে নায়কেরই প্রবাস বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবাস দুইরূপ,—বুদ্ধি-পূর্ব্বক ও অবুদ্ধি-পূর্ব্বক। কার্য্যানুরোধে দূরে গমনের নাম বুদ্ধি-পূর্ব্বক। বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রবাস দুই প্রকার—অদূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস। অদূর প্রবাস—কালিয়দমন, গোচারণ, নন্দ-মোক্ষণ ও রাসে অন্তর্দ্ধান। শ্রীকৃষ্ণ কালিয় সর্পকে দমন করিবার জন্য যমুনার কালিয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণঅদর্শনে ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গেলে গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আশাপথ চাহিয়া থাকিতেন। গোপরাজ নন্দ অরুণোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আসুরা বেলায় অবগাহন জন্য যমুনায় অবতরণ করিয়াছিলেন। এইজন্য বরুণের কোন অসুর কিঙ্কর গোপরাজকে বলপূর্ব্বক বরুণের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বরুণালয় হইতে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণের বরুণালয় গমন-জনিত অদর্শনে গোপীগণ বিরহাতুরা হইয়াছিলেন। মহারাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হন। পরে গোপীগণকে রাধাসঙ্গদানের জন্য শ্রীরাধাকেও সঙ্গছাড়া করেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীরাধার দর্শন প্রাপ্ত হন। তখন বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধা ও গোপীগণ সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করেন। ইহার অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির পূর্ণতার জন্য গোপীগণের একজন পথপ্রদর্শিকার প্রয়োজন ছিল। পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক গোপীগণ সেই পথপ্রদর্শিকার সঙ্গলাভ করিবেন, এবং সঙ্গলাভে ধন্যা হইয়া তাঁহাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্তা হইবেন। মাত্র রাধা পদাঙ্ক নয়,—শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল পদাঙ্ক দেখিয়াই গোপীগণ রাধাসঙ্গ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। রাধা সঙ্গে কৃষ্ণানুসন্ধান, কৃষ্ণ গুণগান এবং প্রেমের অপূর্ব্ব তন্ময়তায় কৃষ্ণলীলানুকরণ প্রভৃতির ফলেই অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দর্শন দেন। এই কালিয়-দমন, নন্দমোক্ষণ, রাসে অন্তর্দ্ধান বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের নিকট অদূর প্রবাস নামে পরিচিত। এই অদূর প্রবাস করুণাখ্য বিপ্রলম্ভরূপেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্রাচীন আচার্য্যগণ বিপ্রলম্ভকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। করুণের অর্থ "যুনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্ল্লভ্যে"। যুবক যুবতীর দুইজনের একজন লোকান্তরিত হওয়ার পর পুনরায় যদি সেই দেহে মিলন ঘটে, তবে তাহাকে করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ বলে। লোকান্তর অর্থে স্থানান্তর। চন্দ্রাপীড় লোকান্তরিত হইয়াছিলেন, লৌকিকদৃষ্টিতে তাঁহার মৃত্যু হইলেও দেহ বর্তমান ও অবিকৃত ছিল। কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের সেই দেহেই মিলন ঘটিয়াছিল। শকুন্তলাকে অপ্সরাতীর্থ হইতে অপহরণ করিয়া মেনকা কশ্যপাশ্রমে রাখেন; ইহা লোকান্তর। সেখানে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটে। এইগুলি করুণাখ্য বিপ্রলম্ভের উদাহরণ। রাসে অন্তর্দ্ধান এবং পুনরায় সেই দেহে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সঙ্গে মিলন, ইহাও রসশাস্ত্রের নিয়মে করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ গ্রহণ করিয়াছেন। বাণখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের মদন-শর নিক্ষেপে শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। এই মূর্চ্ছাই মৃত্যু। ইহাই নায়িকার লোকান্তর। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র পড়িয়া তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন। পুনরায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন সম-সাময়িক বা পরবর্ত্তী অপর কোন পদকর্ত্তৃর রচনায় করুণের উদাহরণ নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতে পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ —বিপ্রলম্ভের এই চারি বিভাগেরই পরিচয় আছে। তবে মানের প্রসঙ্গ নামমাত্র। রাসে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় গোপীগণকে দর্শন দিলে একজন মাত্র গোপী—"একা ভ্রুকুটীমাবদ্ধা *সন্দষ্ট দশনচ্ছদা*" তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, এই গোপীই শ্রীরাধা। কিন্তু এই মান ক্ষণমাত্রও স্থায়ী হয় নাই। কবি জয়দেব এবং পদাবলী-রচয়িতাগণ এই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

সুদূর প্রবাস। "সুদূর প্রবাস হয় তিন প্রকার। ভাবী, ভবন্, ভূত এই ভেদ তার"॥ ভাবী, ভবিষ্যতে—অদূর ভবিষ্যতে, ক্ষণ পরে ঘটিবে। অক্রূর শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। গোপরাজ নন্দের সারথি পথে পথে ঘোষণা করিতেছে,

কল্য প্রাতে সকলকে মথুরা যাইতে হইবে। সখি আমার দক্ষিণ আঁখি স্পন্দিত হইতেছে, অস্থির অন্তর বিদীর্ণ হইয়া পড়িবে। জানি না অদৃষ্টে কি আছে ?

ভবন্ বিরহ। বর্ত্তমানে—যাহা ঘটিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন। ঐ দেখ, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিনীনন্দন অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বানপূর্ব্বক যাত্রামঙ্গল পাঠ করিতেছেন। ওরে কঠিন প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণের পূর্ব্বেই আমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন কর। অন্যথায় এখনই মথুরাগামী রথের অশ্বক্ষুরাঘাতেই তুমি ক্ষত বিক্ষত হইবে।

ভূত বিরহ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, আসিব বলিয়া গিয়াছেন, আজিও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। মুকুন্দ-পদভূষিত এই সরিৎ, শৈল, বনদেশ, কানুর বেণুগীতি প্রতিধ্বনিত এই ব্রজভূমি, প্রতিপদে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করে। শ্রীকৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন রূপ, সেই আপনা ভুলানো হাসি, ভুলিতে পারি কই। শুধু কি নন্দ মহারাজ, জননী যশোমতী, কেবল কি রাখালগণ, শুধুই কি শ্রীমতী রাধারাণী এবং ব্রজযুবতীবৃন্দ,—পশু-পক্ষী তরু-লতা, কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মরণাতুর হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহেরও দশ দশা—

দশ দশা হয় তাহে চিন্তা জাগরণ।
উদ্বেগ তানব মলিনাঙ্গ প্রলাপন ॥
ব্যাধি উন্মাদ হয় মোহ অনুক্ষণ।
মৃত্যু এই দশ দশা কহে কবিগণ ॥

বৈষ্ণব কবিগণকে বিরহের কবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বরাগে বিরহ, মিলনেও বিরহ। গোপী-বিরহের অনুধ্যান বৈষ্ণব কবিগণের অন্যতম অবলম্বন। বহু বৈষ্ণব সাধক সিদ্ধদেহে অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণ করেন। অনেকেই মাথুর বিরহ শ্রবণ কীর্ত্তন করেন না, ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন শত শত সাধকের এই মাথুর বিরহই উপজীব্য।

"কয়েক দিনের জন্য দেখা দিয়া সেই যে অন্তর্হিত হইয়াছে, এত সাধ্য-সাধনা করিতেছি, এত ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছি, কই আর তো বারেকের জন্যও কাছে আসিয়া আমার এই মরণাধিক দুঃখ দূর কর না। আমার দুঃখ দেখিয়া কি তোমার সুখ হয় ?" অপূর্ণ মানবজীবনের এই বিরহের অনুভূতিই একান্ত

আপনার। মিলনের আনন্দ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? মিলন তো ক্ষণস্থায়ী। সুখের হাট ভাঙ্গিয়া যায় নাই, এমন মানুষ জগতে কয়জন আছে? তাই এই গোপী-বিরহ যেমন মানুষের অন্তর স্পর্শ করে, এমন বোধ হয় আর কিছুতে করে না। এমন যে কবি বিদ্যাপতি—যাঁহার রাধা সদা হাস্যময়ী, সদা চঞ্চলা, দুঃখের ছায়াও যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিও বিরহে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। রাধার সেই কলহাস্য, সেই গীতি-চাঞ্চল্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধার কৃষ্ণকে দেখিবার ভঙ্গী যেমন মধুর, দেখা দিবার ভঙ্গীও তেমনই মনোহারী। নব যৌবনের তরঙ্গ-হিল্লোলে এই উৎসবময়ী কিশোরী গিরিবক্ষ-বিহারিণী নির্ঝরিণীর মত নৃত্য-চপলা, আবেগ-চঞ্চলা। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শ্যামসুন্দর বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলেন—তাহার গতিবেগ অবরুদ্ধ হইল, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত চাঞ্চল্য পলকে থামিয়া গেল। মিলনে বাধা ঘটায় বলিয়া যাহার স্পর্শ-লালসায় "চীর চন্দন উরে হার না দেলা।" বক্ষে হার পরি নাই, চন্দন মাখি নাই, এমন কি কঞ্চুলিকা দূরের কথা বসন পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়াছিলাম—তাহার আমার মধ্যে আজ গিরিনদীর দুস্তর ব্যবধান। "সো অব গিরি নদী আতর ভেলা"।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা মুখরা গ্রাম্য গোপবালা। না জানে সরস সম্ভাষণ, না জানে নাগরীজনসুলভ ব্যবহার-চাতুরী। মঙ্গলকাব্যের দেবতা যেমন জগজ্জীবের পূজা পাইয়াও পরিতৃপ্ত নন্, উদ্দিষ্ট বিরুদ্ধভাবাপন্ন উপাসকের পূজা না পাইলে যেমন তাহার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণঃ শ্রীরাধাকে না পাইলে তাঁহার জীবনই বিফল। মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণও আপন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তিনিই যে সর্ব্বাবতার শিরোমণি দেবরাজ, সুস্পষ্ট ভাষায় সে কথা বলিয়াছেন। রাধার কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। রাধার প্রেম লাভের জন্য অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ দানী সাজিয়াছেন, নৌকা বাহিয়াছেন,—ভার বহিয়াছেন, রাধার মাথায় ছাতা ধরিয়াছেন। অনেক সাধ্যসাধনায়—অনেক কৌশলে শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁহার মিলন ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই কয়েকবার মাত্র, তাহার পর আর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নাই। এমন যে অজ্ঞাতযৌবনা, মিলন-ভয়-চকিতা কিশোরী, তিনিও শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্যাপতির রাধার মতই বলিয়াছেন—

ওপারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হঞা উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি॥

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলি যাঁহারা অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—দ্বিজ চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসেরই অভিনব সংস্করণ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণাস্নানে জাতির যেমন জন্মান্তর ঘটিয়াছে, বড়ুও তেমনই দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন। সেই ছন্দ, সেই সুর, পার্থক্য—দৃষ্টিভঙ্গীর। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীরাধার একটি দিক দেখিয়াছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় নূতন দৃষ্টি লাভে সেই মহাভাবময়ীর আর একটি দিক দেখিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুইজন একই গোষ্ঠীর কবি। দুইজনের নায়িকাই অজ্ঞাতযৌবনা। দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাধাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিয়াছেন—"পাসরিব করি মনে পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়"। এই মুগ্ধা—এই ভাব প্রকাশে অক্ষমাও বিরহে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার অন্তরনিরুদ্ধ বিরহ-বেদনা শত উৎসে উৎসারিত হইয়াছে।

কবিগণের মধ্যে যাঁহারাই বিরহের গীতি গাহিয়াছেন, তাঁহারাই বর্ষার কথা কহিয়াছেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই বিরহের কবি এবং বর্ষার কবি। বর্ষার নিকষ কাল নবীন মেঘ যেদিন আকাশ ছাইয়া নিবিড় হইয়া আসে, মেঘের অঞ্জন নয়নে আসিয়া লাগে,—বিশ্ব দৃশ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, রুদ্ধ দুয়ারে নির্জ্জন কক্ষে আপনাকে একান্ত একাকী মনে হয়,—মেঘের গুরু গরজনে অন্তর গুমরিয়া উঠে, বাহিরের বাদল আঁখিতে আসিয়া আশ্রয় লয়। সে দিন তো আর কাহারো কথা, আর কোন কথা মনে পড়ে না। সে দিন শুধু তোমারই জন্য প্রাণ উতলা হয়। চিত্ত অস্থির হয়। বর্ষার মেঘ জয়দেবকেও চঞ্চল করিয়াছিল।

বড়ু চণ্ডীদাস বর্ষার কথায় বিরহের চাতুর্মাস্য যাপন করিয়াছেন। মঙ্গল-কাব্যের "বারমাস্যা"—বার মাসের দুঃখের কথা বহুপরিচিত। বড়ু চণ্ডীদাসের সমকালীন কোন কবির বাঙ্গালা কাব্য বা কবিতা পাওয়া যায় নাই। বিরহের চাতুর্মাস্য বর্ণনায় চণ্ডীদাসকেই আদি কবি বলিয়া মনে হয়।

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরয়ে॥
পাখীজাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাঁও তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ॥
কেমনে বঞ্চিব রে বারিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাশ॥ ধ্রু॥

শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজ্বালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা॥
ভাদর মাসে অহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক॥
আশিন মাসের শেষে নিবিড়ে বাবিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী॥
তবেঁ কাহ্ন বিনী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥

পদকল্পতরু হইতে সিংহভূপতির চাতুর্মাস্তের পদ উদ্ধৃত কবিয়া দিলাম—

যৌব বন বন শোব শুনত বাঢ়ত মনমথ-পীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আওল অবহুঁ গগন গম্ভীর॥
দিবস রয়না আ-রি সখি কৈছে মোহন বিনে যাওয়ে॥ ধ্রু॥
আওয়ে শাওন বরিখে ভাঙন ঘন শোহায়ন বাবি।
পঞ্চশব-শর ছুটত বে কৈছে জীয়ে বিবহিণী নারি॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো কাকো কহি ইহ দুখ।
নিডরে ডর ডর ডাকে ডাহুকি ছুটয়ে মদন-কন্দুক॥
অছুহ আশিন গগন ভাখিণ ঘনন ঘন ঘন রোল।
সিংহভূপতি ভণয়ে ঐছন চতুর মাসকি বোল॥

এই পদটির এখানে ব্যাখ্যা দিতেছি। কারণ শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর এই পদের "ভাখিণ" শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

"তথা গগনে ভাখিণ দীপ্তি ক্ষীণাং পাণ্ডুর বর্ণা অপি ঘর ঘর শব্দায়াস্ত রোলঃ শব্দঃ রোদন বিশেষঃ"। পদকল্পতরুতে স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দীপ্তি ক্ষীণের সঙ্গে রোদন বিশেষের কোন সম্বন্ধ নাই। আর শরতের গগন দীপ্তিহীন হয় না। এখানে "ভাখিণ" অর্থে মুখর।

ব্যাখ্যা এইরূপ—বনে বনে ময়ূরের শব্দ শুনিতেছি। মনমথ পীড়া বাড়িতেছে। প্রথমে ছার আষাঢ় আসিল, এখন গগন গম্ভীর। ওরে সখি মোহন (ভুবনমোহন, আমার মনমোহন শ্যামচাঁদ) বিনা দিবস রজনী কিরূপে যাইবে? শ্রাবণ আসিল, শোভন ভঙ্গীতে নিরন্তর বারি বর্ষণ করিতেছে। মদনের বাণ ছুটিতেছে। বিরহিণী নারী কিরূপে বাঁচিবে। ভাদ্রও আসিল। মাধব ভিন্ন এ দুঃখ কাহাকে কহিব? নির্ভয়ে ডর ডর শব্দে ডাহুকী ডাকিতেছে, যেন মদনের (ক্রীড়া) কন্দুক (গোলক, গেঁড়ুয়া) ছুটিতেছে। আশ্বিন আসিল, গগন মুখর হইল। ঘনন ঘনন রোল উঠিতেছে। (যেন শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আশ্বিনের আকাশও হাহাকার করিয়া কান্দিতেছে।) সিংহ ভূপতি চাতুর্মাস্যের কথা বলিতেছেন।

পদাবলী সাহিত্যে—শ্রীরাধার বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতকালোচিত বিরহের পৃথক পৃথক বর্ণন আছে। কয়েকজন কবি দ্বাদশ মাসিক বিরহের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস"। যে মাঘ মাসে চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই মাঘের পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শচীনন্দন দাস মাঘ মাস হইতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিরহের বারমাস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। লোচন দাসের ফাল্গুন হইতে এবং ভুবনমোহনের মাঘ হইতে বিরহ-গীতি আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের—

"নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নির্ত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি" শ্লোকের লঘু তোষণী টীকায় শ্রীকৃষ্ণের বর্ষক্রম বিচারে নির্ণীত রহিয়াছে, তিনি দ্বাদশ বৎসরের গৌণ ফাল্গুন দ্বাদশীতে কেশীবধ করিয়া তৎপরদিবসই মথুরা গমন করেন, এবং চতুর্দ্দশীতে কংস নিহত হয়। শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বৎসর কয়েকমাস শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অতঃপর মথুরাযাত্রা—মাথুরলীলা। পদকল্পতরুতে শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহের একটি পদ আছে। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পদের শেষে বলিয়াছেন—এই পদের প্রথম দুইমাসের বিরহ বিদ্যাপতির রচনা। চারিমাসের বিরহের কথা গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়াছেন। বাকী ছয় মাসের কথা স্মরণ করিয়া আমি অভাগিয়া রোদন করিতেছি। এই পদের আরম্ভ চৈত্রমাস হইতে—"গাবই সব মধুমাস, তনুদেহ বিরহ হুতাশ"। গোবিন্দ কবিরাজ স্বতন্ত্র একটি বারমাস্যার পদ অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম দাস বলিয়াছেন—"দেখ পাপি আঘন মাস"। কালিয়দমন-যাত্রার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাথুর পালায় একটি ঝুমুর গাহিতেন—(আরম্ভ মাঘ মাস হইতে) ওরে নিষ্ঠুর কালিয়া অবলায় দুখ দিলিরে—(ধুয়া)

মাঘে মাধব কৈলা মথুরা গমন।
পিয়া বিনে শূন্য দেখি এ তিন ভূবন॥

নীলকণ্ঠের মধুমাখা কণ্ঠে এই গান শুনিয়া পশুপাখীও কাঁদিত। বলরাম দাস অগ্রহায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণেব দ্বাদশ মাসিক বিবহ বর্ণন কবিয়াছেন।

মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাবেব নাম অধিরূঢ় মহাভাব। ব্রজদেবীগণ রূঢ় মহাভাবেব অধিষ্ঠাত্রী। অধিরূঢ় মহাভাবেব দুই রূপ—মোদন বা মোহন এবং মাদন। মাদনাখ্য মহাভাব বিবহেব অতীত, শ্রীবাধাই এই ভাবৈশ্বর্য্যের অধীশ্বরী। মোদনের বিরহাবস্থার নাম মোহন। মোহন শ্রীরাধার মুখ ভিন্ন অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয় না। মোহন কোন অনির্ব্বচনীয়াবৃত্তি বিশেষে বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইলে "দিব্যোন্মাদ" নামে অভিহিত হয়। শ্রীগৌবাঙ্গের গম্ভীরা লীলায় এই দিব্যোন্মাদ মর্ত্ত্য মানবের দৃষ্টিবিষয়ীভূত হইয়াছিল। দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প আদি দশার প্রকাশ ঘটে। নানাবিধ বিলক্ষণ বৈবশ্য-চেষ্টার নাম উদ্‌ঘূর্ণা। শ্রীরাধা কখনো কুঞ্জে অভিসার করিতেছেন, কখনো কুঞ্জগৃহে গিয়া শয্যারচনা করিতেছেন, কখনো কৃষ্ণভ্রমে নবজলধরকে তিরস্কার করিতেছেন। এই ভ্রমময় চেষ্টা উদ্‌ঘূর্ণা।

প্রিয় দয়িতের কোন অন্তরঙ্গ সুহৃদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে গূঢ়রোষ বশতঃ যে ভূরিভাবময় জল্প অর্থাৎ কথন, তাহার নাম চিত্রজল্প। চিত্রজল্প দশ প্রকার। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে সাতচল্লিশ অধ্যায়ে ভ্রমর-গীতায় ইহাব পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। চিত্রজল্পের মাধুর্য্য-চমৎকৃতির আস্বাদন মানবকল্পনার অতীত। সে সুদুস্তর ভাব ভাষায় প্রকাশিত হয় না। শ্রীপাদ রূপের কৃপায় এই ভাবের কণিকা মানবের অনুভূতি-গম্য হইয়াছে।

প্রজল্প। অসূয়া, ঈর্ষ্যা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞা মুদ্রা দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির প্রতি যে অকৌশল কথন, তাহাই প্রজল্প।

পরিজল্প। প্রভুর নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদি দোষপ্রতিপাদনপূর্ব্বক আপনার বিচক্ষণতা প্রকাশের নাম পরিজল্প।

বিজল্প। গূঢ় মানমুদ্রার অন্তরালে সুস্পষ্ট অসূয়ার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে কটাক্ষ, তাহাই বিজল্প।

উজ্জল্প। গর্ব্বগর্ভ ঈর্ষ্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য কীর্ত্তন ও অসূয়া সহ আক্ষেপ প্রকাশ।

সংজল্প। দুরধিগম্য সোল্লুণ্ঠ আক্ষেপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকৃতজ্ঞতার আরোপ।

অবজল্প। শ্রীহরির কাঠিন্য, কামুকতা ও ধূর্ত্ততার সহিত ভয় ও ঈর্ষা হেতু আসক্তির অযোগ্যতা কথন।

অভিজল্প। শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষীগণকেও খেদান্বিত করেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত।—ভঙ্গি দ্বারা এইরূপ অনুতাপ-বচনের নাম অভিজল্প।

আজল্প। যাহাতে নির্ব্বেদ হেতু শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা এবং দুখদাতৃত্ব বর্ণিত হয়।

প্রতিজল্প। শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্বভাব পরিত্যাগ করিবেন না, সুতরাং কিরূপে আমরা তাঁহাকে পাইব, দূতের সম্মানপূর্ব্বক এইরূপ উক্তি প্রতিজল্প।

সুজল্প। যাহাতে সারল্য-নিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্য ও চাঞ্চল্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা থাকে।

পূর্ব্বে সম্পন্ন হিন্দুগৃহে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে লীলা-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইত। আজিও কচিৎ কোথাও এ রীতি চলিত আছে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কোন কোন কীর্ত্তনীয়া মাথুর গান করিতেন। অনেক স্থলে গৃহকর্ত্তার ইচ্ছানুসারেও মাথুর গান হইত। বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসরে রসিকদাস কীর্ত্তনীয়া মাথুর গান করিয়াছিলেন। বহু দিন পর্য্যন্ত এ গানের গল্প শুনিয়াছি। দিব্যোন্মাদ দশার গৌরচন্দ্রে গান আরম্ভ হইয়াছিল।

গৌরচন্দ্র॥ কি বলিব বিধাতারে এ দুখ সহায়।
গোরামুখ হেরি কেন পরাণ না যায়॥
মলিন বদনে বসি আঁখি যুগ ঝরে।
আকাশগঙ্গার ধারা সুমেরু শিখরে॥
ক্ষণে মুখ শির ঘসে ক্ষণে উঠি ধায়।
অতি দুরবল ভূমে পড়ি মুরছায়॥
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সভে কান্দে।
চৈতন্যদাসের হিয়া থির নাহি বান্ধে॥

অতঃপব পুরুষোত্তম দাসের পদ—

নিজ গৃহ তেজি চলল বিরহিণি দারুণ বিরহ হুতাশে।
কালিন্দি পৈঠি পরাণ পরিতেজব এহি মরম অভিলাষে॥
হবি হরি কি কহব ও দুখ ওব।
ধাই সব সহচরি কাননে যাওল ললিতা লেওল কোর॥
ঐছন বচন বৃন্দামুখে শুনইতে ভগবতি দ্রুত চলি গেলি।
আপন কুঞ্জকুটির মাহা আনল সবহুঁ সখিগণ মেলি॥
সবসিজ-শেজে শুতায়ল সহচবি চৌদিশে রহু মুখ চাই।
অনুকূল প্রতিকূল সবহুঁ রমণীগণ শুনইতে আওল ধাই॥
দশমিক পহিল দশা হেবি আকুল রোয়ত অবনী লোটাই।
আওব বচনে কোই পরবোধই পুরুষোত্তম মুখ চাই॥

এক সখী গিয়া চন্দ্রাবলীকে সংবাদ দিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল,—শ্রীরাধার দশমী দশা উপস্থিত। সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রাবলী তাঁহাকে কত তিরস্কার করিলেন। বলিলেন—পুনরায় ওকথা বলিলে তোমার মুখ দর্শন করিব না। সকলে মিলিয়া শ্রীবাধাকে বাঁচাও। তিনি চলিয়া গেলে ব্রজের হাট ভাঙ্গিয়া যাইবে। কৃষ্ণ দর্শনের আশা চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। নন্দনন্দন যদি কোন দিন বৃন্দাবনে আগমন করেন—সে আমাদের জন্য নয়, একমাত্র শ্রীরাধাকে দেখিবার জন্য, শ্রীরাধাকে দেখা দিবার জন্যই আসিবেন। চন্দ্রাবলী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাইক দশমী দশা নিজ সখি মুখে শুনি চন্দ্রাবলী রোই।
নিজ তনু ঢারি ধুলি গড়ি যাওত ভূতলে কুন্তল ফোই॥
রাইক প্রেমে পুনহি নন্দনন্দন আওব করি ছিল আশ।
সো সব মনরথ বিহি কৈল আনমত এত দিনে ভেল নৈরাশ॥
এত কহি পুন পুন শিরে কর হানই মুরছিত হরল গেয়ান।
পদ্মা দেবি কোর পর লেয়ল ঝর ঝর লোরে নয়ান॥
বহুখনে চেতন পাই মলিন মুখি বৈঠল ছোড়ি নিশ্বাস।
রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরি কহ পুরুষোত্তম দাস॥

এ যেন এক অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত সম্মেলন। শ্রীকৃষ্ণবিরহ আজ দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী

যূথেশ্বরীকে একত্রে সম্মিলিত করিয়াছে। সখী পদ্মাবতী চন্দ্রাবলীকে শ্রীরাধার নিকট লইয়া গেলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী যূথেশ্বরী, আশে-পাশে স্বপক্ষা বিপক্ষা অনেকেই রহিয়াছেন। চন্দ্রাবলীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। একেবারে শ্রীরাধার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ললিতাকে বলিলেন—শ্রীরাধা যদি বাঁচিয়া থাকেন, আবার ব্রজনাথ ব্রজে আসিবেন। শ্রীরাধা যাহাতে বাঁচেন, তাহারই উপায় রচনা কর।

যেখানে শুতিয়া ধনী রাই। চন্দ্রাবলি তাহা যাই॥
রাইকে হেরি আগেয়ান। নিঝরে ঝরে দুনয়ান॥
কহয়ে ললিতা সঞে বাত। পুনহি আওব ব্রজনাথ॥
অব যৈছে জীবয়ে রাই। ঐছন রচহ উপায়॥

কেহ যদি শ্যামের নিকট গিয়া সংবাদ দেয়, শ্রীরাধার এই দশমী দশার কথা তাঁহার নিকট গিয়া নিবেদন করে—

কো যদি কহে তছু ঠাম। শুনইতে আওব শ্যাম॥

এইবার চন্দ্রাবলীর মনে হইল, এই তো অপূর্ব্ব সুযোগ, শ্রীরাধার চরণ স্পর্শ করিতে হইবে। যে পদপল্লব শিরে ধারণ করিয়া শ্রীনন্দনন্দন ধন্য হইয়াছেন, আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে, সেই পদযুগল বক্ষে ধারণ করিতে পাইব। মনে দৃঢ় সংকল্প পদস্পর্শ করিব। কিন্তু কোথায় যেন একটু সঙ্কোচ। সখীগণ সকলেই রহিয়াছেন, আপনার অজ্ঞাতসারে কোন্ অবচেতনের অন্তস্তল হইতে অত্যন্ত ধীরে কে যেন অগ্রসর হইতে বাধা দিতেছে। একজন আত্মীয়কে সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় অচেতন থাকিতে দেখিয়া অন্যজন আসিয়া কেমন আচরণ করে? চিকিৎসক না হইয়াও, সেবক-সেবিকা না হইয়াও অতি সন্তর্পণে অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখে—দেহে উত্তাপ আছে কিনা, এখনো আশা করিবার অতি ক্ষীণ সূত্রও পাওয়া যায় কিনা। চন্দ্রাবলী প্রথমেই গিয়া শ্রীরাধার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেন, ললাটে হাত রাখিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, হস্তে এখনো উত্তাপ আছে কিনা। রসিকদাস আপনার অননুকরণীয় "আখরে" এইরূপে চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া পদ গাহিলেন—

(চন্দ্রাবলী—) রাই ললাটে কর আপি। পরীখয়ে দেহক তাপি॥
তুহিন শীতল হেরি গাত। পদযুগে রাখল হাত॥

বক্ষ, ললাট, হস্ত উত্তাপহীন দেখিয়া চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার পদ দুইটিতে হাত রাখিলেন। অকস্মাৎ পদ দুইটি আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চেতনা হারাইলেন।

পদকল্পতরুতে—এই পংক্তি চতুষ্টয় পাওয়া যায় না। বহু অনুসন্ধান করিয়া কোন হস্তলিখিত পুঁথিতেও কলি চারিটি পাই নাই। ইহা "তুক" হইতে পাবে। পদকল্পতরুতে "শুনইতে আওব শ্যাম" এই ছত্রেব পরে আছে—

"এত কহি কহই না পারি। মুরছি পড়ল তনু ঢারি॥"

রসিকদাস গাহিয়াছিলেন—

"এত দুঃখ সহই না পারি। মুরছি পড়ল তনু চারি॥

অতঃপব পাঠ আছে—ইহা রসিকদাসও গাহিয়াছিলেন—

ঐছন যত ব্রজনারী। রোয়ত কুন্তল ফারি॥
পুরুষোত্তম অনুবোধে। ভগবতী•দেই পরবোধে॥

ইহার পরবর্ত্তী পদে পুরুষোত্তম দাস সুবল ও মধুমঙ্গলের কথা বলিয়াছেন। একেতো তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিবহে উন্মাদ, ইহার উপর আবার শ্রীরাধার এই দশমী দশা। শ্রীরাধার অবস্থার কথা শুনিয়া সুবল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মধুমঙ্গল তাঁহার কর্ণকুহরে উচ্চৈঃস্বরে রাধা নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সুবলের চেতনা হইল। দুইজন দুইজনের কণ্ঠ ধরিয়া কত কাঁদিলেন। অতঃপর দুইজনেই শ্রীরাধার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমগ্র গোকুলেব দুর্দ্দশা অসহনীয় হইয়া উঠিল।

হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম বিরহ দহনে দহি যাহ॥
তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল তেজল কুসুম বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণি পর স্থল জল, কমল হুতাশ॥
শুক পিকু পাখি শাখি পর রোয়ই রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকি সহ অহি রহি রহি রোয়ই লোরহি পঙ্কিল ধরণী॥
রাইক বিরহে বিরহি ব্রজমণ্ডল দাবদহন সমতুল।
ইহ পুরুষোত্তম কৈছনে জীয়ব টুটল প্রেমক মূল॥

রসিকদাস ইহার পর মধুসূদন দাসের একটি এবং রাধামোহন ঠাকুরের একটি পদ গাহিয়া পালা শেষ করিয়াছিলেন।

রাধামোহন ঠাকুরের—

মথুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরি মীলল নিরজন কুঞ্জে। '
দ্রুম পশু পাখিকুল বিরহে বেয়াকুল পাওল আনন্দপুঞ্জে॥

এই পদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালার একজন ইংরাজী শিক্ষিত মানুষ পদাবলীকে শাস্ত্রীয় মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অভয়ের কথা ও ঠাকুরাণীর কথার লেখক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরারাপ্রেমের উৎকর্ষ খ্যাপনে এই সাধক শাস্ত্রীয় প্রমাণের সঙ্গে—"রাইক দশমী দশা নিজ সখি মুখে" এবং "যেখানে শুতিয়া ধনি রাই" পুরুষোত্তমের এই পদ দুইটির মর্ম্মার্থ প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। একালেও দ্রষ্টার অভাব ঘটে নাই।

১১। সম্ভোগ

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যুনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥

দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্য হেতু নায়ক-নায়িকার যে ভাবোল্লাস তাহারই নাম সম্ভোগ। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে ঐ সম্ভোগ দুই প্রকার।

জাগ্রতাবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকার। পূর্ব্বরাগের পর মিলনে সংক্ষিপ্ত, মানের পর মিলনে সংকীর্ণ, কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের পর মিলনে সম্পন্ন, ও সুদূর প্রবাসের পর মিলনে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ নিষ্পন্ন হয়।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। যুবক-যুবতীর ভয়, লজ্জা ও অসহিষ্ণুতাদি হেতু ভোগের উপচার সংক্ষেপে গ্রহণ।

অভিনব গোরি বসতি পতি-গেহ।
ঘর সঞে করযয়ে নওল সুনেহ॥
কি কহব রে সখি কহই না জান।
পহিল সমাগমরাধা-কান॥
যব দুঁহু নয়ন নয়নে ভেল ভেট।
সচকিত নয়নে বয়ন করু হেট॥
সৌপলু যবহি করহি কর আপি।
সাধসে ধয়ল দুঁহুক তনু কাঁপি॥
যব দুঁহু পায়ল মদন শয়ান।
না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচ বাণ॥
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ সে সেয়ানী।
হরি করে সৌপলি হরিণি-নয়ানী॥

সংকীর্ণ সম্ভোগ। নায়ক কর্ত্তৃক বিপক্ষগুণ কীর্ত্তন শ্রবণে ও স্ব-বঞ্চনাদি স্মরণে নায়িকা আলিঙ্গন চুম্বনাদিতে সম্পূর্ণ সম্মিলিতা না হইলে সম্ভোগ সংকীর্ণ হয়।

রাই যব হেরল হরিমুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর॥
যবহুঁ কহল পঁহু লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধ্বনি অনবত মাথ॥
যব হরি ধয়লহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ॥
যব পহু পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পুরল সব অঙ্গ॥
পুরল মনোরথ মদন উদেশ।
রায় শেখর কহ পিরিতি-বিশেষ॥

সম্পন্ন সম্ভোগ। অদূর প্রবাসপ্রত্যাগত কান্তের মিলনে সম্পন্ন সম্ভোগ নির্ব্বাহিত হয়। এই মিলন আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দুইরূপ—লৌকিক ব্যবহারে আগমন আগতি এবং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা প্রিয়তমাগণের সম্মুখে অকস্মাৎ আগমন—প্রাদুর্ভাব।

আগতি।

মা মন্দাক্ষং কুরু গুরুজনাদ্দেহলীং গেহমধ্যা-
দেহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হন্ত বিশ্লেষতোঽসি
এষ স্মেরো মিলতি মৃদুলে বল্লবী চিত্তহারী
হারী গুঞ্জা বলিভিরলিভির্লীঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ॥

—উদ্ধব-সন্দেশ

গুরুজনের ভয়ে লজ্জা করিও না। সমস্ত দিন কান্তকে না দেখিয়া ক্লান্তা হইয়া রহিয়াছ। সখি, গৃহমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেহলীপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াও। ঐ দেখ, অলিপুঞ্জগুঞ্জিত গুঞ্জমালা গলে বল্লবী চিত্তহারি মুকুন্দ হাস্য-বদনে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

প্রাদুর্ভাব।

"তাসামাবিরভূৎ শৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর ধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, দশম॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন! (গোপীগণের আর্ত্তিতে অভিভূত হইয়া) পীতাম্বরধারী মাল্যাঙ্কত সস্মিতবদন সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন মথনকারী শৌরী তথায় আবির্ভূত হইলেন।

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। পরাধীনতা-প্রযুক্ত নায়ক-নায়িকার বিয়োগ ঘটিয়াছে, পরস্পরের দর্শনও দুর্লভ হইয়াছে, এই অবস্থার অবসান ঘটিলে, উভয়ের মিলনে যে উপভোগাতিরেক, তাহাকেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বলে। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের চরম অবস্থা বিপরীত রতি। এই চারিপ্রকার সম্ভোগ আবার প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ ভেদে দুইপ্রকার হয়।

গৌণ-সম্ভোগ। স্বপ্নসম্ভোগ, সামান্য ও বিশেষ ভেদে দুইরূপ। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থার পরপারে অবস্থিতা প্রেমময়ী গোপীগণের স্বপ্ন সম্ভব হয় না। তথাপি হরিভাবের বিলাস, অতি মনোহর আশ্চর্য্য স্বপ্নের উদয়ে অতিশায়িত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমের হেতু হইয়া থাকে। বিশেষ গৌণসম্ভোগ,—জাগ্রতস্বপ্ন,—জাগরায়মানস্বপ্ন, স্বপ্নায়মান জাগরণ, ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত। এই ভাবোৎকণ্ঠাময় স্বপ্নেরও সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান—চারিপ্রকার ভেদ আছে। এই সংক্ষিপ্তাদিরও কতকগুলি বিশেষ অবস্থা আছে। যাহার দ্বারা সম্ভোগরতির সুস্পষ্ট অনুভূতি হয়।

সম্ভোগের বিবিধ উদাহরণ—

সংক্ষিপ্ত।

দর্শন—পরস্পরের সাক্ষাৎ। জল্প—বাদানুবাদ। স্পর্শন—পথে যাইতে যাইতে অঙ্গ বা বসন স্পর্শ। বস্ত্রাকর্ষণ—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিকুঞ্জ লীলায় শ্রীরাধার বস্ত্র আকর্ষণ অথবা গ্রহণ। বর্ত্মরোধন—নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকার পথরোধ।

সঙ্কীর্ণ।

রাস॥ কৃষ্ণ জিনি নবঘন তড়িৎ যেন গোপীগণ তড়িতের মাঝে জলধর।
তড়িৎ মেঘের মাঝে সমসখ্য হয়া সাজে রাসলীলা অতি মনোহর॥
—উজ্জ্বলচন্দ্রিকা।

বৃন্দাবন ক্রীড়া॥

স্থলপদ্ম বিকশিত তাথে ভ্রমরের গীত স্তুতি করে তোমার চরণে।
কুন্দফুল রাশি রাশি তোমার চরণে আসি দণ্ডবৎ করয়ে দশনে॥

তোমার অধর দেখি বিম্বফল হল দুখী চেয়ে দেখ রম্য বৃন্দাবনে।
রাধিকারে সঙ্গে লয়া হরি বেড়ায় দেখাইয়া বিহরয়ে বড় সুখী মনে ॥

—উ, চ, ।

যমুনা জলকেলি—শ্রীরাধা এবং সখীগণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের যমুনায় স্নানাদি ছলে বিহার।

নৌকাবিহার—

এই ত যমুনা বহে উৎকট তরঙ্গ তাহে ভাল নৌকা তাহা মোরা জানি।
চড়িবার ভয় করি আমরা যুবতী নারী খেয়ারী চঞ্চল শিরোমণি ॥

—উ, চ, ।

লীলাচৌর্য্য।—লীলা চুরি কহি যেই বংশীর হরণ।
বস্ত্র পুষ্প আদি চুরি করয়ে কখন ॥

—উ, চ, ।

ঘট্টলীলা। দানঘাটে ঘাটোয়ালরূপে এবং খেয়া ঘাটে নাবিকরূপে গোপীগণের ও শ্রীরাধার নিকট শুল্ক গ্রহণ ছলে দ্বন্দ্ব ও মিলন।

কুঞ্জাদি লীনতা। কুঞ্জে শ্রীরাধা অথবা শ্রীকৃষ্ণ লুকাইয়া আছেন, একজন আর একজনকে অন্বেষণ করিতেছেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণ লুকাইয়া আছেন, শ্রীরাধা ছল করিয়া কোন সখীকে তথায় পাঠাইয়া দিতেছেন। ইত্যাদি।

মধুপান—কৃষ্ণের বদন-চন্দ্র মধুপাত্রে প্রতিবিম্ব দেখে রাধা সুস্থিরনয়নে।
যাচয়ে নাগর রায় তবু মধু নাহি খায় চেয়ে রৈল প্রতিবিম্ব পানে ॥

—উ, চ, ।

বধুবেশ-ধারণ—মান ভাঙ্গাইবার জন্য নাপিতানী, বিদেশিনী প্রভৃতি বেশ ধারণ।

সম্পন্ন।

কপটনিদ্রা—শ্রীরাধা অথবা শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া আছেন, এই অবস্থায় পরস্পরের মিলন-কৌতুক।

প্রহেলিকা—শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরকে অথবা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রহেলিকা (হেঁয়ালী) জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

পাশক-ক্রীড়া—শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাশা খেলিতেছেন, শ্রীরাধা জিতিলে শ্রীকৃষ্ণের

বংশী গ্রহণ করিবেন, আর শ্রীকৃষ্ণ জিতিলে শ্রীরাধাকে চুম্বন বা তাঁহার কঞ্চুলী গ্রহণ করিবেন। পরস্পর এইরূপ পণ রক্ষা করিয়াছেন।

আলিঙ্গন—নায়ক কর্তৃক নায়িকা অথবা নায়ক-নায়িকা পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন।

নখরেখা—শ্রীরাধার প্রতি শ্যামলা—

গতিতে কুঞ্জর যিনি তার কুম্ভ হরি আনি রাখিয়াছ আপন হৃদয়ে।
শ্রীনাগদমন কৃত নখাঙ্কুশচিহ্ন যত প্রকাশিত হইয়া আছয়ে॥

—উ, চ,।

অধরসুরা-পান। —পরস্পরকে চুম্বন।

সম্প্রয়োগ—

রাধিকার স্কন্ধ বেড়ি হস্ত প্রসারিলা হরি অধরের সুরা করে পান।
রাধার হয় ভাবোদ্‌গম দোঁহে অতি মনোরম ক্রীড়াগণের করয়ে নির্ম্মাণ॥

নির্জ্জনে শ্রীসম্ভোগ দুই প্রকার—সম্প্রয়োগ ও লীলাবিলাস। রসিক এবং ভাবুকগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস আস্বাদনেই কৃতার্থতা লাভ করেন।

১২। পদাবলীর নায়ক

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥

গোপীগণ মনে বনে এক করিয়া জানিতেন। তাই সর্ব্বদাই তাঁহাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ কবিতেন। দেখিতেন—মস্তকে ময়ুরপুচ্ছশোভিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধানে স্বর্ণবর্ণ পীতবসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণপূর্ব্বক ব্রজবালকগণ কত্তৃক গীত-কীর্ত্তি নটবরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অধরসুধায় মুরলীরন্ধ্র ধ্বনিত করিয়া স্বীয় পদচিহ্নপরিশোভিত বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

পদাবলীর নায়ক ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অসমোর্দ্ধ তাঁহার রূপ গুণ; অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁহার সমান বা অধিক রূপবান্ বা গুণবান্ কেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ সুরম্য, মধুর, সমস্ত সৎ-লক্ষণাক্রান্ত, বলিষ্ঠ, নবযৌবনান্বিত, বক্তা, প্রিয়ভাষী, বুদ্ধিমান্, সুপণ্ডিত, প্রতিভান্বিত, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর, সুধী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গম্ভীর, বলীয়ান্, কীর্ত্তিমান্, রমণীজনমনোহারী, নিত্যনূতন, অতুল্যকেলি-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত এবং বংশী-বাদনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অসংখ্য গুণাবলী বর্ণনাতীত।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, গান, সম্বন্ধী ও তটস্থ বিষয় হইতেই নায়িকাগণের প্রেম উদ্দীপ্ত হয়। তেমনই নায়িকারও নামগুণাদিতে নায়কের প্রেমের আবির্ভাব ঘটে।

গুণ—মানসিক, বাচিক ও কায়িক ভেদে তিন প্রকার। করুণা, ক্ষমা, কৃতজ্ঞতাদি মানসিক গুণ। বচন-শ্রবণে যদি আনন্দ উদিত হয়, তাহা বাচিক গুণ। কায়িক গুণ সাতপ্রকার। বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য ও মৃদুতা। এই সমস্ত গুণ নায়িকারও আছে।

বয়স—বয়ঃসন্ধি, নব্য বয়স, ব্যক্ত বয়স ও পূর্ণ বয়স। পৌগণ্ড ও কৈশোরের সন্ধির নাম বয়ঃসন্ধি। প্রথম কৈশোর নব্য বয়স, মধ্য কৈশোর ব্যক্ত বয়স এবং শেষ কৈশোব পূর্ণ বয়স। শ্রীকৃষ্ণ চিরকিশোর।

রূপ—কোন ভূষণাদি না থাকিলেও যে গুণে অঙ্গসকল অলঙ্কৃত মনে হয়, তাহাই রূপ।

লাবণ্য—মুক্তা কলাপের অভ্যন্তর হইতে যেমন জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি দেহের যে অন্তর্নিহিত ঔজ্জ্বল্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আভাময় হইয়া উঠে, তাহারই নাম লাবণ্য।

সৌন্দর্য্য– অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সন্নিবেশ এবং সন্ধিসকলের সুষ্ঠু পেশলত্ব সৌন্দর্য্য।

অভিরূপতা—যে বস্তু নিজগুণের উৎকর্ষে সমীপস্থ অন্যবস্তুকে সারূপ্য দান করে, তাহারই নাম অভিরূপতা।

মাধুর্য্য—দেহের অনির্ব্বচনীয় রূপ-মাধুর্য্য।

মার্দ্দব—কোমল বস্তুর সংস্পর্শ অসহিষ্ণুতাব নাম মৃদুতা। ইহা উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ।

নাম—শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য নাম। তন্মধ্যে কয়েকটি নাম গোপীগণের অত্যন্ত প্রিয়।

চরিত্র—চরিত্র দুইপ্রকার—লীলা ও অনুভাব। মহারাস, কন্দুক-ক্রীড়াদি শ্রীকৃষ্ণের চারু ক্রীড়া, নৃত্য, বংশীবাদন; গো-দাহন, পর্ব্বতধারণ, দূর হইতে নিজ শব্দে ধেনুবৎসগণকে আহ্বান, সুদূর গমন ইত্যাদি লীলা।

অনুভাব—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক ভেদে ত্রিবিধ। রসের ভাবই শক্তি। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে স্থায়ী ভাব দ্বারা রস নিষ্পত্তি হয়। স্থায়ী ভাবের রসরূপত্ব লাভের শক্তি আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার চরিত্রের দুইটি দিক্, একটি অনুভাব, অপরটি লীলা। বিভাবের অপর অর্থ কারণ, অনুভাব কার্য্য। অনুভাব—অনুভাবের কার্য্য, আস্বাদনের বহিঃপ্রকাশ। লীলারও অপর অর্থ তত্ত্ব বা ভাব। তত্ত্বের সাকার বহিঃপ্রকাশই লীলা। এই সমস্ত ইঙ্গিত হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রসভাবময় বিগ্রহের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। (নায়িকা-প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে।)

ভূষণ—বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য ও বিলেপনাদি।

সম্বন্ধী—লগ্ন ও সন্নিহিত, এই দুই প্রকার।

লগ্ন—আট প্রকার। বংশীরব, শৃঙ্গরব, গান, সৌরভ, ভূষণধ্বনি, পদচিহ্ন, বীণাধ্বনি ও শিল্প-কৌশলাদি।

সন্নিহিত—নির্ম্মাল্যাদি, ময়ূরপুচ্ছ, গিরি-সৌন্দর্য্য, ধেনুবৎস, বেণুবেত্র, শৃঙ্গ, গোক্ষুরধূলি, চারুদর্শন, গোবর্দ্ধন, রাসস্থলী, যমুনা, বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনস্থ তরুলতা পক্ষী মৃগাদি।

তটস্থ—জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, মলয়-পবন, বসন্ত, শরৎ প্রভৃতি।

নায়ক চতুর্ব্বিধ—ধীর-ললিত, ধীর-শান্ত, ধীরোদ্ধত, এবং ধীরোদাত্ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রধানতঃ ধীরললিত হইলেও তিনি সর্ব্বনায়কশিরোমণি। তাঁহাতে চতুর্ব্বিধ নায়কের সমস্ত গুণই বর্ত্তমান আছে। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত নায়ক। "নী" ধাতু প্রাপণে। আপনাকে প্রাপ্তি করাইবার জন্যই তাঁহার নায়কত্ব। আপনাকে বিলাইবার জন্যই তিনি সদা ব্যগ্র।

ধীর-ললিত—বিদগ্ধ, নব যুবা, পরিহাস-বিশারদ ও বঞ্চনাহীন। ইনি প্রায় প্রেয়সী-বশীভূত। কন্দর্প ইহার সাধারণ উদাহরণ। অপ্রাকৃত নবীন মদন—সাক্ষান্মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধীর ললিত নায়ক।

ধীর-শান্ত—শান্ত, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক এবং বিনয়ী। যেমন যুধিষ্ঠির।

ধীরোদ্ধত—অন্য শুভদ্বেষী, মায়াবী, অহঙ্কৃত, কোপন, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘাপরায়ণ। উদাহরণ ভীমসেন।

ধীরোদাত্ত—গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, সুদৃঢ়ব্রত, শ্লাঘারহিত, গূঢ়গর্ব্ব এবং বলশালী। শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদাত্ত নায়কেরও উদাহরণ।

এই চারিপ্রকার নায়ক আবার পতি এবং উপপতি-ভেদে দ্বিবিধ। ব্রজের বহু গোপকুমারী কার্ত্তিক মাসে হবিষ্য গ্রহণপূর্ব্বক কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন। ইহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। যিনি শাস্ত্রানুসারে কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তিনিই পতি। মাধব-মহোৎসব গ্রন্থে বর্ণিত আছে—রুক্মিণীর পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজকুমারীগণের বিবাহ হইয়াছিল।

আসক্তিবশতঃ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অর্থাৎ বিবাহ না করিয়াই যিনি কোন কুমারী বা অপরের বিবাহিতা রমণীতে অনুরাগী হন এবং এই রমণীর প্রেমই যাঁহার সর্ব্বস্বরূপে পরিগণিত হয়, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই উপপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আচার্য্য ভরত বলিয়াছেন—যে বতি-নিমিত্ত লোকত ধর্ম্মত বহু নিবারণ, যাহাতে স্ত্রী পুরুষের প্রচ্ছন্ন কামুকতা, যে রতি পবস্পরের দুর্লভতাময়ী, তাহাকেই মন্মথ-সম্বন্ধীয় পরমারতি বলা যায়।

ঔপপত্য সমাজ সংসারের সর্ব্বনাশের হেতু, সুতরাং সর্ব্বত্রই নিন্দনীয়। এইজন্য প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার পক্ষে ইহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। কিন্তু অধোক্ষজ, আপ্তকাম, হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব বিধি-নিষেধের অতীত। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার জন্যই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ, সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। জগতের সমস্ত জলধারা যেমন ঋজু কুটিল নানা পথ পর্য্যটন করিয়া সাগরে গিয়া মিলিত হয়, তেমনই একমাত্র শ্রীভগবানের মাধুর্য্য এবং করুণা-পারাবারেই মানবের সর্ব্বভাব প্রবাহের পর্য্যবসান ঘটে। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-যজ্ঞে যথাসর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া গোপীগণ ইহ-পর জগতে ত্যাগের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আজিও তাহাই সর্ব্বলোকের বরণীয়, গ্রহণীয় ও স্মরণীয় হইয়া আছে। এইজন্যই পরমহংস পদবীরূঢ় আত্মারাম মুনিগণ,—এমন কি উদ্ধবাদি কৃষ্ণভক্তগণও গোপীপ্রেমের কামনা করিয়া থাকেন।

পতি ও উপপতির বৃত্তিভেদে নায়কের অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চারি-প্রকাব ভেদ হয়। যে নায়ক অন্য ললনাস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক রমণীতেই অতিশয় আসক্ত থাকেন, তাঁহাকেই **অনুকূল** বলে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাতেই অনুকূলতা সুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি অগ্রে এক রমণীতে আসক্ত হইয়া পরে কদাচিৎ অন্য রমণীতে অনুরাগী হয়, অথচ পূর্ব্বপ্রণয়িনীর গৌরব, ভয় ও দাক্ষিণ্যাদি পরিত্যাগ করে না, তাহাকে **দক্ষিণ** বলা যায়। অনেক নায়িকাতে যাহার তুল্যভাব, তিনিও দক্ষিণ নামে অভিহিত হন। সম্মুখে প্রিয়ভাষী, পরোক্ষে অপ্রিয় আচরণকারী এবং গুরুতর অপরাধে অপরাধী নায়ককে পণ্ডিতগণ **শঠ** বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্যা নায়িকার ভোগচিহ্ন সকল অভিব্যক্ত হইলেও যে ব্যক্তি নির্ভয় এবং মিথ্যা বচন-দক্ষ, তিনিই **ধৃষ্ট**।

ধীর ললিতাদিভেদে নায়ক চতুর্ব্বিধ। ইহারা প্রত্যেকে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম ভেদে দ্বাদশ প্রকাশ। ঐ দ্বাদশ নায়কের পতি ও উপপতি-ভেদে চব্বিশ সংখ্যা হয়। পুনশ্চ অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে উক্ত চব্বিশ প্রকার নায়কের সংখ্যা

হয় ছিয়ানব্বই। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী মহামুনি ভরতের অনুসরণে নায়ক-প্রকরণে ধূর্ত্তাদি ভেদ উপেক্ষা করিয়াছেন।

নায়ক-সহায়—চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ ও প্রিয়নর্ম্মসখ—এই পঞ্চ শ্রেণী নায়কের সহায় বলিয়া পরিচিত। ইহারা পরিহাস কথনে নিপুণ, সর্ব্বদা গাঢ় অনুরাগী, দেশকালে অভিজ্ঞ, গোপীগণ রুষ্ট হইলে তাঁহাদের প্রসন্নতা-সাধনে পটু, এবং নিগূঢ় মন্ত্রণাদাতা।

চেট—সন্ধান-বিষয়ে চতুর গূঢ়কর্ম্মা, প্রগল্‌ভ-বুদ্ধি। গোকুলে ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার প্রভৃতি।

বিট—বেশরচনাপটু, শুশ্রূষানিপুণ, ধূর্ত্ত। স্ত্রীবশীকরণে মন্ত্রৌষধি-বিশেষজ্ঞ। পরিবারবর্গ ইহাদের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না। কড়ার ভারতীবন্ধ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিট ছিলেন।

বিদূষক—ভোজন-লোলুপ, কলহপ্রিয়, দেহ, বেশ ও বাক্যের বিকৃতিতে হাস্যোদ্রেককারী। কৃষ্ণের বিদূষকগণের মধ্যে মধুমঙ্গল প্রসিদ্ধ। বসন্তাদি গোপগণও বিদূষক।

পীঠমর্দ্দ—নায়কতুল্য গুণবান এবং নায়কের অনুবৃত্তিকারী। সখাগণের মধ্যে শ্রীদাম পীঠমর্দ্দরূপে পরিচিত।

প্রিয়নর্ম্মসখা—অতিশয় রহস্যজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত এবং প্রণয়ীগণের অত্যন্ত প্রিয়। গোকুলে সুবল, দ্বারকায় উদ্ধব, ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জ্জুন প্রভৃতি।

চেটকের কিঙ্করত্ব ও পীঠমর্দ্দের বীররসে সাহায্যপ্রসিদ্ধ॥

দূতী

দূতী দুই প্রকার। স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদূতী কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি। বীরা, বৃন্দা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী। বীরার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্থাৎ নিত্য নূতন প্রস্তাব রচনায় শক্তি এবং বৃন্দার মনোজ্ঞ চাটু বচন রচনে পটুতার প্রসিদ্ধি সর্ব্বজনবিদিত। এতদ্ভিন্ন শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (তাপসী) প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সাধারণী দূতী আছেন। (নায়িকা-প্রকরণে দূতী বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

১৩। পদাবলীর নায়িকা

কৃষ্ণবল্লভা

প্রণমামি তাঃ পরমমাধুরীভৃতাঃ
কৃতপুণ্যপুঞ্জরমণীশিরোমণীঃ।
উপসন্নযৌবনগুরোরধীত্য যাঃ
স্মরকেলি-কৌশলমুদাহরন্ হরৌ॥

যাহারা যৌবনগুরুসমীপে স্মরকেলি-কৌশল অধ্যয়নপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদাহরণ করেন, সেই ভূরি-পুণ্যকারিণী রমণীকুলের শিরোমণি পরম মাধুর্য্যসম্পন্না কৃষ্ণবল্লভাগণের চরণে প্রণাম করি। রূপে গুণে যাঁহারা কৃষ্ণতুল্যা, যাঁহারা অপরিসীম প্রেম ও মাধুর্য্য-সম্পদে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে দেব মানবের অগ্রবর্ত্তিনী, তাঁহারাই কৃষ্ণবল্লভা। ইহাদের দুই শ্রেণী—স্বকীয়া এবং পরকীয়া।

স্বকীয়া—পাণিগ্রহণ-বিধি অনুসারে গৃহীতা, পতি আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, পাতিব্রত্য ধর্ম্মে সুস্থিতা রমণীগণ স্বকীয়া। দ্বারকাপুরীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া মহিষী ষোল হাজার একশত আট। সখীগণ মহিষী তুল্যা গুণশালিনী, দাসীগণ তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূনা। মহিষীগণ মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী এই আটজন প্রধানা। ইহাদের মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামা সৌভাগ্যে বরণীয়া। ব্রজধামে কাত্যায়নী-ব্রতপরা গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহারাও স্বকীয়া। কিন্তু প্রকাশ্যে বিবাহ হয় নাই বলিয়া তাঁহারা পরকীয়ার ন্যায় আচরণ করিতেন।

পরকীয়া—যে রমণীগণ ইহ-পরলোক-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া অত্যাসক্তি বশতঃ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, যাহারা বিবাহবিধি অনুসারেস্বীকৃতা নহে, তাহারাই পরকীয়া। আলঙ্কারিকগণ পরকীয়া নায়িকার নিন্দা করিয়াছেন। প্রাকৃত নায়িকাগণই এই নিন্দার উপলক্ষ্য। অপ্রাকৃত প্রেমময়ী গোপীগণ তাঁহাদের লক্ষ্যণীয়া নহেন। কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥'

আমাদের আচার্য্যগণ অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় স্বকীয়া এবং প্রকট লীলায়—পরকীয়া ভাব স্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ প্রকট অপ্রকট—উভয় লীলাতেই পরকীয়াভাব মান্য করিয়া থাকেন। আমরা অপ্রকটে—স্বকীয়া এবং প্রকট লীলায় পরকীয়া—এই মতের অনুসরণ করিয়াছি। আমাদের পক্ষে পরকীয়া ভাবের অপর একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। পরব্যবসিনী রমণী যেমন গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তরে সর্ব্বদা উপপতির কথাই চিন্তা করে, তেমনই আমরা যদি এই বিশ্বে বাস করিয়া, সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও সর্ব্বদা বিশ্বনাথকে স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই তো আমাদের কূল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থা হন।

কন্যা এবং পরোঢ়া-ভেদে পরকীয়া দুই প্রকার। ব্রজেশ্বরের ব্রজবাসিনী যে সকল গোপী, প্রায়ই তাঁহারা পরকীয়া এবং তাঁহারাই গোকুলেন্দ্রের সৌখ্যদাত্রী।

কন্যকা—যাঁহাদের পাণিগ্রহণ হয় নাই, সেই লজ্জাশীলা, পিতৃ-গৃহস্থিতা, সখীগণের সঙ্গে নর্ম্মক্রীড়ায় সমুৎসুকা গোপীগণই কন্যা। ইহারা প্রায়ই "মুগ্ধা" গুণান্বিতা। ইহাদের মধ্যে ধন্যা প্রভৃতি কতিপয় ব্রজকুমারী শ্রীকৃষ্ণকে পতিলাভ-কামনায় কাত্যায়নী অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের কামনাও পূর্ণ হইয়াছিল। এই কারণে ইহারাও কৃষ্ণবল্লভা।

পরোঢ়া—গোপগণের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়াও যাঁহারা শ্রীহরির প্রতি সম্ভোগ-লালসা পোষণ করিতেন, তাঁহারাই পরোঢ়া। এই হরিবল্লভাগণের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। ইহারা শোভা, সদ্‌ গুণ ও বৈভবে, প্রেমমাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যাতিশয্যে লক্ষ্মী দেবী অপেক্ষাও সৌভাগ্যশালিনী। পরোঢ়ার তিন শ্রেণী—সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া। সাধনপরা দুই প্রকার—যৌথিকী ও অযৌথিকী। যৌথিকীগণ মুনি ও উপনিষদ্‌ অর্থাৎ ঋষিচরী ও শ্রুতিচরী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্তা। আপন গণসহ সাধনপরায়ণা যাঁহারা, তাঁহারাই যৌথিকী। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের শ্রীরামের সৌন্দর্য্য দর্শনে—কৃষ্ণ-বিষয়িণী এবং শ্রীসীতা দেবীর সৌন্দর্য্য দর্শনে গোপী-বিষয়িণী রতি উদ্‌বুদ্ধ হয়। বহু সাধনায় ইহারা ব্রজে গোপীদেহ প্রাপ্ত হন।

যে সমস্ত উপনিষদ্‌ সর্ব্বতোভাবে সূক্ষ্মদর্শিনী, তাঁহারা গোপীগণের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য সন্দর্শনে বিস্মিতা হইয়া গোপীতুল্য ভাগ্য লাভার্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যারম্ভ

হন, এবং নন্দব্রজে প্রেমবতী বল্লবীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারাই ব্রহ্মকে রসরূপে, মধুরূপে, আনন্দরূপে, ভূমারূপে আস্বাদন করিয়াছেন।

জন্মজন্মান্তরের ভাগ্যফলে গোপীভাবে লালসা জন্মিলে ভগবৎকৃপায় কোন ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গলাভ ঘটে। তখন তাঁহাদের রাগানুগামার্গে ভজনে উৎকণ্ঠা জন্মে। পরিণাম তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারিণী হইয়া এক, দুই অথবা তিন তিন করিয়া ব্রজে গোপীদেহ লাভ করেন। ইঁহারাই অযৌথিকী। প্রাচীন কালেও ইঁহারা ছিলেন, বর্ত্তমানেও এরূপ সাধকের অসদ্ভাব ঘটে নাই। তাই প্রাচীন ও নবীনা ভেদে অযৌথিকীর দুই শ্রেণী। প্রাচীন অযৌথিকীগণ সুদীর্ঘ কালে নিত্য প্রিয়াগণের সালোক্য প্রাপ্ত হন। আর নবীনাগণ মানব ও দেবাদি দেহ পরিভ্রমণানন্তর ব্রজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকার্য্য-সাধনার্থ অংশরূপে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার সন্তোষার্থ নিত্যপ্রিয়াগণও অংশে অবতীর্ণা হন। কৃষ্ণাবতারে নিত্যপ্রিয়াগণের অংশস্বরূপা যাঁহারা বৃন্দাবনে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই নিত্য প্রিয়াগণের প্রাণতুল্যা সখী। ইঁহারাই দেবী।

নায়িকা স্বকীয়া, পরকীয়া ও কন্যা। কন্যার মুগ্ধা ভিন্ন অন্য কোন ভেদ নাই। স্বকীয়ার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা এই তিন ভেদ। ইহাদের মধ্যে মধ্যা ও প্রগল্‌ভার আবার ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা—এইরূপ ভেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধীরা মধ্যা, অধীরা মধ্যা ও ধীরাধীরা মধ্যা ইত্যাদি। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে ইহার সংখ্যা হয় দ্বাদশ। এই দ্বাদশ ও মুগ্ধাকে লইয়া ত্রয়োদশ হইল। অলঙ্কারকৌস্তভে স্বকীয়ারও অভিসারিকাদি অষ্টবস্থা গণনা করা হইয়াছে। আমরা স্বকীয়া নায়িকার অভিসারাদি অবস্থা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

পরকীয়া নায়িকারও মুগ্ধা, মধ্যা, ও প্রগল্‌ভাদি এবং ধীরাদি ত্রয়োদশ ভেদ আছে। এই ত্রয়োদশ প্রকার নায়িকা আবার অভিসারিকাদি অষ্টাবস্থায় একশত চারি সংখ্যক হয়। ইহাদের আবার অত্যুত্তম, উত্তম এবং মধ্যম এই তিন শ্রেণী। তাহাতেও আবার সিদ্ধা, সুসিদ্ধা এবং নিত্যসিদ্ধা—এই তিন শ্রেণী আছে। অলঙ্কার-কৌস্তভের মতে মুনিরূপা ও সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সিদ্ধা, শ্রুতিরূপা ও দেবীরূপা গোপীগণ সুসিদ্ধা এবং শ্রীরাধাদি নিত্যসিদ্ধা।

মুগ্ধা—নূতন বয়স, অল্পমাত্র কাম, রতিবিষয়ে বামা, সখীগণের অধীনা, রতি-চেষ্টায় অতিশয় লজ্জা, অথচ গোপনে প্রযত্নশীলা। প্রিয়তম অপরাধী হইলে

তাহার প্রতি বাষ্পরুদ্ধনয়না, প্রিয় এবং অপ্রিয় কথনে অশক্তা, মানে পরাঙ্‌মুখী। মুগ্ধার ধীরা অধীরাদি ভেদ নাই।

মধ্যা—যে নায়িকার লজ্জা ও মদন দুই সমান, যৌবনে নবীনা, যাহার বাক্যে ঈষৎ প্রগল্‌ভতা এবং সুরত বিষয়ে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ক্ষমতা, যিনি কোথাও বা মানে মৃদু, কোথাও বা কর্কশা, তিনিই মধ্যা।

প্রগল্‌ভা—যাঁহার পূর্ণ যৌবন, যিনি মদান্ধা, বিপরীত সম্ভোগে ঔৎসুক্য-শীলা, ভূরি ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, রসাক্রান্তবল্লভা (রসজ্ঞতায় বল্লভকে আকৃষ্ট-কারিণী), উক্তিতে এবং চেষ্টায় প্রৌঢ়া (নিপুণা) এবং মানে অত্যন্ত কর্কশা, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই প্রগল্‌ভা বলেন।

ধীরা—যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়তমকে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে।

অধীরা—যে নায়িকা রোষ প্রকাশ পুরঃসর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ কবে।

ধীরাধীরা—যে অপরাধী প্রিয়ের প্রতি অশ্রুপূর্ণনয়নে বক্রোক্তি প্রয়োগ করে। ধীবা মধ্যা, অধীরা মধ্যা এবং ধীবাধীরা মধ্যারও এই পরিচয়।

ধীরা প্রগল্‌ভা—ধীরা প্রগল্‌ভা দুই প্রকার। এক মানিনী অবস্থায় সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনী। দ্বিতীয়া—অবহিত্থা (ভাব-গোপনকারিণী এবং আদরান্বিতা)।

অধীরা প্রগল্‌ভা—যে ক্রোধবশতঃ কান্তকে নিষ্ঠুররূপে তাড়না কবে।

ধীরাধীরা .প্রগল্‌ভা—ধীবাধীরা মধ্যা নায়িকার যে পরিচয় ধীরাধীরা প্রগল্‌ভারও সেই একই পরিচয়।

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা-ভেদে মধ্যা ও প্রগল্‌ভার দুই প্রকার ভেদ হয়। নায়কের প্রণয়ের আধিক্য ও ন্যূনতার জন্যই এইরূপ জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভেদ হইয়া থাকে। এইজন্য আচার্য্যগণ নায়িকাগণের প্রৌঢ়প্রেম, মধ্য প্রেম ও মন্দ প্রেমের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলেন—কন্যা সর্ব্বদাই মুগ্ধা, তাহার অবস্থান্তর হয় না। কিন্তু স্বীয়া ও পরোঢ়া-ভেদে মুগ্ধার দুই দুই ভেদ হয়। আর মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভার স্বীয়া ও পরকীয়া ভেদে প্রভেদ হয় ছয় প্রকার। মধ্যা ও প্রগল্‌ভার ধীরাদি ভেদেও ছয় প্রকার পার্থক্য ঘটে। এইরূপ নায়িকার সংখ্যা পঞ্চদশ। অর্থাৎ মধ্যা ও প্রগল্‌ভার ধীরাদি ভেদে তিন তিন ছয়, স্বকীয়া পরকীয়া ভেদে

ছয় দ্বিগুণে বার, আর কন্যা মুগ্ধা, স্বীয়া মুগ্ধা ও পরকীয়া মুগ্ধা এই তিন লইয়া সংখ্যা হইল পনের। ইহার জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাদি ভেদ আছে। অভিসারিকাদি ভেদ আছে।

প্রেম—ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও সর্ব্বদা ধ্বংসরহিত যুবক-যুবতীর যে ভাববন্ধন, তাহাই প্রেম।

প্রৌঢ় প্রেম—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রৌঢ় প্রেম ভুবনবিখ্যাত।

শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন—

বারে বারে তুমি মান করিবারে আমারে কহিছ সখি।
কানুর মূরতি পটেতে লিখিয়া মোরে আনি দেহ দেখি॥
যাহারে দেখিয়া মনে সুখা হৈয়া ঢাকিয়া রহিব কান।
মুরলীর ধ্বনি তাথে নাহি শুনি তবে সে করিব মান॥

মধ্য প্রেম— (কৃষ্ণপক্ষে) অন্যা নায়িকার প্রেম অপেক্ষিত যাথে।
মধ্য প্রেম বলি তারে বলে শাস্ত্রমতে॥

অন্যা যুথেশ্বরী পক্ষে (কষ্টে বিরহ সহ্য করিবার যাহার সামর্থ্য আছে)—

এইত দীঘল দিন, কখন হইবে ক্ষীণ, সন্ধ্যাকাল হইবে কখন।
তাহাতে কৃষ্ণের মুখ, দেখিয়া পাইব সুখ, বনে হতে আসিবে যখন॥

মন্দ প্রেম— (কৃষ্ণপক্ষে) সদাই আত্যন্তিক হয় পরিচয় যাথে।
উপেক্ষা অপেক্ষা নাই মন্দ প্রেমাতে॥

অন্যা নায়িকা পক্ষে (যে প্রেমে কদাচিৎ বিস্মরণ ঘটে)—

এলে প্রতিপক্ষ নারী তার প্রতি ঈর্ষা করি পাশরিলাম মালার গ্রন্থন।
কি করিব সহচরী ঐ পারা এলো হরি হাম্বারব করে ধেনুগণ॥

এই নায়িকাগণের বয়ঃসন্ধি, ব্যক্ত বয়স, মধ্য বয়স ও পূর্ণ বয়সের বর্ণনা থাকিলেও ইহারা চিরকিশোরী।

দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যভাবে—আগে সম্বন্ধ, পরে তদনুরূপ সেবাধিকার লাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু মধুরা রতির অধিকারিণী নিত্যপ্রিয়াগণ অগ্রে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ-সেবাধিকার অর্জ্জনপূর্ব্বক পরে কৃষ্ণ সঙ্গে তদনুরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

নিত্যপ্রিয়া—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী **নিত্যপ্রিয়াগণের** মধ্যে

শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে কৃষ্ণতুল্যা। নিত্যপ্রিয়াগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা নিত্যপ্রেয়সীগণমধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী ভিন্না—বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা ও পালিকা প্রভৃতি প্রধানা। শ্রীরাধাই গান্ধর্ব্বী, চন্দ্রাবলীর অপর নাম সোমাভা, ললিতার অপর একটি নাম অনুরাধা। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রাধারই অপর নাম চন্দ্রাবলী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও রাধা চন্দ্রাবলী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। অপর দুই একটি লোকসাহিত্যে যিনি রাধা, তিনিই চন্দ্রাবলী। খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুঙ্কুমা প্রভৃতিও লোকপ্রসিদ্ধা নিত্যপ্রিয়াগণ মধ্যে পরিগণিতা। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ভিন্ন কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই যূথেশ্বরী। কিন্তু সৌভাগ্যাধিক্য প্রযুক্ত শ্রীরাধাদি অষ্ট যূথেশ্বরীই প্রধানা। ললিতাদি সখীগণ যূথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও, বিশাখা ও ললিতা শ্রীরাধার এবং শৈব্যা ও পদ্মা চন্দ্রাবলীর সখীত্ব ও সেবাই অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। যূথেশ্বরীর দ্বাদশ-ভেদ; অধিকা—যাহার সৌভাগ্য অধিক। সমা—যাহার সমান সৌভাগ্য। লঘু—সৌভাগ্যে যাহার লঘুতা আছে। ইহাদের প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী এই তিন ভেদ। একত্রে ছয় প্রকার।

যূথেশ্বরীর আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী এই দুই ভেদ। একত্রে দ্বাদশ হইয়াছে।

১৪। শ্রীরাধা

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধানা, রূপে গুণে যিনি ত্রিলোক মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা, সেই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীকৃষ্ণ-মোহিনীর নাম শ্রীরাধা। গোপালতাপনীতে, ঋক্-পরিশিষ্টে বিধি পুরাণে, তন্ত্রে ইঁহারই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বৃষভানুজা সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা, ষোড়শ শৃঙ্গার মণ্ডিতা এবং দ্বাদশ আভরণ-ভূষিতা।

সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা—অর্থাৎ তিনি তাঁহারই উপযুক্ত রূপ-সৌন্দর্য্যে উৎসবময়ী। মণিরত্নের অলঙ্কার তাঁহার অঙ্গ সঙ্গ-লাভে অলঙ্কৃত হয়।

ষোড়শ শৃঙ্গার—রাখালগণসহ ধেনুপাল লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন। সুসজ্জিতা শ্রীরাধাকে দেখাইয়া সুবল বলিলেন—

তুঙ্গ মণিমন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে
মেহ রুচি বসন পরিধানা।
যব যুবতীমণ্ডলী পন্থ মাঝ পেখলি
কোই নহি রাইক সমানা॥
অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপ গুণ সায়রা সৃজিল ইহ নায়রী
ধনি রে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥
দিবস অরু যামিনী রাই অনুরাগিণী
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি।
নিমেষে নব নৌতুনা সুবেশা মৃগলোচনা
অতএ তুঁহু উহারি অনুরাগী॥
রতন অট্টালিকা উপরে রহু রাধিকা
হেরি হরি অচল পদপাণি।
রসিকজন মানসে হরিগুণ সুধারসে
লাগি রহু শশিশেখর বাণী॥

অন্য একদিন উদ্যানস্থিতা শ্রীরাধাকে দেখাইয়া সুবল বলিলেন, সখে, সায়ংস্নাতা শ্রীরাধাকে দেখ। পরিধানে নীল বসন, কটিতটে রশনা, মস্তকে বদ্ধ বেণী, চিকুরে পুষ্পস্তবক, কর্ণে উত্তংশ, নাসাগ্রে মণি, কণ্ঠে মাল্যদাম, বদন-কমলে তাম্বূল, নয়নযুগলে কজ্জল, চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, গণ্ডে মকরীপত্রভঙ্গাদি, ললাটে তিলক, অঙ্গে চন্দন, করকমলে লীলাকমল এবং চরণে অলক্তক—এই মনোহর ষোড়শ আকল্পে সজ্জিতা হইয়া তিনি কেমন শোভা পাইতেছেন।

দ্বাদশ আভরণ—চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণময় কুণ্ডল, কর্ণোর্দ্ধে দুইটি স্বর্ণশলাকা, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, গলদেশে নক্ষত্র-নিন্দিহার, এবং স্বর্ণপদক, নিতম্বে কাঞ্চী, ভুজে অঙ্গদ, করে বলয়, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক, চরণে রত্নময় নূপুর এবং পদাঙ্গুলীতে উত্তুঙ্গ অঙ্গুরীয় (রতন চুট্‌কী)।

শ্রীরাধার প্রধান প্রধান গুণাবলী—

মথুরা, নববয়া (মধ্য কৈশোরস্থিতা), চপলাপাঙ্গী (চঞ্চল কটাক্ষশালিনী), উজ্জ্বলস্মিতা (প্রসন্নোজ্জ্বলা, ঈষৎ হাস্যময়ী), চারু সৌভাগ্য রেখাঢ্যা (হস্তপদে সৌভাগ্যদ্যোতক রেখাযুক্তা), গন্ধোন্মাদিতমাধবা (যাঁহার অঙ্গপরিমলে মাধব উন্মত্ত), সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা (যাঁহার গানে স্থাবর জঙ্গম মুগ্ধ), রম্যবাক্ (সুমধুর-ভাষিণী), নর্ম্মপণ্ডিতা (বচনে এবং আচরণে সুদক্ষা, রহস্যময়ী), বিনীতা, করুণাপূর্ণ, বিদগ্ধা (সুরসিকা), পাটবান্বিতা (চাতুর্য্যশালিনী, "ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি"—তঁহি পুন মতি হার টুটি ফেকল কহয়িত হার গেল, সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু শ্যাম দরশ ধনী কেল"), লজ্জাশীলা, মর্য্যাদাশালিনী।

মর্য্যাদা তিনপ্রকার—স্বাভাবিকী, শিষ্টাচারপরম্পরা এবং স্বকল্পিতা। স্বাভাবিকী—পৌর্ণমাসী বলিলেন, রাধা, বহুযত্নেও শ্রীকৃষ্ণ সহ তোমার মিলন ঘটাইতে পারিলাম না। তুমি জীবন-রক্ষার অন্য উপায় চিন্তা কর। শ্রীরাধা বলিলেন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি কৃষ্ণপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য জীবনোপায় কল্পনা করিব না। শিষ্টাচারপরম্পরা,—শ্রীরাধা কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলা, দর্শনে উৎকণ্ঠিতা, অথচ বৃন্দা অভিসারার্থ অনুরোধ করিলে শ্রীরাধা কহিলেন—সখি, আমাকে ব্রজেশ্বরী আহ্বান করিয়াছেন। গুরুজনের আজ্ঞায় অবজ্ঞা করিলে কদাচ মঙ্গল হয় না। অতএব এ সময় অভিসার কর্ত্তব্য নহে।

স্বকল্পিতা—দূতী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—

পূর্ণাশীঃ পূর্ণিমাসাবহিততয়া যা ত্বয়াগ্নৈঃ বিতীর্ণা
বষ্টি ত্বা:মব তথ্যন্নখিলমধুবিমোৎসেকনমস্যাং মুকুন্দঃ।

দিষ্ট্যা পর্ব্বোদ্গাত্তে স্বয়মভিসরণে চিত্তমাধৎস্ব বৎসে
যুক্ত্যাপ্যুক্তামমেয়েতি দ্যুমণি সখসুতা প্রাহিণোদেব চিত্রাম্।

—উজ্জ্বলনীলমণি, রাধা-প্রকরণ

॥ দূতীর উক্তি ॥

শুন শুন মাধব রাই নিড়য়ে হাম
কহলম তুয়া অভিলাষ।
কহলম অঘরিপু উদ্‌বেগে কুঞ্জহি
রহয়ি তুয়া প্রতি আশ॥
শ্রাবণ পূর্ণমিক রাতি।
বিকশিত নীপ- নিকর মধু মোদনে
শোভন বন রহু মাতি॥
আজু কানু সঞে মিলন সুমঙ্গল
সকল সিধি দায়ি তিথি।
তব কাহে চিত্রারে অভিসারে ভেজসি
হেন রাতি নাহি মিলে নিতি॥
তবহুঁ সুরঙ্গিণী চিত্রারে ভেজল
আপনে না করি অভিসার।
গোপাল দাস ভণে বুঝই না পারই
ভাবিনী ভাব অপার॥

—মৎকৃত অনুবাদ

অনন্ত গুণরাশিমধ্যে মর্য্যাদার এই কয়টি উদাহরণেই রাধাভাবের নিগূঢ় মর্ম্ম সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরাধা ধৈর্য্যশালিনী, গাম্ভীর্য্যশালিনী, সুবিলাসা (বিলাসকলাভিজ্ঞা), মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী, (মহাভাবের পরমোৎকর্ষ-প্রকাশিকা, মহাভাবের

পরমবিগ্রহস্বরূপিণী), গোকুল-প্রেমবসতি (গোকুলের স্থাবর-জঙ্গলের প্রেমপাত্রী), জগৎশ্রেণীর লসদ্‌যশা—(যাঁহার যশে নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত) গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা (সকল গুরুজনের নিরতিশয় স্নেহপাত্রী), সখীসকলের প্রণয়াধানা, কৃষ্ণপ্রিয়াগণের শীর্ষস্থানীয়া, সন্ততাশ্রব-কেশবা (কেশব যাঁহার সতত আজ্ঞাধীন)।

শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরাধার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ রূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যামপট্টশাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥

সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম্ সখী প্রণয় চন্দন ।
স্মিত কান্তি কর্পূরে অঙ্গ বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্য বিন্যাস ।
ধীরাধীরাত্মগুণ অঙ্গে পটবাস ॥
রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল ।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি ।
এইসব ভাব ভূষণ সব অঙ্গ ভরি ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত ।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গ পূরিত ॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল ।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
মধ্যবয়ঃস্থিতি সখি স্কন্ধে করন্যাস ।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক ।
তাথে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কানে ।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম মধুরস পান ।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥
যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ।
যাঁর ঠাঁই কলা বিলাস শিখে ব্রজবামা ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী ।
যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার ।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥

১। চিন্তামণি—যে মণি একই কালে সকল যাচকের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে। নিজে অবিকৃত থাকিয়াও অসংখ্য মণি প্রসব করে।

২। কায়ব্যূহ—একই সময়ে বহুকার্য্য সাধনের জন্য নিজেকে বহুসংখ্যায় প্রকাশ করা।

৩। উদ্বর্ত্তন—অঙ্গানুলেপন। স্নানের পূর্ব্বে ব্যবহার করিতে হয়।

৪। কারুণ্যামৃতধারা—সুকুমারীগণ প্রাতঃস্নান করেন। উষাস্নান নদী-প্রবাহে। শ্রীরাধার স্নান জলে, পাদস্পৃষ্ট করুণাধারায় ত্রিলোক প্লাবিত হইতেছে।

৫। তারুণ্যামৃতধারা—মধ্যাহ্নস্নান, আনীত জলে স্নান। শৈশব অতিক্রান্ত হইয়াছে। নবতারুণ্যে দেহ মণ্ডিত।

৬। লাবণ্যামৃতধারা—সায়ংস্নান, অবগাহন স্নান। নদীজলেও হইতে পারে, সরসীজলেও হইতে পারে। উচ্ছলিত লাবণ্যের তরঙ্গভঙ্গে দেহ উজ্জ্বল।

৭। নিজ লজ্জা শ্যামপট্টশাটী—শ্যামসুন্দরই তাঁহার লজ্জা। শ্যামসুন্দরই বসনরূপে তাঁহার দেহ সম্বৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

৮। উত্তরীয়—কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ—তাঁহার দ্বিতীয় বসন। অনুরাগ রক্তবর্ণ।

৯। প্রণয় এবং মান দুইটি কঞ্চুলিকা। স্তনাবরণ।

১০। নিজ সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম্, সখীগণের প্রণয়রূপ চন্দন, এবং নিজ অঙ্গের স্মিত কান্তি কর্পূর, এই তিনটিতে স্নানের পর অঙ্গ-বিলেপন।

১১। উজ্জ্বল রস—শৃঙ্গাররসরূপ মৃগমদ। প্রগাঢ় কৃষ্ণানুরাগে তিনি শ্যাম বর্ণসাদৃশ্যে মৃগমদে নিজ গৌরদেহ চিত্রিত করেন, উজ্জ্বলরসময়ী তনু। উজ্জ্বল রস কৃষ্ণবর্ণ। বিষ্ণু দৈবত।

১২। প্রচ্ছন্ন মানরূপ বামতা—তাঁহার কুটিল কবরী-বিন্যাস।

১৩। ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা—মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকার তিন শ্রেণী। শ্রীরাধা যে গন্ধচূর্ণ ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহার ধীরাধীরাত্বাদিগুণ।

১৪। রাগ—তাম্বুলরাগ; রাগ—স্নেহ মান ও প্রণয়ের পরের অবস্থা। শ্রীরাধার মাঞ্জিষ্ঠরাগ—গাঢ় রক্তবর্ণ।

১৫। প্রেম-কৌটিল্য—প্রেমের কুটিলতাই চক্ষের কজ্জল।

১৬। সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব—সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরায় কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ভাবদ্বারা

আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে। তাহা হইতে উৎপন্ন ভাব সাত্ত্বিক। স্তম্ভ, স্বেদাদি সাত্ত্বিকভাব।

স্তম্ভ—ভয় হেতু, আশ্চর্য হেতু, বিষাদ হেতু, ক্রোধ হেতু।

স্বেদ—হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ হেতু।

রোমাঞ্চ—আশ্চর্য, ভয়, ক্রোধ হেতু।

স্বর ভেদ—অমর্ষ, ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ হেতু।

বৈবর্ণ্য—বিষাদ, রোষ, ভয়াদি হেতু।

অশ্রু—রোষ, বিষাদ, হর্ষাদি হেতু।

প্রলয়—নিশ্চেষ্টতা, অত্যন্ত আনন্দ হেতু ভাব-সমাধি।

ধুমায়িতা—দুই তিনটি ভাব একত্রে উদিত হইলে তাঁহার গোপন সম্ভাবনার নাম ধুমায়িতা।

অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কা।
ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধুমায়িত মতা॥

জ্বলিতা—ভাবের সাঙ্কর্য্য, দুই তিনটি ভাব একসঙ্গে উদিত হইলে তাহা যদি কষ্টে গোপন করা যায়, তাহার নাম জ্বলিতা।

দীপ্তা—দুই চারিটি প্রৌঢ় ভাবের সম্মিলন হইলে যদি সম্বরণ করিতে সামর্থ্য না জন্মে, তাহার নাম দীপ্তা।

উদ্দীপ্তা—এক সময়ে পাঁচটি কি ছয়টি কি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে তাহার নাম উদ্দীপ্তা।

সুদীপ্ত—উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক, মহাভাবের প্রান্ত সীমা প্রাপ্ত হইলে তাহার নাম হয় সুদীপ্ত সাত্ত্বিক।

১৭। হর্ষাদি সঞ্চারী—নির্ব্বেদ আদি সঞ্চারী ভাব। ইহার সংখ্যা ত্রিশ।

১৮। কিলকিঞ্চিতাদি ভাববিংশতি ভূষিত—

কিলকিঞ্চিতাদি—স্থায়ীভাবের অনুভাব। ইহার সংখ্যা কুড়ি।

অনুভাব—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক এই তিন প্রকার। এই প্রসঙ্গে উদ্ভাস্বর ও বাচিকের পরিচয়ও সংক্ষেপে বলিব। কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের অন্য নামই অলঙ্কার। এই অলঙ্কার—অঙ্গজ তিন প্রকার, অযত্নজ সপ্ত প্রকার, এবং

স্বভাবজ দশ প্রকার। কবিরাজ গোস্বামী এই বিংশতি অলঙ্কারের কথাতেই বলিয়াছেন—কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।

অঙ্গজ অলঙ্কার—ভাব, হাব, হেলা।

ভাব—নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম যে চাঞ্চল্য, তাহারই নাম ভাব। প্রেমের প্রথম অঙ্কুর। চিত্ত মসৃণকারী প্রগাঢ় রতি।

হাব—ভাবের ঈষৎ প্রকাশ। বঙ্কিমগ্রীবায় ও অপাঙ্গভঙ্গীতে ইহা প্রকাশিত হয়।

হেলা—ভাবের সুস্পষ্ট স্ফূর্ত্তি। চঞ্চল নয়ন, পুলকাঞ্চিত অঙ্গ আদি ইহার প্রকাশক।

অযত্নজ অলঙ্কার—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য।

শোভা—রূপলাবণ্য বেশাদিযুক্ত হইলে হেলাই শোভা নামে অভিহিত হয়।

কান্তি—শোভাই মন্মথোদ্রেক-সমুজ্জ্বল হইলে হয় কান্তি।

দীপ্তি—অতি বিপুলা কান্তিই দীপ্তি।

মাধুর্য্য—সর্ব্বাবস্থায় রমণীয়তা।

প্রগল্‌ভতা—নির্ভীকতা।

ঔদার্য্য—বিনয়াবনত ভাব।

ধৈর্য্য—সুখে দুঃখে বিকারহীনতা।

স্বভাবজ অলঙ্কার—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত, মৌগ্ধ্য ও চকিত।

লীলা—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বস্ত্র-ভূষণাদি পরিধান।

বিলাস—প্রিয়তমের দর্শনে বা মিলনে গতি, স্থিতি, আসন ও মুখ-নেত্রাদির বৈশিষ্ট্য।

বিচ্ছিত্তি—সামান্য বসন-ভূষণেও যে অপরূপ শোভা হয়। নায়কের অপরাধ দর্শনে অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিতেছিলেন, সখীগণের অনুরোধেই রাখিয়াছেন, কেহ কেহ এই অবস্থাকেও **বিচ্ছিত্তি** বলেন।

বিভ্রম—বল্লভসমীপে অভিসারকালে মদনাবেগ বশতঃ হার মাল্যাদির যে বিপরীত সন্নিবেশ। বামতার আতিশয্যে সেবাতৎপর কান্তের প্রতি অনাদরকেও কেহ কেহ **বিভ্রম** বলেন।

কিলকিঞ্চিত—গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ ও হর্ষের একত্র সমাবেশে **কিলকিঞ্চিত** ভাবের আবির্ভাব ঘটে। হর্ষের আতিশয্যেই গর্ব্বাদি সাতটি ভাবের উদয় হয়। সখীগণ সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ করিলে অথবা দানঘাটে পথরোধ কবিলে শ্রীরাধার এই ভাবের উদয় হয়। দানকেলি-কৌমুদীতে কলকিঞ্চিত ভাবের উদাহরণ আছে।

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুবঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুবব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিশ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥

অন্তঃস্মেরতা জন্য নয়নে হাস্য, বোদন হেতু জলকণা, ক্রোধহেতু পাটলিমা, অভিলাষ হেতু বসিকতায় উৎসিক্ততা, ভয় জন্য অগ্রে কুঞ্চন, গর্ব্ব ও অসূয়া জন্য কুটিলতা ও উত্তাবতা এই সপ্ত ভাব একত্রে প্রকাশ পাইতেছে। মূলে হর্ষ আছে।

মোট্টায়িত—কান্তের স্মবণ ও তদীয় বার্ত্তা শ্রবণে হৃদয়ে যে অভিলাষের প্রাকট্য, তাহাই **মোট্টায়িত**।

কুট্টমিত—কান্ত কর্ত্তৃক স্তন ও অধবাদি গ্রহণে হৃদয় উৎফুল্ল হইলেও সম্ভ্রম বশত ব্যথিতের ন্যায় বাহ্য ক্রোধ প্রকাশের নাম **কুট্টমিত**।

বিব্বোক—গর্ব্ব ও মান হেতু কান্ত-দত্ত বস্তুর প্রতি অনাদরের নাম **বিব্বোক**।

ললিত—যাহাতে অঙ্গ সকলের বিন্যাসভঙ্গী, সৌকুমার্য্য ও ভ্রু-বিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহার নাম **ললিত**।

বিকৃত—লজ্জা, মান ঈর্ষা হেতু যেখানে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, তাহাকে **বিকৃত** বলে। ক্রীড়াচ্ছলে কথা না বলা।

মৌগ্ধ—প্রিয়তমের অগ্রে জ্ঞাতবস্তু বিষয়েও অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা **মুগ্ধতা**।

চকিত—প্রিয়তমের সকাশে ভয়ের কারণ না থাকিলেও যে ভীতিভাব, তাহাই **চকিত**।

অলঙ্কার-কৌস্তুভে তপন, কুতূহল, বিক্ষেপ, হসিত, কেলি, ইঙ্গিত এই কয়টি অতিরিক্ত অলঙ্কারের উল্লেখ আছে।

প্রিয়-বিচ্ছেদ-জনিত স্মরবিকার নাম **তপন**। রম্য বস্তু বিলোকনে সবিশেষ স্পৃহার নাম **কুতূহল**। প্রিয়তমের আগমনে অঙ্গে অর্দ্ধ অলঙ্কার রচনা, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি, এবং বিজনে দুই চারিটি কথোপকথন **বিক্ষেপ**। নবযৌবন-গর্ব্বজাত বৃথা হাস্যের নাম **হসিত**। বিহারকালে কান্তের সহিত ক্রীড়ার নাম **কেলি**। **ইঙ্গিত**—প্রিয়সম্মুখে লজ্জা, অলক্ষিতে প্রিয়কে দর্শন, অসময়ে প্রিয়সম্মুখে নীবী কেশাদির মোচন ও সংযমন আদি। উজ্জ্বল-নীলমণিতে নীবী স্রংসনাদিকে উদ্ভাস্বরের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

১৯। গুণ শ্রেণী—ধৈর্য্যাদি গুণসমূহ, বাচিক গুণসমূহ।

২০। সৌভাগ্য-তিলক—শ্রীরাধার ললাটে যেন এই গৌরব তিলক অঙ্কিত রহিয়াছে—যে তিনিই শ্রীভগবানের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা।

২১। মধ্যবয়স্থিতি—মধ্য কৈশোরে স্থিতিরূপা সখীস্কন্ধে করার্পণ করিয়া।

২২। কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি—শ্রীকৃষ্ণের সহিত কিরূপ লীলা করিব সর্ব্বদাই এই চিন্তা, কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়তা।

২৩। নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে—আপন অঙ্গগন্ধরূপ অন্তঃপুরে।

২৪। গর্ব্বপর্য্যঙ্ক—কৃষ্ণগর্ব্বে গর্ব্বিতা রাধার নিজ গর্ব্বরূপ খট্টা।

২৫। অবতংস—কর্ণভূষণ।

২৬। প্রবাহ—অবিরত ধারা।

২৭। শ্যামরস—শৃঙ্গার রস বিষ্ণুদৈবত, তাহার বর্ণ শ্যাম।

২৮। সত্যভামাদি যাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যের বাঞ্ছা করেন, অরুন্ধতী, পার্ব্বতী আদি সতীশিরোমণিগণ যাঁহার মত পাতিব্রত্যের কামনা করেন, কলাবতীগণের শ্রেষ্ঠা ব্রজযুবতীগণ যাঁহার নিকট কলাবিলাস শিক্ষা করেন, স্বয়ং ভগবান্ যাঁহার গুণগণের অন্ত পান না, ক্ষুদ্র জীব কিরূপে তাঁহার গুণ গণনা করিবে? প্রশ্ন উঠিবে—পতিব্রতা শিরোমণি অরুন্ধতীর পাতিব্রত্যে কি কোন ত্রুটি ছিল? শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর মতে ছিল। অরুন্ধতী জানিতেন বশিষ্ঠ আমার সর্ব্বস্ব। তিনি যে বশিষ্ঠের সর্ব্বস্ব এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না।

কিন্তু শ্রীরাধার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং সে বিশ্বাস সর্ব্বাংশেই সত্য, শ্রীকৃষ্ণ যেমন আমার সর্ব্বস্ব তেমনই আমিও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব। আমিই শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের একাধিশ্বরী। এইজন্যই দাস গোস্বামী বলিয়াছেন অরুন্ধতীও যাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছা করেন।

উদ্ধৃত কবিতা শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর "প্রেমাম্ভোজ মকরন্দাখ্য" স্তবরাজের অনুবাদ। অনুবাদে—"সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষী যশঃশ্রী কাচ্ছপীরবাম্' এই শ্লোকাংশ বর্জ্জিত হইয়াছে।

উদ্ভাস্বর—নীবিস্রংসন, উত্তরীয় বসন-স্খলন, কেশ-ভ্রংশন, গাত্র মোটন, জৃম্ভন, নাসিকার প্রফুল্লতা ও নিঃশ্বাস আদি উদ্ভাস্বরের লক্ষণ।

বাচিকগুণ—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অপলাপ, অনুলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ—বাক্যের পরিপাট্যজনিত এই দ্বাদশ বাচিক গুণ। বাচিকগুণ নায়ক-নায়িকা—উভয়েরই সমান।

আলাপ—প্রিয় চাটু বচন। বিলাপ—দুঃখ-জনিত বাক্য। সংলাপ—উক্তি-প্রত্যুক্তি। প্রলাপ—ব্যর্থ বচন। অনুলাগ—বারম্বার কথন। অপলাপ—পূর্ব্বোক্ত বচনের অন্যথা-কল্পে বাক্য-যোজনা। সন্দেশ—বার্ত্তা প্রেরণ। অতিদেশ—তাঁহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ কথন। অপদেশ—বক্তব্য বিষয়ের অন্যথা কল্পনা। উপদেশ—শিক্ষামূলক বাক্য। নির্দ্দেশ—সেই এই আমি, এইরূপ উক্তি। ব্যপদেশ—ছলপূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ-প্রকাশ।

১৫। সখী ও দূতী

সখী

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় সখীর নাহি মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥
বাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পুষ্প পল্লব পাতা ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে কবায় সঙ্গম ॥
নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥
অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেম করে রস পুষ্ট।
তা সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য লীলা।

যাহারা ছল পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পবকে ভালবাসিয়াছে, পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং যাহাদের বয়ঃক্রম ও বেশাদি একরূপ, তাহারাই পরস্পরের সখী।

শ্রীরাধার সখীগণ—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম শ্রেষ্ঠসখী। কুসুমিকা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখী। কস্তুরিকা, মণিমঞ্জরিকা প্রভৃতি নিত্যসখী। শশিমুখী, বাসন্তী প্রভৃতি প্রাণসখী। ইহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতা লাভ করিয়াছেন। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী। পরম শ্রেষ্ঠসখীগণ মধ্যে—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই অষ্ট সখী সর্ব্বগুণমণ্ডিতা। ইহারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা বশতঃ কখনো শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি প্রীতিমতী, কখনো শ্রীরাধার প্রতি অনুরাগিণী। খণ্ডিতাবস্থায় শ্রীরাধার প্রতি আদর ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, মানাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আদর ও শ্রীরাধার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সখীগণের কার্য্য—(১) নায়ক নায়িকা পরস্পরের প্রেম গুণাদি কীর্ত্তন। (২) পরস্পরের আসক্তিকারিতা। (৩) পরস্পরকে অভিসারে প্রেরণ। (৪) কৃষ্ণকরে সখী সমর্পণ। (৫) পরিহাস। (৬) আশ্বাস প্রদান। (৭) নায়ক-নায়িকার বেশবিন্যাস। (৮) মনোগত ভাব প্রকাশে দক্ষতা। (৯) নায়ক-নায়িকার দোষ গোপন। (১০) নায়িকার পত্যাদি বঞ্চনা। (১১) অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান। (১২) যথাকালে মিলন-সম্পাদন। (১৩) চামরাদি দ্বারা সেবা। (১৪-১৫) নায়ক ও নায়িকাকে তিরস্কার। (১৬) সংবাদ-প্রেরণ। (১৭) নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ যত্ন।

সখীগণের প্রখরা ও লঘু আদি দ্বাদশ প্রকার ভেদ আছে। আত্যন্তিকাধিকা প্রখরা, আত্যন্তাধিকামধ্যা, আত্যন্তিকাধিকামৃদ্বী। আপেক্ষিকাধিকা অধিকপ্রখরা, ঐ অধিক মধ্যা, ঐ অধিকমৃদ্বী। সমপ্রখরা, সমমধ্যা, সমমৃদ্বী। (আপেক্ষিকী ও আত্যন্তিকী) লঘু প্রখরা, লঘু মধ্যা, লঘুমৃদ্বী। ইঁহারা স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। সুহৃৎপক্ষ—এক ইষ্টসাধক, দ্বিতীয় অনিষ্টবাধক। ইষ্টসাধক—কুন্দবল্লী শ্যামলাকে কহিলেন—শ্রীরাধা কর্পূরচন্দনে অঙ্গবিলেপন প্রস্তুত করিয়া তোমার নাম লইয়া তোমারই সখীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

অনিষ্টবাধক—শ্রীরাধা ভাণ্ডীর বটে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা আসিয়া জটিলাকে সংবাদ দেওয়ায় জটিলা কুপিতা হইয়া ভাণ্ডীর অভিমুখে যাইতেছিলেন। মধ্যপথে রাধাসখী শ্যামলা আসিয়া প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া দিলেন।

তটস্থা—যিনি বিপক্ষের সুহৃৎ পক্ষ।

বিপক্ষা—ইষ্ট বিনষ্ট করিয়া অনিষ্টকারিণী।

ইঁহাদের ঈর্ষা, অমর্ষ, অসূয়া, গর্ব্ব, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত (বিপক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ উপহাস), ঔদ্ধত্য ইত্যাদি নানাবিধ ভাব আপন যূথেশ্বরীর তথা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করে।

দূতী

নায়ক-নায়িকা পরস্পরের মিলন-সাধনই, দূতীর কার্য্য। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করে না, তাহাকেই **আপ্তদূতী** বলে। আপ্তদূতী তিন প্রকার—অমিতার্থা, নিঃসৃষ্টার্থা ও পত্রহারী।

অমিতার্থা—নায়ক-নায়িকা দুইজনের মধ্যে একজনের ইঙ্গিত অবগত হইয়া উপায়যোগে উভয়ের মিলনসাধন-কারিণীর নাম অমিতার্থা।

নিঃসৃষ্টার্থা—একজন কর্ত্তৃক কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তি দ্বারা যে নায়ক-নায়িকা—উভয়কে মিলিত করায়, তাহাকে নিঃসৃষ্টার্থা দূতী বলে।

পত্রহারী—যে দূতী নায়ক-নায়িকার বার্ত্তা মাত্র বহন করে, তাহার নাম পত্রহারী।

শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (তাপসী), পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী প্রভৃতি আপ্তদতীর বিবিধ শ্রেণী। সখীগণের দূত্য আবার নায়ক ও নায়িকা উভয়নিষ্ঠতা প্রযুক্ত বাচ্যদূত্য ও ব্যঙ্গ (ব্যঞ্জনাপূর্ণ) দূত্য ভেদে দ্বিবিধ। ব্যঙ্গদূত্য চারি প্রকার—কৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ, কৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে কৃষ্ণের প্রতি ব্যপদেশ ব্যঙ্গ। কৃষ্ণপ্রিয়ার অসাক্ষাতে কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ ও কৃষ্ণ-প্রিয়ার অসাক্ষাতে কৃষ্ণের প্রতি ব্যপদেশ ব্যঙ্গ।

প্রিয়ার সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ—

মাধব কলাপিনীয়ং ন সবিধমায়াতি মেদুরা রাধা।
নিজপাণিনা তদেনাং প্রসীদ তূর্ণং গৃহাণাদ্য॥

ওগো নবজলধর, এই কলাপিনী আমার সমীপে আসিতেছে না। কোনরূপেই ইহাকে বশে আনিতে পারিলাম না। তুমি এখনই ইহাকে নিজহাতে ধরিয়া লও।

ব্যঙ্গার্থ, কলাপিনী—এক অর্থে ময়ূরী, অন্য অর্থে অলঙ্কৃতা রমণী।

মেদুরারাধা—আমার অবশীভূতা, অন্য অর্থে মেদুরা অর্থাৎ স্নিগ্ধা রাধা।

ব্যপদেশ ব্যঙ্গ—ছলপূর্ব্বক অন্যবস্তু লক্ষ্য করিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ। ব্রজনায়িকাগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াসাধ্য ও বাচিক দূতী নিয়োগ করেন। ক্রিয়াসাধ্য আবার অনুভব ও সাত্ত্বিকভেদে দুই প্রকার।

"আকুল নয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নের তারা"।

অনুভবে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বুঝিয়া লইয়া মিলন-সাধনে প্রচেষ্টা ক্রিয়াসাধ্য

দূতীর কার্য্য। মুরলী শ্রবণে শ্রীরাধার স্বেদোদ্গম (সাত্ত্বিক চিহ্ন) দেখিয়া—কৃষ্ণানয়নে গমনও ক্রিয়াসাধ্য দূতীর কার্য্য। বাচ্য ও ব্যঙ্গ-ভেদে বাচিক দূত্যও দুই প্রকার। ব্যঙ্গও শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গ ও অর্থোদ্ভব ব্যঙ্গ ভেদে দুই রূপ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের পর দৈনন্দিন মিলনের জন্য পরস্পরের যে সঙ্কেত কিম্বা অভিযোগ, এবং স্বয়ং দৌত্যের যে উক্তি-প্রত্যুক্তি তাহার সঙ্গে এই বাচিক দূত্যের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য—স্বয়ং দৌত্যে কৃষ্ণ বা রাধা শব্দচ্ছলে অথবা অর্থান্তরে আপন আপন গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আর বাচিক দূত্যে দূতী বা সখী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাতে বা পরোক্ষে, শব্দচাতুর্য্যে পরস্পরকে সম্মিলিত হইবার ইঙ্গিত করিতেছেন।

আপ্তদূতীর মধ্যে সখীও আছেন। সখীর ধর্ম্ম—

দূত্যং তু কুর্ব্বতী সখ্যাঃ সখী রহসি সঙ্গতা।
কৃষ্ণেন প্রার্থ্যমানাপি স্যাৎ কদাপি ন সম্মতা॥

সখী দৌত্যে আসিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নির্জ্জন প্রদেশে মিলিতা হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গম প্রার্থনা করেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না।

দূত্যেনাস্য সুহৃজ্জনস্য রহসি প্রাপ্তাস্মি তে সন্নিধিং
কিং কন্দর্পধনুর্ভয়ঙ্করমমুং ভ্রূগুচ্ছমুদ্যচ্ছসি।
প্রাণানর্পয়িতাস্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবীচন্দ্র তে
নত্বেতামসমাপিতপ্রিয়সখী কৃত্যানুবন্ধাং তনুঃ॥
ঋতুপতি রাতি বিরহজরে জাগরি দূতি উপেখিল রামা।
প্রিয় সহচরী বলি মোহে পাঠাওলি অতএ আয়লু তুয়া ঠামা॥
শুন মাধব করজোড়ি কহলম তোয়।
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত-লোচনে তুহুঁ নাহি হেরবি মোয়॥
দূর কর আলস আনহি লালস চাতুরি বচন বিভঙ্গ।
বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ॥
যাহে শির সোঁপি কোরপর শূতিয়ে সো যদি করু বিপরীতে।
পিরিতিক রীত ঐছে তব মীটব গোবিন্দদাস চিতে ভীতে॥

উদ্ধৃত পদের শেষের দুইটি পংক্তিতে কবিরাজ গোবিন্দদাস গোপীভাবের নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-দর্শনেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গম-লালসা—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তাঁহাদের ছিল না। তাই গোবিন্দদাস বলিতেছেন—"যাঁর কোলে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই"—(শির সঁপিয়া যাঁর কোলে শুইয়া থাকি) সে যদি এইরূপ বিপরীত আচরণ করে (নির্জ্জনে পাইয়া অঙ্গসঙ্গ প্রার্থনা করে) তাহা হইলে পিরিতির রীতি তো এইখানেই মিটিবে,—ব্রজের হাট তো এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাই গোবিন্দদাসের চিত্তে অত্যন্ত ভয় হইতেছে।

১৬। রস এবং ভাব

রস

স জয়তি যেন প্রভাবতী দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ।
অতিশয়িতপদপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারাতেঃ॥

পদপদার্থের অতিরিক্ত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা যেমন কাব্য-জগতের অধিশ্বরী, তেমনই সকল ধ্বনির ললামভূত মুরারীর যে মুরলীধ্বনি,—ব্রজ-বিলাসিনী ধনীগণের নয়নে উদ্বেলিত আনন্দাশ্রুর দ্বারা অঞ্জন-রেখার বিলোপ হেতু ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বিগতাঞ্জনা-বৃত্তি সম্পাদিত করে, বৈকুণ্ঠাদি পদ এবং ব্রহ্মানন্দাদি পদার্থ হইতে উৎকর্ষশালী সেই মুরলীধ্বনির জয় হউক। —অলঙ্কার-কৌস্তুভ

আচার্য্য ভরত নয়টি মাত্র স্থায়ী ভাব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেবতার প্রতি রতিকে ব্যভিচারী ভাব বলিয়াছেন। ভরতের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কেহই এই মতের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। অগ্নিপুরাণ অবশ্য বলিয়াছেন— "যিনি সনাতন পরম ব্রহ্ম, কখনো কখনো তাঁহার সহজ আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। চৈতন্যের এই আনন্দই চমৎকার রস রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।" কিন্তু অগ্নিপুরাণেও নয়টি মাত্র স্থায়ী ভাবেরই উল্লেখ আছে।

বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ভগবদ্ বিষয়ক রতিকে তথা ভক্তিকেই মুখ্যরসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন— জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। সুতরাং ভগবানের প্রতি রতিই জীবের জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভগবদ্‌প্রিয়া হ্লাদিনীই জীবের সুকৃতির ফলে জীব হৃদয়ে এই ধর্ম্মের উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটাইয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহারা ভগবদ্ প্রীতিকেই একমাত্র স্থায়ীভাব এবং ভক্তিকে তথা মধুরারতিকেই মুখ্যরস অর্থাৎ আদি রস বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভৃতি প্রতিপাদিত রসকেই মধু ব্রহ্ম, আনন্দ ব্রহ্মরূপে আস্বাদনপূর্ব্বক "রসরাট" বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতো রহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট সবিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥

ভক্তি যে মানবহৃদয়ের স্থায়ীভাব, ইহা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনে ইহা তাঁহারা দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে শাস্ত্র ভক্তিকে ব্যভিচারী ভাব বলিয়াছে, সেই শাস্ত্রবাক্যে তাঁহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। শাস্ত্র অপেক্ষাও প্রামাণ্য সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁহাদের সম্মুখে ছিল। এইজন্যই এই মহাসত্যের, এই অননুভূতপূর্ব্ব রহস্যের প্রকাশ তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সর্ব্ব মানবের কল্যাণ কামনায় এই চরম ও পরম সত্যের প্রকাশে তাঁহাবা বাধ্য হইয়ছিলেন। এই সত্য জীব-জগতের মত সাহিত্যজগৎকেও আলোকোজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান-পরম্পবার মধ্যে আপন জীবন-ভাষ্যে রস-সাহিত্যে ভক্তিরসকে প্রাধান্য দানও তাঁহার মহত্তম অবদান।

ভক্তিরস

রস শব্দের দুইটি অর্থ—একটি যাহা আস্বাদ্য বস্তু তাহাই রস, অপরটি রস আস্বাদক, বা রসিক। কিন্তু আস্বাদ্য বস্তুকে সাধারণভাবে রস বলিলেও যাহার আস্বাদনে চমৎকৃতি জন্মে না, তাহাকে রস বলা চলে না। অননুভূতপূর্ব্ব বস্তুর অনুভবে, অনস্বাদিতপূর্ব্ব বস্তুর আস্বাদনে চিত্তের যে স্ফারতা, তাহারই নাম চমৎকৃতি। এই চমৎকৃতি না থাকিলে আস্বাদ্যবস্তু রস পদবাচ্য হইবে না।

রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।

—অলঙ্কার কৌস্তুভ

আনন্দের জন্য স্বাভাবিকী লালসা মানবের সহজাত। এই আনন্দ লৌকিক বা জড় আনন্দ নহে। সুতরাং লৌকিক আনন্দে চমৎকারিতা নাই। অলৌকিক আনন্দ বা সুখই রস, কারণ চমৎকৃতিই তাহার স্বভাব। ভক্তি হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি, তাই ভক্তি বা কৃষ্ণরতি স্বরূপতই আনন্দরূপা। এই আনন্দময়ী রতি অফুরন্ত এবং অমৃতস্যন্দী। ব্রহ্মানন্দও তাহার নিকট তুচ্ছ। তথাপি এই রতি বা ভক্তি আপনা আপনি উচ্ছল হইলে চমৎকৃতি জন্মাইতে পারে না। অপর কয়েকটি সামগ্রীর সহিত মিলনেই তাহা হয় উদ্বেলিত এবং চমৎকারিত্বময়ী, এবং তখনই তাহার আখ্যা হয় ভক্তিরস।

যে সমস্ত বস্তুর মিলনে কোন আস্বাদ্য বস্তু রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সেই বস্তু সমূহই সেই সেই রসের সামগ্রী। প্রেম স্নেহ মান প্রণয়াদি কৃষ্ণ রতির সামগ্রী, এখানে এই রতির নাম স্থায়ী ভাব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধা রতি প্রেম স্নেহাদি মিলনে রসে পরিণত হয়, সুতরাং এই পঞ্চবিধা রতিই শান্তাদি রসের স্থায়ী ভাব।

শ্রুতি বলিলেন "রসো বৈ সঃ"

যাহা আস্বাদনীয়, আস্বাদন যোগ্য, তাহাই রস। আবার "রস্যতে ইতি রসঃ"— রস আপনি আপনাকে আস্বাদনও করিতে পারে ; সুতরাং রস যেমন আস্বাদনীয়, তেমনই আস্বাদক। অলঙ্কার-কৌস্তুভে শ্রীকবিকর্ণপুর বলিয়াছেন—অন্তর-বহিরিন্দ্রিয়-সম্বন্ধে ব্যাপারান্তরের রোধক, (প্রতিবন্ধক) অর্থাৎ বেদান্তর স্পর্শ শূন্য কারক, অথচ স্বকারণীভূত বিভাবাদির সহিত সম্মেলনে চমৎকারজনক, এই যে সুখ, তাহাই রস। কবিরাজ কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন, "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন"। রস আনন্দধর্ম্মা বলিয়া একবিধই হইয়া থাকে। ভাবই রতি প্রভৃতি উপাধি-ভেদে নানাত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবানই আদি রস, তিনিই সকল রসের আদি এবং আকর।

শ্রীমদ্ভাগবতে রসের সংখ্যা দশ। দশম স্কন্ধের—"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ" শ্লোকে এই দশটি রসের অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্লোকের সঙ্গে রসের এবং স্থায়ীভাবের পরিচয় দিতেছি।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাংশাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ। ১০।৪৩।১৭

[১] মল্লগণের বজ্র রস রৌদ্র স্থায়ীভাব ক্রোধ
[২] নরগণের নরোত্তম " অদ্ভুত " বিস্ময়
[৩] রমণীগণের কন্দর্প " শৃঙ্গার " মধুর
[৪] গোপগণের স্বজন " হাস্য [সখ্য মিলিত] স্থায়ীভাব হাস
[৫] অসৎ রাজন্যগণের শাসক রস বীর, স্থায়ীভাব উৎসাহ
[৬] পিতা মাতার শিশু রস করুণ [বাৎসল্য মিলিত]
স্থায়ীভাব শোক

[৭]	কংসের মৃত্যু	রস	ভয়ানক	স্থায়ীভাব	•	ভয়
[৮]	অজ্ঞগণের বিরাট	„	বীভৎস	„		জুগুপ্সা
[৯]	যোগীগণের পরতত্ত্ব	„	শান্ত	„		শান্তি
[১০]	বৃষ্ণিগণের পরদেবতা	„	ভক্তি	„		প্রেম

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৃহত্তোষণী টীকায় নিম্নের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

রৌদ্রোদ্ভুত শুচিরথ ধৃত সখ্য হাসো
বীরোঽথ বৎসলযুতঃ করুণো ভয়াঙ্কঃ।
বীভৎস সংজ্ঞ উদিতোঽথ তথৈব শান্তঃ
স প্রেম ভক্তিরিতি তে দ্ব্যধিকা দশ স্যুঃ॥

এই মতে রসের সংখ্যা দ্বাদশ। রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, সখ্য, হাস্য, বীর, বাৎসল্য, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, ভক্তি। ভক্তি এখানে প্রধানত দাস্যরূপেই গণনীয়।

কবি জয়দেব দশাবতার-স্তোত্রে "দশাকৃতিতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছেন। টীকাকার পূজারী গোস্বামী বলিয়াছেন—মৎস্যাবতার বীভৎস রসের, কূর্ম্ম অদ্ভুত রসের, বরাহ ভয়ানক রসের, নৃসিংহ বৎসল রসের, বামন সখ্য রসের, পরশুরাম রৌদ্র রসের, রামচন্দ্র করুণ রসের, বলরাম হাস্য রসের, বুদ্ধ শান্ত রসের এবং কল্কি বীর রসের অধিষ্ঠাতা।

নয়টি রসেব উদাহরণে কবি কর্ণপুর অলঙ্কার-কৌস্তুভে বর্ণন করিতেছেন—যিনি শ্রীরাধিকার প্রতি শৃঙ্গাররসশালী (১) অঘাসুরের বিষদাহে দগ্ধ সখাগণের প্রতি সকরুণ, (২) ঐ অসুরের জঠরে প্রবেশকালে বীভৎসরসময়, (৩) ব্রজবালাগণের বস্ত্রহরণ সময়ে হাস্যরসিক, (৪) দৈত্যদলনে বীররসাশ্রিত, (৫) কুপিত ইন্দ্রের প্রতি রৌদ্ররসাবতার, (৬) হৈয়ঙ্গবীনহরণে ভীতিবিহ্বল, (৭) দর্পণে নিজ মূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময়নিমগ্ন, (৮) দামবন্ধনে শান্তরসাস্পদ, (৯) সেই বাসুদেবের জয় হউক।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য—এই পঞ্চ ভক্তিরসকে মুখ্য বলা হইয়াছে এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সপ্ত রসকে গৌণ গণনা করিয়া ভক্তিরসের সংখ্যা ধরা হইয়াছে

দ্বাদশ। শ্রীপাদ রূপের মতে এই সমস্ত রসের বর্ণ শ্বেত, চিত্র, অরুণ, শোণ, শ্যাম, পাণ্ডুর, পিঙ্গল, গৌর, ধূম্র, রক্ত, কাল এবং নীল। শান্তরসে পূর্ত্তি, দাস্য হইতে হাস্য পর্য্যন্ত রসে বিকাশ, বীর ও অদ্ভুত রসে বিস্তার, করুণ ও রৌদ্র রসে বিক্ষেপ এবং ভয়ানক ও বীভৎস রসে ক্ষোভ, ভক্তি রসের আস্বাদ এই পঞ্চধা রূপে পরিকীর্ত্তিত হয়।

লক্ষ্য করিবার বিষয় পূজারী গোস্বামী দাস্য রস গণনা করেন নাই, এবং আদিরসের অধিষ্ঠাতৃত্ব নন্দনন্দনে—'দশাকৃতিতে কৃষ্ণায়' অর্পণ করিয়াছেন। তাহা হইলে পূজারী গোস্বামীর মতে রসের সংখ্যা একাদশ। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ভক্তিই দাস্য নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের টীকায়—"মীন স্থানে বুদ্ধো বা পঠনীয়"—এই উক্তি আছে। তাহাতে কিন্তু সামঞ্জস্য হয় না। কারণ দেবতা নির্ণয়ে বলা হইয়াছে—শান্তের কপিল, দাস্যের মাধব, সখ্যের উপেন্দ্র (বামন), বাৎসল্যের নৃসিংহ, মাধুর্য্যের নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, হাস্যের বলরাম, অদ্ভুতের কূর্ম্ম, বীর রসের কল্কি, করুণ রসের রাঘব, রৌদ্র রসের ভার্গব, ভয়ানক রসের বরাহ, এবং বীভৎস রসের মীন। পূজারী গোস্বামীর একাদশ রস বর্ণনার সঙ্গে দাস্য ভিন্ন ইহার অপর কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং দেখিতেছি ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বুদ্ধের পরিবর্ত্তে মীন নহে, কপিল গৃহীত হইয়াছেন।

ভাব

আচার্য্য ভরত বলিয়াছেন—"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। বিভাবিত অর্থাৎ উৎপাদিত করে যে, এই অর্থে **বিভাব** শব্দে কারণ বুঝায়। রতি উদ্বুদ্ধ বা উদ্বেল হইয়া উঠিলেই তাহা আস্বাদন যোগ্য হয়। বিভাব রতিকে উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত করে, তাই বিভাব রতিকে আস্বাদ্য করিয়া তুলে। অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ যে ভাবের উৎপত্তি হয়, এই অর্থে **অনুভাব** শব্দে কার্য্য বুঝিতে হইবে। বিশেষরূপে স্থায়ী ভাবের অভিমুখে চরণশীল যে ভাব, তাহার নাম **ব্যভিচারী**। ইহা আগন্তুক, স্থায়ী ভাবের পুষ্টি সাধন করিয়া তাহাতেই

বিলীন হয়। এইজন্য ইহার অপর নাম **সঞ্চারী**। এই তিনের সম্মেলনে স্থায়ী ভাব রসকে উদ্রিক্ত করে, প্রকাশ করে, রসের সঙ্গে মিলিত হয়, রস রূপে পরিণত হয়।

ভাবের বহু অর্থ আছে। চিত্ত মসৃণকারী প্রগাঢ় রতি ভাব। নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম যে বিকার, যে অঙ্কুরোদ্গম, যে চাঞ্চল্য, তাহাই **ভাব**। ভূ-ধাতুর অর্থ হওয়া। ভবতীতি ভাবঃ। একটা কিছু হওয়া। একটা সৃষ্টি। একটা নির্দ্দিষ্ট আকার পাওয়াই ভাব। সৃষ্টি অর্থে ভব, ভবের প্রকাশ, ভাব। যাহা যেমন, তাহার সেই রূপটিই ভাব। অন্য অর্থে ভাবেরই অপর নাম তত্ত্ব। মহাভাষ্যকার বলেন, "তস্য ভাবস্তত্ত্বম্" তাহার ভাব, যাহাতে কোন বিকার ঘটে না, তাহাই তত্ত্ব।

আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে **বিভাব** দ্বিবিধ। নায়ক ও নায়িকা উভয়ে পরস্পরের আশ্রয় বা অবলম্বন, ভাবের আবির্ভাবের হেতু। শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্বের দুইরূপ—আবৃত স্বরূপ ও প্রকট স্বরূপ। অন্য বেশাদি দ্বারা আচ্ছাদিতরূপ আবৃত স্বরূপ, অনাবৃত স্বয়ং রূপ প্রকট স্বরূপ। মাত্র মাধুর্য্যই শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্বের হেতু নহে। তিনিই জগতে একমাত্র প্রিয়বস্তু, এই প্রিয়ত্বই তাঁহার আলম্বনত্বের প্রধান কারণ। নায়ক ও নায়িকার গুণ, চেষ্টা, চিত্রপটাদি উদ্দীপন বিভাব। শ্রীরাধিকার পক্ষে বংশীধ্বনি, বর্ষার মেঘ, তমালবৃক্ষ, ময়ূরাদি, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে চম্পকপুষ্পাদিও উদ্দীপনের কারণ। "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" ভাব উদ্দীপ্ত হয়। ভাবুক ও রসিকের সঙ্গও উদ্দীপনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হেতু। অনুভাবের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশ প্রকার।

১। নির্ব্বেদ—আর্ত্তি, বিয়োগ ও ঈর্ষা হেতু যে আত্মধিক্কার জন্মে।

২। বিষাদ—ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, কামনার ব্যর্থতা।

৩। দৈন্য—ভয়, দুঃখ ও অপরাধ জন্য দীনতা।

৪। গ্লানি—শ্রম, মনঃপীড়া ও রতিজনিত ক্লান্তি।

৫। শ্রম—পথশ্রম, রতিশ্রম, নৃত্যশ্রমাদি।

৬। মদ—মধুপানজনিত মত্ততা।

৭। গর্ব্ব—রূপ, গুণ, সৌভাগ্য ও কৃষ্ণকে কান্তরূপে প্রাপ্তি ইত্যাদি হেতু গর্ব্ব।

৮। শঙ্কা—চৌর্য্য, অপরাধ ও পরের ক্রূরতা জন্য শঙ্কা হয়। শ্রীরাধা কর্ত্তৃক বংশীচুরি, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার বেশর চুরি ইত্যাদি চৌর্য্য।

৯। ত্রাস—বিদ্যুৎ ও ভয়ানক জন্তু দর্শন, মেঘের শব্দ শ্রবণ।

১০। আবেগ—প্রিয় দর্শন, প্রিয় শ্রবণ, অপ্রিয়-দর্শন ও অপ্রিয়-শ্রবণ জন্য আবেগ জন্মে।

১১। উন্মাদ—অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ উন্মাদের হেতু।

১২। অপস্মার—ধাতু-বৈষম্য জনিত চিত্তবিকার।

১৩। ব্যাধি—কৃষ্ণবিরহে জ্বরাদি।

১৪। মোহ—হর্ষে, বিষাদে ও কৃষ্ণবিরহে মোহ হয়।

১৫। মৃত্যু—কবিগণ বর্ণনা করেন না। মৃত্যুর উদ্যোগাদি বর্ণন করেন।

১৬। আলস্য—ইচ্ছাকৃত অথবা শ্রমজনিত অলসতা।

১৭। জাড্য—ইষ্টানিষ্ট দর্শন ও শ্রবণ এবং কৃষ্ণবিরহজনিত জড়তা।

১৮। ব্রীড়া—নব সঙ্গম অকার্য্যকরণ ও স্তুতি ও অবজ্ঞাদিহেতু লজ্জা।

১৯। অবহিত্থা—লজ্জা অথবা মানে বা কৌতুকাদি কারণে ভাবগোপন।

২০। স্মৃতি—সাদৃশ্য দর্শন-দৃঢ়াভ্যাস হেতু স্মৃতির উদয় হয়।

২১। বিতর্ক—পরম সংশয় হেতু বিতর্কের উদ্ভব হয়।

২২। চিন্তা—ইষ্টের অপ্রাপ্তি, অনিষ্টপ্রাপ্তি চিন্তার কারণ।

২৩। মতি—বিচারার্থ অর্থ-নির্দ্ধারণ।

২৪। ধৃতি—দুঃখাভাব ও উত্তম প্রাপ্তি হেতু মনের অচাঞ্চল্য।

২৫। হর্ষ—অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভে আনন্দ।

২৬। ঔৎসুক্য—ইষ্টপ্রাপ্তি ও ইষ্টদর্শনে স্পৃহা-জনিত উৎসাহ।

২৭। উগ্রতা—প্রচণ্ডতা (অশোভন বলিয়া সাক্ষাৎভাবে বর্ণিত হয় নাই)।

২৮। অমর্ষ—"অধিক্ষেপ অপমানে অমর্ষের স্থিতি"।

২৯। অসূয়া—পর-সৌভাগ্যে বিদ্বেষ।

৩০। চাপল্য—চিত্তের লঘুতা, অনুরাগ বা দ্বেষ হেতু জন্মে।

৩১। নিদ্রা—ক্লান্তি হেতু চিত্তের নিমীলন।

৩২। সুপ্তি—বিবিধ চিন্তা এবং নানা অনুভূতিময় নিদ্রা। স্বপ্নাবিষ্ট নিদ্রা।

৩৩। বোধ—নিদ্রানিবৃত্তি, চেতনা।

ব্যভিচারী ভাবের দশাচতুষ্টয়—

১। উৎপত্তি—ভাব-সম্ভব বা ভাবের সদ্ভাব।

২। সন্ধি—সমান রূপের বা ভিন্ন ভাবদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি বলে।

৩। শাবল্য—ভাবনিচয়ের উত্তরোত্তর পরস্পর সংমর্দ্দন শাবল্য।

৪। শান্তি—ভাবের বিলয়।

স্থায়ী ভাব—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরীতে স্থায়ী ভাব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। স্থায়ী ভাবই মধুরা রতি। যাহা হাস্যাদি অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবকে বশীভূত করিয়া উত্তম নরপতির ন্যায় বিরাজমান হয়, তাহাকেই মধুরা রতি বা স্থায়ী ভাব বলে। মধুরা রতি—কৃষ্ণবিষয়িণী রতি। এই রতি দ্বিবিধা—মুখ্যা ও গৌণী। মুখ্যা—শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষরূপা যে রতি, তাহাকে মুখ্যা বলে। মুখ্যা রতি স্বার্থা ও পরার্থা ভেদে দ্বিবিধা।

স্বার্থা—অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ দ্বারা আপনাকে স্পষ্টরূপে পোষণ করে, এবং বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা তাহার গ্লানি উৎপন্ন হয়।

পরার্থা—যে রতি স্বয়ং সঙ্কুচিতা হইয়া অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাব সকলকে গ্রহণ করে।

স্বার্থা ও পরার্থার—শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা (মাধুর্য্য)—এই পাঁচ প্রকার ভেদ হয়।

শুদ্ধা—সামান্যা, স্বচ্ছা ও শান্তি ভেদে তিন প্রকার।

সামান্যা—সাধারণ জন ও বালিকাদির শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে যে রতি।

স্বচ্ছা—নানাবিধ ভক্তের সঙ্গ হেতু সেই সেই সাধন দ্বারা সাধক সকলেরও শ্রেণীভেদ হয়। যখন যে প্রকার ভক্তে রতির আসক্তি জন্মে, সাধকেরও তখন সেই প্রকার ভাবের উদয় হয়। এইজন্যই এই রতি স্বচ্ছা।

শান্তি—মনের সংশয়রাহিত্য, শম। বিষয়-বাসনা।ত্যাগ হইতে মনের যে আনন্দ। শমপ্রধানগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মা জ্ঞানে মমতাগন্ধবর্জ্জিত রতি উদিত হয়।

প্রীতি (দাস্য), সখ্য ও বাৎসল্য—কেবলা ও সঙ্কুলা ভেদে দ্বিবিধা।

কেবলা—অন্য রতির গন্ধশূন্যা রতি কেবলা। ব্রজে রসালাদি ভৃত্যগণে, শ্রীদামাদি সখাগণে এবং নন্দ প্রভৃতি গুরুজনে এই কেবলা রতি স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।

সঙ্কুলা—প্রীতি, সখ্য ও বাৎসল্যের মধ্যে দুইটি বা তিনটি একত্রে মিলিত হইলে তাহাকে সঙ্কুলা বলে। ইন্দ্রপ্রস্থে ভীমসেনাদি, দ্বারকায় উদ্ধবাদি, ব্রজে ধাত্রী মুখরাদির মধ্যে এই রতির প্রকাশ।

প্রীতি—শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য এই জ্ঞান। এই জ্ঞানে হরিতেই প্রীতি হয়, অন্যত্র প্রীতি থাকে না। দাস্য ভাব।

সখ্য—সখাগণের রতি বিশ্বাসরূপা। সখাগণ শ্রীকৃষ্ণতুল্য। এই রতি পরিহাস ও প্রহাসাদির জনয়িত্রী।

বাৎসল্য—শ্রীকৃষ্ণে লাল্যজ্ঞান, আমরা পালক, এই বুদ্ধি। লালন, মাঙ্গল্য ক্রিয়া-সম্পাদন, আশীর্ব্বাদ ও চিবুক-স্পর্শাদি ইহার কার্য্য। শ্রীনন্দ-যশোদাদিতে ইহার সর্ব্বোত্তম বিকাশ।

প্রিয়তা—হরি এবং ব্রজবধূগণের পরস্পর স্মরণ দর্শনাদি অষ্টবিধ সম্ভোগের আদি কারণের নাম প্রিয়তা। ইহাই **মধুরা রতি**।

গৌণী রতি—যে সঙ্কোচময়ী রতির দ্বারা আলম্বন-জনিত যে কোন ভাব-বিশেষ স্বয়ং প্রকাশ পায়, তাহাই **গৌণী রতি**। হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দা এই সাত প্রকার গৌণী রতি। জুগুপ্সায় শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব হইতে পারে না। প্রিয়তা বা মধুরা রতির আবির্ভাবের হেতু—সাত প্রকার। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব। এইগুলি উত্তরোত্তর উত্তম।

অভিযোগ—নিজ হইতে বা অপরের দ্বারা ইঙ্গিতে আপন অভিলাষ প্রকাশের নাম অভিযোগ।

বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

শব্দ—কৃষ্ণ নাম, মুরলীধ্বনি প্রভৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি দূতী॥ "অপরূপ তুয়া মুরলীধ্বনি, লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি।"

স্পর্শ—একদিন ব্রজপুরে অতি গাঢ় অন্ধকারে
এক যুবা মোরে পরশিল।
সেদিন অবধি করি রোমগণ নিদ্রা ছাড়ি
অদ্যাবধি তেমতি রহিল॥

রূপ—

নবজলধর তনু থীর বিজুরী জনু পীতবসন বনি তায়।
চূড়া পরে শিখিদল বেড়িয়া মালতী মাল সৌরভে মধুকর ধায়॥

শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি ঘুচাইল কুলের ধরমে॥
কিবা সেই মুখশশি উগারে অমিয়ারাশি আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি দ্বিগুণ আগুন উপজায়॥
এতিন ভুবনে যত রসসুধানিধি কত শ্যাম আগে নিছিয়া ফেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেনরূপ রসময় না দেখিলে পরাণে না জীয়ে॥

রস—কৃষ্ণের অধরামৃত, চর্ব্বিত তাম্বুলাদি গ্রহণে উদ্ভুত।

গন্ধ—কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, অঙ্গ লিপ্ত অগুরু-চন্দনাদির গন্ধ, কণ্ঠবিলম্বিত অথবা চূড়াবেষ্টিত মালতী মাল্যাদির গন্ধ, শ্রীচরণ-লিপ্ত তুলসীর গন্ধ।

সম্বন্ধ—বংশ, রূপ, গুণাদির গৌরব।

কে বর্ণিবে বল তাথে, গিরি ধরে বাম হাতে, রূপ ত্রিভুবনের মোহন।
জন্ম ব্রজরাজঘরে, গুণ লেখা কেবা করে, লীলা চমৎকারের কারণ॥
সখি হেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার মুরলী শুনি, হেন কে রমণী মণি, যে করয়ে ধৈর্য্য সম্বরণ॥

অভিমান—পৃথিবীতে অনেক অপূর্ব্ব বস্তু আছে; তাহার মধ্যে এইটিই আমার প্রার্থনীয়, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম অভিমান।

তদীয় বিশেষ—কৃষ্ণের চরণচিহ্ন, বৃন্দাবন, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন।

উপমা—এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্য। কৃষ্ণের সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য—নবজলধর, তমাল প্রভৃতি।

স্বভাব—যাহা স্বতঃই উদ্ভূত হয়। স্বভাব দুই রূপ—নিসর্গ ও স্বরূপ।

নিসর্গ—দৃঢ় অভ্যাস বশতঃ যে সংস্কার। পুনঃ পুনঃ দর্শন, পুনঃ পুনঃ গুণশ্রবণাদিজনিত।

স্বরূপ—অহৈতুকী রতি। স্বতঃসিদ্ধ ভাব। ইহার তিন রূপ—কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ, কৃষ্ণ-ললনানিষ্ঠ।

কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ—দৈত্য ভিন্ন অন্য ভক্তগণের লভ্য। রমণীরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া দেবনারীগণ সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ললনানিষ্ঠ স্বরূপ—স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হয়। কৃষ্ণকে না দেখিয়া, কৃষ্ণকথা না শুনিয়াও কৃষ্ণে রতি হয়। ব্রজসুন্দরীগণের স্বভাব সিদ্ধ রতি।

উভয়নিষ্ঠ—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয়ার যেই স্বরূপ হয়।
উভয়নিষ্ঠ বলি তারে কবিগণ কয়॥

রস ও ভাব নিত্যসিদ্ধ। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—রসহীন ভাব বা ভাবহীন রস থাকে না।

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ।
পরস্পরকৃতাসিদ্ধি রনয়োঃ রসভাবয়োঃ॥

রসে ভাবে ভেদও আছে, অভেদও আছে। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

রস অখণ্ড, রস স্বপ্রকাশ, আনন্দ চিন্ময় এবং বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য। সীতার বনবাস যাত্রা শুনিতেছি। অধ্যাপক, কৃষক, বণিক্, ব্যবহারাজীব, শিল্পী, এমন কি নগরপাল পর্য্যন্ত সকলে মিলিয়া শুনিতেছি। তন্ময় হইয়া গিয়াছি, শোকে বিহ্বল হইয়া আপনা হারাইয়াছি। স্বভাব ভুলিয়াছি, বেদান্তরস্পর্শশূন্য হইয়াছি। বিশ্বনাথ কবিরাজ ইহার নাম দিয়াছেন—"সাধারণীকৃতিঃ"। ইহাই সাহিত্য, সহিতের মিলন।

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ।"

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সাধারণী করণের ব্যাখ্যায় বৈশিষ্ট্য আছে। অপর আলঙ্কারিকগণের সাধারণী করণে রাম সীতাদি তাঁহাদের স্বকীয়ত্ব হারাইয়া সাধারণ পুরুষ বা নারী মাত্রে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পুরুষ মাত্রে পর্য্যবসিত হন না। পরিকরগণও বৈশিষ্ট্য হারান না। এরূপ অঘটন ঘটিলে কৃষ্ণরতির অস্তিত্বই থাকে না। কৃষ্ণ বিষয়িণী রতি বা ভক্তি বিলুপ্ত হইলে ভক্তির রসতাপত্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। গৌড়ীয় মতে কৃষ্ণ রতির অচিন্ত্যশক্তিতে বিভাবাদির বৈশিষ্ট্য এবং এই বিশিষ্টতা বশত রতিরও যে বৈশিষ্ট্য তাহার মূল কৃষ্ণ রতির প্রভাব। মূলে ভেদ নাই, ভিন্নতা নাই, তাই রতি ও বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যেও ভেদ ভিন্নতা নাই। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই সাধারণী করণ হইয়া থাকে।

এই ভাবেই সাধারণকে সম্মিলিত করিবার জন্য, তাহাদের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য, এই সাধারণী-কৃতি-সাধনের জন্যই, শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণের মধ্যে শ্রীভগবানের ভাবরসময়ী নাম, গুণ, লীলা-কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই অবস্থায়—

"পরস্ত ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

যাহা পরস্ব হইয়াও পরের নয়, নিজস্ব হইয়াও আমার নয়, অথচ বিভাবাদি সহযোগে আস্বাদনে যাহার কোন পরিচ্ছেদও নাই, তাহাই আনন্দ, ইহাই চমৎকৃতি। ইহাই রস ও ভাবের স্বভাব। ইহাই লৌকিক। সাহিত্যে ইহাই ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর অর্থাৎ তাহারই সদৃশ। এখানে তন্ময়ত্বাংশেই তুল্যতা। স্বরূপে তুল্যতা নাই। ব্রহ্মাস্বাদ অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তুর আস্বাদন। লৌকিকীরতি ও লৌকিক বিভাবাদি কিন্তু অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু নহে। এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর সংযোগজাত রসও হইবে প্রাকৃত রস। তথাপি এই রসকে যে অলৌকিক বলা হইয়াছে তাহার কারণ কাব্যরসের আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায় লৌকিক জগতে তাহা দুর্লভ। কিন্তু রতি ও বিভাবাদি লৌকিক বলিয়া তাহা হইতে রসও হইবে লৌকিক। লৌকিক জগতে বিরলদৃষ্ট বস্তুকে অলৌকিক বলাব রীতি আছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কথিত ভক্তিরস অলৌকিক, কেন না তাহা অপ্রাকৃত ও মায়াতীত। ইহার বিষয় এবং আশ্রয়ও অপ্রাকৃত মায়াতীত চিদ্‌বস্তু, সুতরাং অলৌকিক। লৌকিক সাহিত্যের রস আস্বাদনের আনন্দ ও তন্ময়তাও এইরূপ ক্ষণস্থায়ী। অগ্নিসংস্পর্শ জনিত লৌহপিণ্ডের যে রূপান্তর তাহা কতক্ষণ থাকে, অগ্নিসঞ্চারিত দাহিকা শক্তি তো ক্ষণ পরেই নির্ব্বাপিত হয়। কিন্তু হৃদয়ে ভক্তির রসের অঙ্কুরোদ্গম হইলে এই জনমেই মানবের জন্মান্তর ঘটে, মানব দ্বিজত্ব লাভ করে। ভক্তি রূপ স্পর্শ মণির স্পর্শে মানবের লৌহ হৃদয় চিরকালের জন্যই কাঞ্চনে রূপান্তরিত হয়। অবিচ্ছিন্ন ক্ষীর ধারার মত ভক্তি রস আস্বাদনে শ্রীভগবানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অবিনশ্বর, কল্পান্ত স্থায়ী। এই জন্যই ভক্তির পরিপাক জনিত প্রেমের অপর নাম পঞ্চম পুরুষার্থ।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে
নাধিকং ততম্।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন
গুরুনাপি বিচাল্যতে।

প্রেম সেই অমৃত মধুর শাশ্বত বস্তু। প্রেম সেই চির সনাতন স্থিতি স্থান।

রস যাহার আত্মা, ভাব যাহার শক্তি, শব্দ ও অর্থ যাহার অবয়ব, ধ্বনি যাহার প্রাণ, মাধুর্য্যাদি যাহার গুণ, উপমাদি অলঙ্কার যাহার ভূষণ, রীতি যাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব, ছন্দ যাহার গতি, তাহাই সাহিত্য; সাহিত্যের রসেরও পরকীয়া আছে। জগৎসৃষ্টির বিষয়ে শ্রীভগবানের যেমন তিন শক্তি—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী (সৎ চিৎ ও আনন্দ) অথবা বোধ, স্থিতিশক্তি ও অনুভূতি। সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়েও তেমনই ভাবের অপর তিন রূপ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি।

শব্দের উচ্চারণ মাত্র পরম্পরাগত সংস্কারবশতঃ যাহা সহজে প্রতীত হয়,—সেই মুখ্যার্থবোধক বৃত্তিই **অভিধা**। যাহা চিরপ্রচলিত অভিধানের প্রকাশক তাহাই অভিধা।

মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে যাহার দ্বারা বাচ্যসম্বন্ধযুক্ত অন্য পদার্থবিষয়িণী প্রতীতি জন্মে, তাহাই **লক্ষণা**। অথবা—শক্যার্থের অবিনাভূত অর্থাৎ অসাধারণ সম্বন্ধ বিশেষযুক্ত পদার্থের প্রতীতির নামই লক্ষণা।

অভিধা ও লক্ষণা, আক্ষেপ ও তাৎপর্য্যজনিত বোধ সমাপ্ত হওয়ার পর ধ্বন্যর্থ-বোধের কারণীভূত যে ব্যাপার প্রতীয়মান হয়, তাহারই নাম **বঞ্জনা**। এ বিষয়ের একটি পরিচিত উদাহরণ—গঙ্গায়াং ঘোষঃ। ঘোষ গঙ্গাবাস করিতেছে। অভিধাবৃত্তিতে গঙ্গা বলিতে সুপ্রসিদ্ধা স্রোতস্বিনী বুঝায়। লক্ষণাবৃত্তিতে তাহার তীরভূমি বুঝিতে হয়। কিম্বা নৌকাদির উপর স্থিতি বুঝিতে হয়। কারণ গঙ্গার জলে মানুষ বাস করে না। গঙ্গানীরে বা তীরে বাস করার কারণ তাহার শৈত্যাদিগুণ, তাহার পাবনী শক্তি ইত্যাদি। যে বৃত্তিতে এই গুণ ও শক্তি বুঝাইতেছে, ঘোষের গঙ্গাবাসের কারণ জানাইয়া দিতেছে, তাহাই ব্যঞ্জনা বৃত্তি। কবিকর্ণপুর এই ব্যঞ্জনারই বন্দনা গাহিয়াছেন।

এই ব্যঞ্জনাই সাহিত্য রসের পরকীয়া। পরকীয়া ভাবে রসোল্লাসিতা ব্রজ-কিশোরীগণ শ্রীভগবানের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার আনুগত্যে যে আনন্দ আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা যেমন মথুরা নাগরীগণের তথা দ্বারকাধিষ্ঠাত্রী পট্টমহিষীগণের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ধ্বন্যালোক প্রণেতা আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন, সাহিত্যের ব্যঞ্জনা বেদ্যঅর্থও তেমনই অভিধা এবং লক্ষণার স্বপ্নেরও অতীত।

"তত্র প্রতীয় মানস্য তাবদ্ দ্বৌ ভেদৌ—লৌকিকঃ কাব্য ব্যাপারৈক

গোচরশ্চেতি। লৌকিকঃ যঃ স্বশব্দ বাচ্যতাং কদাচিদ্—ধিশেতে স চ বিধি নিষেধাত্মনেক প্রকারো বস্তু শব্দেনোচ্যতে।

যস্তু স্বপ্নেঽপি ন স্ব শব্দ বাচ্যো ন লৌকিক ব্যবহার পতিতঃ। কিংতু শব্দ সমর্প্যমাণ হৃদয় সংবাদ সুন্দর বিভানুভব সমুচিত প্রাগ্নিবিষ্ট রত্যাদি বাসনানুরাগ সুকুমার স্ব সংবিদানন্দ চর্ব্বণা ব্যাপার রসনীয় রূপো রসঃ স কাব্য ব্যাপারৈক গোচরো রসধ্বনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াত্মেতি।"

(ধ্বন্যালোক ও লোচন পৃ ১৫)

যাহা লৌকিক তাহা কখনো কখনো স্ব শব্দ বাচ্য হয়। শব্দ দ্বারা বলা হইতেছে যে সেই লোকিক প্রতীয়মান বিধি নিষেধাদি অনেক প্রকারের হইতে পারে।

... ...

"তাহাই রস, যাহা স্বপ্নেও কখনো স্ব শব্দ (রস প্রভৃতি শব্দ) বাচ্য নহে। এবং লৌকিক ব্যবহারের অন্তর্গত (পুত্রজন্মাদি জনিত হর্ষতুল্য) নহে। অপিচ যে সমস্ত বিভাব ও অনুভাব শব্দ দ্বারা সমর্পিত হয়-এবং যাহারা হৃদয়ের সহিত মিলনবশতঃ সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠে, সেই সকল বিভাব ও অনুভাবের উপযোগী যে রতি প্রভৃতি বাসনা, যাহারা পূর্ব্ব হইতেই (জন্মাবধি) হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়া আছে, তাহারা উদ্‌বোধিত হয় বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত রস চর্ব্বণের যোগ্যতা লাভ করে। সহৃদয় ব্যক্তির নিজের চিত্তের মধ্যে ইহাদের যে আনন্দময় চর্ব্বণাত্মক ব্যাপার, তদ্দারা আস্বাদ্যমান (রস্যমান) হয় বলিয়াই উহার নাম রস। তাহার নাম রসধ্বনি এবং তাহা একমাত্র কাব্য ব্যাপারের গোচর। তাহাই ধ্বনি এবং মুখ্য বলিয়া তাহাই কাব্যের আত্মা।"

("ধ্বন্যালোক ও লোচন"।—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ)

ধ্বন্যালোক ও লোচনে "ধনন, দ্যোতন, ব্যঞ্জন, প্রত্যায়ন ও অবগমন" প্রভৃতি শব্দ একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উপরোক্ত স্ব শব্দ বাচ্যের অর্থ রস, মাত্র রস এই শব্দের দ্বারা তাহার অভিধা ও লক্ষণাবোধ্য অর্থের দ্বারা বাচ্য

নহে। অবিধা লক্ষণার পক্ষে যে অর্থবোধ স্বপ্নেরও অগোচর, একমাত্র ব্যঞ্জনাই তাহা প্রকাশ করিতে পারে।

নশ্বরজগতে ঘটনা-প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, ক্ষণস্থায়ী জীবনে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কিন্তু "ঘটে যা তা সব সত্য নহে"। "এই ঘটনাবলী ও জীবন-স্রোতের,—এককথায় জগৎ ও জীবনের মূলে যে শাশ্বত সনাতন সত্য চিরস্থির রহিয়াছে, সেই অনির্ব্বচনীয় অবিনশ্বর সত্তাই ভাব ও রসের মিলিত স্বরূপ।" পরকীয়া ভাবেই, ব্যঞ্জনার সাহায্যেই তাহার উপলব্ধি সহজ এবং স্বাভাবিক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পুণ্য জীবন কথা হইতে কাব্যরসের পরকীয়ার দুইটি উদাহরণ দিতেছি। নীলাচলে রথযাত্রা। প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গান করিতেছেন—সামান্যা নায়িকার উক্তি একটি আদি-রসের শ্লোক—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মিলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসী বেতসীতরুতসে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

"যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছেন, সেই আমার অভিমত বর। সেই চৈত্রমাসের রাত্রি; সেই উন্মিলিত মালতী সুরভি প্রৌঢ় কদম্ববন-বায়ু। সেই আমি, সখি, তথাপি আমাদের সুরত-ব্যাপারে বেরা নদীর তীরস্থিত বেতসী তরুতলের জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে"। অভিধার ইহাই অর্থ। লক্ষণা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—কৈশোরের গতদিনের স্মৃতি। সেই চারি চক্ষের সহসা মিলনে সঞ্জাত প্রেম। নর্ম্মদার বেতসীতরুকুঞ্জে সেই বহুপ্রতীক্ষিত ঈপ্সিত প্রথম গমাগম। তাহার পর দীর্ঘদিনের অদর্শন। বহুদিন পরে পুনরায় এই মিলন ইত্যাদি।

সাধারণের সন্দেহ হইল, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখে এই সামান্যা নায়িকার কথা, এই আদিরসের শ্লোক। একমাত্র শ্রীপাদস্বরূপ দামোদরই এই শ্লোকের অর্থ জানিতেন। দৈবাৎ সে বৎসর শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় শ্লোকের ব্যঞ্জনা বুঝিলেন। বুঝিয়া তালপত্রে ভাবানুরূপ শ্লোক লিখিলেন। তালপত্রখানি ব্রহ্ম হরিদাসের কুটীরের চালে রাখিয়া (শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীপাদ সনাতন পুরীধামে আসিয়া ব্রহ্ম হরিদাসের কুটীরেই অবস্থান

করিতেন।) শ্রীরূপ সমুদ্রস্নানে গিয়াছেন, এমন সময় শ্রীজগন্নাথ দেবের উপলভোগ দর্শনান্তে মহাপ্রভু প্রতিদিনের মত ব্রহ্ম হরিদাসের কুটীরে আসিয়া ইতি উতি চাহিতে তালপত্রখানি দেখিতে পাইলেন। তালপত্রে শ্রীরূপ-লিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পাঠ করিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

বহুদিনের অদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায়, তথা হইতে দ্বারকায়। মনে হয় যেন কত যুগ, কত যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে। তাহার পর এই কুরুক্ষেত্রে মিলন। সূর্য্যগ্রহণ, সেইজন্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে তীর্থস্নান উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন। সঙ্গে অগণিত যাদবসৈন্য ; উগ্রসেন, বসুদেব, বলদেব, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদব-প্রধানগণ। জননী দেবকী, রোহিণী ও মহিষী রুক্মিণী আদি পুরমহিলাগণও আছেন। অশ্ব, হস্তী, রথের সংখ্যা নাই। ভারতের রাজন্যমণ্ডলীও তীর্থস্নানে তথা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গেও মর্য্যাদানুরূপ সৈন্যবাহিনী। সংবাদ পাইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন—পিতা নন্দ, জননী যশোমতী, শ্রীদামাদি রাখালগণ এবং অপরাপর গোপ-গোপীবৃন্দ। আর আসিয়াছেন সখীযূথ-পরিবৃতা শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে বহুবাঞ্ছিত মিলনে সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু কোথায় যেন ব্যবধান থাকিয়া গেল। দর্শনে সে তৃপ্তি নাই, মিলনে সে আনন্দ নাই। "ইহা হাতী ঘোড়া রাজবেশ মনুষ্য গহনে" তিনি বৃন্দাবনের জন্য উতলা হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সহচরি, সেই আমার প্রিয় দয়িত শ্রীকৃষ্ণ, তাহার সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। সেই আমি রাধা, সেই আমাদের সঙ্গমসুখ। তথাপি মুরলীর মধুর পঞ্চমে তরঙ্গায়িত অন্তঃপ্রদেশ, কালিন্দীর পুলিন পরিগত ব্রজবনস্থলীর জন্য আমার মনে স্পৃহা জাগিতেছে।" ইহাই মহাপ্রভুর মনোভাব, মহাপ্রভুর পরিগীত শ্লোকের ইহাই ব্যঞ্জনা। ইহাই রসের পরকীয়া ভাব। জগন্নাথদেবকে দেখিয়া শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ে এই কুরুক্ষেত্রমিলনের স্মৃতিই জাগিয়া উঠিত।

যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র।
হেরি পদ্মলোচন সফল হইল জীবন
জুড়াইল তনু মন নেত্র॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

রাধাভাবে বিভাবিত অন্তরের ইহাই পরিচয়।

অন্য একদিনের কথা—গোদাবরীতীর, বিদ্যানগর। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের পথে তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষ্যে রাজমাহেন্দ্রীতে আসিয়াছেন। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছে। মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতেছেন। রায় উত্তর দিতেছেন। মহাপ্রভু এহো বাহ্য, এহো হয়, এহোত্তম বলিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অবশেষে মহাপ্রভুর প্রশ্নের বাঞ্ছিত সদুত্তর মিলিল। রায় বলিলেন, "রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।" মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের কথা তুলিয়া বলিলেন, শ্রীরাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণ গোপনে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইহাতে অন্যাপেক্ষা ছিল। অন্যাপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। তখন রামানন্দ রায় শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইলেন—বাসন্ত রাসে—সকল গোপীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সমান ভাব দেখিয়া শ্রীরাধাই রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার আশা ছাড়িয়া দিয়া শ্রীরাধাকেই খুঁজিয়া ফিরিয়াছিলেন। অবশেষে পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গাইয়াছিলেন। রাম রায়ের উত্তরে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার স্বরূপ ও লীলাতত্ত্বাদি জানিতে চাহিলেন। আদেশমত রায়ও বর্ণন করিয়া চলিলেন। মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন—

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর॥
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

॥ গীত ॥

পহিলগি রাগ নয়নভঙ্গ্য ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠাম কহবি বিছুরহ জনি॥
না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন।
দুঁহুক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমিক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

এই পদ লইয়া এবং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদনের ব্যাপার লইয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মহাকবি কর্ণপূর বলিয়াছেন—"বিষধর সর্প যেমন ফণা তুলিয়া গাড়ুরির (সাপুড়িয়ার) গান শোনে, মহাপ্রভু তেমনই রায় রামানন্দের গান শ্রবণ করিলেন। পরে হয়তো এই ভাব প্রকাশের এখনো সময় হয় নাই, এই ভাবিয়া, অথবা আনন্দে বিবশ হইয়া, স্বহস্তে রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। নিরুপাধি (অকপট) প্রেম কখনো উপাধি (কপটতা) সহ্য করিতে পারে না। এজন্য গানের প্রথমার্দ্ধে শ্রীরাধামাধবের বিশুদ্ধ প্রেমের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকেই সাধ্যসার স্থির করিয়া রায়ের মুখাচ্ছাদন করিয়াছিলেন।" আমাদের মনে হয় কবি কর্ণপূর গূঢ় রহস্য প্রকাশ করেন নাই। আমরা প্রথমে পদের অর্থ বলিয়া মুখাচ্ছাদনের মর্ম্ম যথানুভূতি বিবৃত করিতেছি। এই মুখাচ্ছাদনের মধ্যেই পদের ব্যঞ্জনা নিহিত আছে।

পদের অর্থ। প্রথমেই রাগ—পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল। (ললনানিষ্ঠ প্রেমের ইহাই রীতি, না দেখিয়া না শুনিয়াই প্রেমের উদয় হয়) পরে নয়ন-ভঙ্গীতে পরিচয় ঘটিয়াছিল। (পরিচয়ে প্রেম প্রগাঢ় হইয়া) দিনের পর দিন

বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তাহার অবধি (শেষ) পাওয়া যায় নাই। সে রমণ, আমি রমণী, নহি। (সে ভোক্তা আমি ভোগ্যা-মাত্র নহি। সে রমণ, আমি রমণী এ চেতনাও তখন ছিল না), তথাপি মনোভব আমাদের মনকে পিষ্ট করিয়াছিল। (দুইজনের প্রীতি পরস্পরের মনকে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়াছিল।) সখি, সেই সব প্রেমকাহিনী কানুর নিকট কহিও, যেন ভুলিও না। তখন তো কোন দূতী খুঁজি নাই। অন্য কাহারো অনুসন্ধান করি নাই। দুজনের মিলনে পঞ্চবাণই (মদনই) আমাদের মধ্যস্থ ছিল। এখন তাহার বিরাগে তুমি দূতী হইয়াছ। সুপুরুষের (উত্তম নায়কের) প্রেমের কি এই রীতি। কবি রামানন্দ বলিতেছেন—কৃষ্ণাপরাধে মানিনী—শ্রীরাধার মান রুদ্র (প্রচণ্ড) রাজ্যেশ্বরের মত বর্দ্ধিত হইয়াছে। (প্রচণ্ড মান শ্রীরাধার মনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে) অথবা মহারাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক বর্দ্ধিতমান কবি রামানন্দ রায় ইহা বলিতেছেন।

"না সো রমণ না হাম রমণী,"—কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের একটি শ্লোকেও এই প্রকারের উক্তি আছে। শ্রীরাধার দূতী মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার বক্তব্য বিবৃত করিতেছেন—

অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদীদানীং ব্যবসিতি
স্তথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্ফুরতি ননু চিত্রং কিমপরম্॥

"তুমি যখন বৃন্দাবনে ছিলে, আমি কান্তা, তুমি আমার কান্ত, তখন কি এইরূপ মতি ছিল। মনোবৃত্তি লুপ্ত হওয়ায়, তুমি এবং আমি, আমাদের এই বুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়াছিল। এখন তুমি ভর্ত্তা, আমি তোমার ভার্য্যা, ইদানীং এইরূপ বুদ্ধির উদয়েও দেহে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। (বাঁচিয়া আছি) ইহার পরেও আর কি আশ্চর্য্য আছে" ?

প্রাচীন কবি অমরুর একটি শ্লোকেও এই কথাই পাইতেছি—

তথাঽভূদস্মাকং প্রথমমবিভিন্না তনুরিয়ং
ততোনু ত্বং প্রেয়ানহমপি হতাশা প্রিয়তমা।
ইদানীং নাথ ত্বং বয়মপি কলত্রং কিম পরং
মায়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্॥

"ভালবাসার প্রথমে তো আমাদের দুইজনের দেহও অভিন্ন ছিল। তাহার পর তুমি হইলে প্রেয়, আমি হইলাম তোমার আশাহতা প্রিয়তমা। এখন তুমি হইয়াছ নাথ, আমরা হইয়াছি তোমার বনিতা। না জানি পরে কি আছে! আমার প্রাণ কুলিশ-কঠোর বলিয়াই না এই ফললাভ করিলাম" ?

সুতরাং পদের কথায় এমন অদ্ভুত কিছু নাই, যাহার জন্য মহাপ্রভু রাম রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিতে পারেন। মুখ চাপিয়া ধবিবার কারণ পদের মধ্যেই আছে। এবং তাহা এমন কিছু উদ্ভটও নহে।

রাম রায়ের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-নির্ণয়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভাবেই ভাবিত ছিলেন। অন্তর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাবের পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে উজ্জ্বল ছিল। সমগ্র গৌর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণভাবেব এমন উদ্দাম প্রকাশ আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মহাপ্রভুব নিজের শ্রীমুখবাণীতেই ইহার পরিচয় আছে। রাম রায় বলিতেছেন—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা কবি কহ মোবে তাহাব নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তো।া দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমাব সম্মুখে দেখো কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥
রায় কহে তুমি প্রভু ছার ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন॥
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥
দেখি রামানন্দ হৈল আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥
প্রভু তারে হস্তস্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥
গৌরদেহ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিহোঁ না স্পর্শে অন্যজন॥
তার ভাবে ভাবিত আমি করি চিত্ত মন।
তবে নিজ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা

মহাপ্রভু এখানে পরিষ্কার বলিতেছেন—"এ আমার গৌরদেহ নহে, রাধাঙ্গ-স্পর্শন।" কথা উঠিতে পারে, তুমি না হয় রাধাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছ, কিন্তু শ্রীরাধা? তাই সংশয় দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি পদাবলী-সাহিত্যের দিক হইতে—

রসের পরকীয়া ভাবের দিক হইতে এই উক্তির আলোচনা করিতেছি। ইহা হইতেই পদের ব্যঞ্জনার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রামানন্দ রায়ের পদটি কলহান্তরিতার পদ। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরও পদামৃত-সমুদ্রে পদটি কলহান্তরিতা-পর্যায়েই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এবং টীকায় সেইরূপ ব্যাখ্যাই বিবৃত হইয়াছে। মানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কলহান্তরিতা অবস্থায় আছেন। শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া বলিলেন (পদামৃত-সমুদ্রে 'পহিলহি…' পদের পূর্ব্বে এই পদটি আছে)—

শুন লো রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি॥
মিছাই করলি মান।
তো বিনে জাগল কান॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহাঁ জাগাইলি হরি॥
উলটি করলি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান॥

দূতীর এই ভর্ৎসনাতেই শ্রীরাধা বলিয়াছেন 'পহিলহি…' ইত্যাদি।

এই পদটি গাহিবার পূর্ব্বে রায় বলিয়াছিলেন যে, এক প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত আছে, তাহার কথা শুনিয়া তোমার সুখ হইবে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত অর্থে প্রেমবিলাসের পরিপাক। পরিপাক—প্রগাঢ় অবস্থা। এই বলিয়াই রায় পদটি গাহিয়াছেন। কলহান্তরিতা মানের অন্তর্গত। প্রেম প্রগাঢ় না হইলে মানের উদয় হয় না। প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে মান, মানের পর প্রণয়, তাহা হইতে রাগ, রাগের পর অনুরাগ, তাহার পর ভাব এবং ভাবের পরমাবস্থায় মহাভাবের উদয়।

'সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কয়।' যুবক-যুবতীর অবিনশ্বর ভাব-বন্ধনের নাম প্রেম। প্রেম আনন্দ চিন্ময় রস। স্নেহ—চিদ্দীপদীপন-প্রেম পরমা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া স্নেহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আদরাধিক্যে এই স্নেহের নাম ঘৃতস্নেহ। মদীয়া রতির স্নেহ মধুস্নেহ। শ্রীরাধার মদীয়া রতি।

মান—স্নেহ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া যখন প্রিয়তমের নব নব মাধুর্য্যে উল্লসিত হয়, হৃদয় তখন অদাক্ষিণ্য ধারণ করে; বামতা প্রাপ্ত হয়। কারণে অকারণে প্রিয়তমের প্রতি মানের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ স্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন॥

মান যখন বিশ্রম্ভ দান করে, তখনই তাহার নাম হয় **প্রণয়**। সম্ভ্রমহীনতা এবং বিশ্বাস প্রণয়ের স্বরূপ। বিনয়যুক্ত বিশ্রম্ভ **মৈত্র**, আর ভয়হীন বিশ্রম্ভ **সখ্য** নামে অভিহিত হয়। এই প্রণয় যখন প্রিয়তমের জন্য সকল দুঃখকেই সুখ বলিয়া মানে, তখন তাহা **রাগ** নামে অভিহিত হয়। রাগ দুই প্রকার—নীলিমা ও রক্তিমা। নীলিমা দুই প্রকার—নীলি ও শ্যামা। নীলি অপ্রকাশ, শ্যামা ঈষৎ প্রকাশিত। রক্তিমা দুই প্রকার—কুসুম্ভসম্ভব, মঞ্জিষ্ঠাসম্ভব। কুসুম্ভার রং স্থায়ী নহে। অন্য বস্তুর সঙ্গে স্থায়ী হয়। শ্রীরাধার সঙ্গিনীগণের সঙ্গে এই রাগ স্থায়িত্ব লাভ করে। মাঞ্জিষ্ঠ রাগ চিরস্থায়ী। আপনি বর্দ্ধিত হয়, অন্যাপেক্ষা রাখে না। রাগ যখন নিত্য নবরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়—প্রিয়তমকে মনে হয়—"নব রে নব নিতুই নব" তখনই সেই রাগের নাম হয় **অনুরাগ**। অনুরাগ সকল বৃত্তির আশ্রয়রূপে স্বসংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ আপনাতে আপনি সার্থক হইয়া উঠিলে **ভাব** সংজ্ঞা লাভ করে। এই ভাবের পরমকাষ্ঠা **মহাভাব**। ইহার দুই রূপ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাবের মোহন ও মাদন এই দুইরূপ। মাদন মহাভাব বিরহের অতীত। মোদন বা মোহন-মহাভাবান্বিতা শ্রীরাধার কলহান্তরিতা অবস্থায় দূতীর প্রতি উক্তি ঐ পদ—"পহিলহি রাগ···"।

এখন অতি সাধারণভাবেই রাম রায়ের মুখে মহাপ্রভুর হস্তাচ্ছাদনের কারণ নির্ণীত হইতে পারে। মহাপ্রভু দেখিতেছেন—"একে তো প্রেমের 'অহেরিব'—সর্পের মত গতি অতি কুটিল। তাহার উপর যে কাঞ্চন-পঞ্চালিকা—স্বর্ণপুত্তলিকা তাহার গৌর-কান্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন,—তিনি তো সহজেই অভিমানিনী বামা। কি জানি এই কলহান্তরিতার পদ শুনিয়া যদি তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হয়, তিনি বাঁকিয়া বসেন, এ মানিনীকে প্রকৃতিস্থ করিব কোন্ উপায়ে? তাহা হইলে তো এ ঠাট্ট এখনই ছাড়িতে হইবে। এই নাম প্রেম প্রচারের হাট এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহা হইলে প্রিয়তমার ঋণ পরিশোধের সকল সম্ভাবনারই বিলুপ্তি ঘটিবে। আর আমার

রসাস্বাদনের আশাও আকাশে মিলাইবে।" তাই মহাপ্রভু রাম রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন—"এ গান এখনই বন্ধ কর। আর কিছু বলিও না।" এই পদের, শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্তৃক রাম রায়ের মুখাচ্ছাদনের ইহাই ব্যঞ্জনা।

রাম রায়ের পদটি যেমন ভাব-সম্পদে উৎকৃষ্ট, মহাপ্রভুর পূর্ব্বোল্লিখিত রাধা ভাবের এবং এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভাবের প্রগাঢ়তা—তাঁহার অপূর্ব্ব তন্ময়তাও তেমনই লক্ষণীয়। পদাবলী-সাহিত্য আলোচনার এই দুইটি অধিষ্ঠানভূমি।

এই পদ শুনিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥"

১৭। বৈষ্ণব-পদাবলীর ছন্দ

বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু পদাবলীর ছন্দ লইয়া পৃথক আলোচনা কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। এইজন্য কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য' হইতে বৈষ্ণব-পদাবলীর ছন্দ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কবি কালিদাস এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রধান ছন্দ **পজ্ঝটিকা**।* প্রধানতঃ এই ছন্দে প্রাকৃত ভাষায় কবিতা রচিত হইত। এই ছন্দে চরণে চরণে মিল থাকে। দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের ধ্রুব সন্নিবেশ মানিতে হয় না। প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা এবং প্রত্যেক লঘুস্বরকে একমাত্রা ধরিয়া প্রত্যেক চরণে ষোলটি মাত্রা রাখিলেই চলে। ঐ ষোলমাত্রা চারিটি পর্ব্বে ভাগ করা যায়। দীর্ঘস্বর বেশি থাকিলে অক্ষর সংখ্যা

---

* প্রাকৃতপিঙ্গলে পজ্ঝটিকার বিবিধ রূপকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক পর্ব্ব দীর্ঘস্বর দিয়া আরব্ধ হইলে পজ্ঝটিকাকে বলা হইয়াছে— দোধক।

পিংগ জ-। টা বলি। ঠারিঅ। গঙ্গা॥ ধারিত। ণাঅরি। জেণ অ-। ধংগা॥

চন্দ ক-। লা জস্। সীসহি। ণোক্‌খা॥ সে। তুহ। সংকর। দিজ্জউ। মোক্‌খা॥

লঘুস্বরান্ত শেষ পর্ব্বে দুইটি দীর্ঘস্বরের স্থলে দুইটি লঘুস্বর এবং একটি দীর্ঘস্বর থাকিলে এই দোধকের নাম হয় মোদক।

গজ্জউ মেহ কি অম্বর সাম্বর। ফুল্লউ ণীব কি বুল্লউ ভাম্বর॥

এক্কউ জীঅ পরাহিণ অম্মহ। কীলউ পাউস কীলউ মম্মহ॥

পজ্ঝটিকার দোধকরূপে প্রত্যেক চরণে দুইমাত্রা অতিপর্ব্ব থাকিলে নাম হয় তারক।

ণব—মঞ্জরি লিজ্জিঅ। চূঅহ গাচ্ছে॥ পরি—ফুল্লিঅ কেসু ণ। আ বণ কাচ্ছে॥

জই—এথি দিগংতর। জাই ণহি কংতা। কিঅ—বম্মহ নত্থি কি। ণত্থি বসংতা॥

কেবল প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বের প্রারম্ভে দীর্ঘস্বর থাকিলে এবং বাকি সমস্তে হ্রস্বস্বর থাকিলে পজ্ঝটিকার নাম হয় একাবলী।

সো জণ। জনমউ। সো গুণ-। মন্তউ॥ জে কর। পরউঅ-। আর হ-। সন্তউ॥

জো পুণ। পর উঅ-। আর বি-। রুজ্জুউ॥ তাক জ-॥ ণণি কি ণ থক্কউ। বংঝউ॥ পজ্ঝটিকার শেষাক্ষর ছাড়া যদি সব স্বরগুলি হ্রস্ব হয়—তবে তাহাকে বলে সরভ।

কম থাকে, লঘুস্বর বেশি থাকিলে অক্ষরসংখ্যা বেশি থাকে। "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" (৯ অক্ষর), "নলিনীদলগতজলমতিতরলম্" (১২ অক্ষর) দুইই পজ্ঝটিকার চরণ। স্বরের ধ্রুব সন্নিবেশের নিয়ম না থাকায় এই ছন্দোরচনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। বৈষ্ণব কবিরা স্বাধীনতার পরিসর আরও বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে উদাহরণ দিতেছি—

তাল ফ-। লা দপি। গুরু মতি। সরসম্॥
কিম্ বিফ-। লী কুরু-। যে কুচ। কলসম্॥
সীদতি। সখি মম। হৃদয় ম-। ধীরম্॥
যদভজ। মিহ নহি। গোকুল। বীরম্॥
আঁচর। লেই ব-। দন পর। ঝাঁপে॥
থির নহি। হোয়ত থরথর। কাঁপে॥
হঠপরি। রম্ভনে। নহি নহি। বোল॥
হরি ডরে। হরিণী। হরিহিয়ে। ডোল॥
শিরপর। চাঁদ অ-। ধরপর। মুরলী॥
চলইতে। পন্থে ক-। রয়ে কত। খুরলী॥
সো ধনি। মানি সু-। রত অধি। দেবী॥
তাকর। চরণ ক-। মলপর সেবি॥
তুঁহু বর। নারী চ। তুরবর। কাণ॥
মরকতে। মিলল ক-। নক দশ। বাণ॥

সংস্কৃত চরণের সহিত ব্রজবুলির চরণগুলি মিলাইলে দেখা যাইবে—বৈষ্ণব কবিরা শেষপর্বে অধিকাংশ স্থলে ৪ মাত্রার বদলে ৩ মাত্রা প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া একমাত্রা ধরিয়াছেন। অনেক চরণকে

তরল কমলদল সরিজুঅণঅণা॥ সরঅ সমঅ সসি সুসরিস বঅণা॥
মঅগল করিধর সঅলস গমণী। কমণ সুকিঅ ফল বিহিমঠ রমণী॥

বিদ্যাপতির—কাজরে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন বর। ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর। অনেকটা এইরূপ। বৈষ্ণব কবিদের পজ্ঝটিকার ছন্দে রচিত পদে এই সকল বিশিষ্টরূপের চরণের অবাধ মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। চর্য্যাপদের পজ্ঝটিকার দৃষ্টান্ত—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥

৮+৭ মাত্রায় না পড়িয়া ৭+৮ মাত্রায় পড়িলে সুরের বৈচিত্র্য ঘটে বলিয়া ৭+৮ মাত্রার বিভাগে পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন।

ক্রমে ১৫ মাত্রার পজ্ঝটিকার চরণের শেষপর্ব্বে আরও একটি মাত্রা লুপ্ত হওয়ায় পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নলিখিত চরণগুলি পজ্ঝটিকার পদে দেখা যায়। এইগুলি পয়ারেরও চরণ।

বদনে দশন দিয়া দগধে পরাণ।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান।
না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপে।
জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে।
রসবতি আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ।
দশদিশ দামিনী দহন বিথার॥

পজ্ঝটিকার ১৬ মাত্রা স্থলে ১৪ মাত্রা ধরিলে এবং প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে একমাত্রা ধরিলেই পয়ার হইল। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ উপেক্ষা করায় এবং শব্দের মাঝে যতিদানের প্রথা উঠাইয়া দেওয়ায় পয়ারে পজ্ঝটিকার ছন্দঃস্পন্দ একেবারে লোপ পাইল। "মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট"—ইহাতে যে ছন্দঃস্পন্দ আছে পয়ারে তাহা নাই।

আরও একমাত্রা কমানোতে ইহা নূতন ছন্দের রূপ লাভ করিল। যেমন—

শুন সুন্দর কানু। ব্রজবিহারী।
হৃদি-মন্দিরে রাখি। তোমারে হেরি॥
আহরিণী কুরূপিণী। গোপনারী।
তুমি জগরঞ্জন। মোহন বংশীধারী।

ইহারই অনুরূপ—রবীন্দ্রনাথের—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ছন্দকে বলা হইয়াছে **হাকলি**—

উচ্চউ ছাঅণ। বিমল ধরা। তরুণী ধরিণী। বিনয় পরা॥
বিত্তক পূরল। মুদ্দহরা। বরিসা সমআ। সুকৃথ করা॥

ব্রজবুলিতে রচিত পদের আর একটি প্রধান ছন্দ **প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদী**। এই ছন্দ প্রাকৃতের **মরহট্টা, চউপইআ ও নরেন্দ্রবৃত্তের** মিশ্রণ।* এই ছন্দের প্রত্যেক চরণের প্রথমাংশ পজ্‌ঝটিকা। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে যেমন উপজাতি, নরেন্দ্রবৃত্ত ও মরহট্টার (বা চউপইআ) মিশ্রণে তেমনি এই দীর্ঘ ত্রিপদী। ঠিক পজ্‌ঝটিকার নিয়মেই ব্রজবুলিতে এই ছন্দ রচিত। প্রত্যেক চরণের প্রথমার্দ্ধ—মরহট্টা বা চউপইআর মত ৮+৮ মাত্রা কিংবা নরেন্দ্রবৃত্তের মত ৭+৯ মাত্রায় গঠিত। বৈষ্ণব কবিগণ ছন্দোহিল্লোল ও সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই উভয়বিধ চরণের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত—৮+৮+৮+৪ অথবা ৩।

---

* এই ছন্দগুলির দৃষ্টান্ত প্রাকৃত পিঙ্গল হইতে দেওয়া হইল। বৈষ্ণব কবিগণ অধিকাংশ স্থলে গোড়ার অতিপর্ব্ব দুই মাত্রা বাদ দিয়া থাকেন। প্রথমে মরহট্টার কথা বলি। মরহট্টা—দুইমাত্রা অতিপর্ব্বের (Hyper-metrical) পর—৮+৮+৮+৩ মাত্রায় মরহট্টার চরণ গঠিত।

জই—মিত্ত ধনেসা। সসুর গিরীসা। তহ বিহু পিংধন। দীস।
জই—অমিঅহকন্দা। ণি অলহি চন্দা। তহ বিহু ভোঅন। বীস॥
জই—কণঅসুরঙ্গা। গোরি অবংগা। তহ বিহু ডাকিনি। সঙ্গ।
জো—জস্‌ হি দিআবা। দেব সহাবা। কবহুণ হো তসু। ভঙ্গ॥

চ-উপইআ (২)—৮+৮+৮+৪

কির—ণা বলি কংদা। বন্দিঅ। চংবা।॥ ণঅণহি অণল ফু। রন্তা।
সো—সংপঅ দিজ্জউ। বহু সুহ বিজ্জউ। তুহ্ম ভবানী। কন্তা।

বৈষ্ণব কবিরা পর্ব্বে পর্ব্বে কোথাও মিল দিয়াছেন—কোথাও দেন নাই। চউপইআ ও মরহট্টার বিশেষ প্রভেদ কিছু নাই। মরহট্টার শেষ পর্ব্বে ৩ মাত্রার বদলে ৪ মাত্রা। বৈষ্ণব কবিগণ কোথাও মরহট্টার মত ৩ মাত্রা—কোথাও চউপইআর মত ৪ মাত্রা ধরিয়াছেন। পিঙ্গল এই দুই ছন্দে দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের সুনির্দ্দিষ্ট সমাবেশ পর্ব্বে পর্ব্বে একরূপই রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু ইহা বাধ্যতা-মূলক নয়। বৈষ্ণবকবিকুঞ্জরগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ।

মরহট্টা বা চউপইআর সঙ্গে নরেন্দ্রবৃত্তের মিশ্রণে বৈষ্ণব কবিদের বহু পদ রচিত হইয়াছে। নরেন্দ্রবৃত্তের চরণকে ৭+৯+৮+৪ বা ৩ মাত্রায় ভাগ করা হয়। প্রাকৃত কবি এই ছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের নিয়মিত বিন্যাস করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের নিয়মিত বিন্যাস না করিয়া স্বেচ্ছামূলক বিন্যাস করিয়াছেন এবং মোটের উপর মাত্রা বিভাগ ঠিক রাখিয়াছেন। তাহা ছাড়া

রাধা বদন বি-। লোকন বিকসিত। বিবিধ বিকার বি-। ভঙ্গম্
জলনিধি মিব বিধু-। মণ্ডলদর্শন। তরলিত তুঙ্গ ত-। রঙ্গম্ (জয়দেব)
ভজদবনস্থিতি। মখিল পদে সখি। সপদি বিড়ম্বিত। তুলম্
কলিত সনাতন। কৌতুকমপি তব। হৃদয়ং স্ফুরতি স। শূলম্ (সনাতন)
গিরিবর গুরুয়া। পয়োধর পরশিত। গীম গজ মোতিম। হারা।
কাম কম্বু ভরি। কনয়া শম্ভু পরি-। ঢারত সুরধনী। ধারা ॥ (বিদ্যাপতি)
রজনি কাজর বম। ভীমভুজঙ্গম। কুলিশ পড়য়ে দুর। বার
গরজ তরজ ঘন। রোষে বরিষ ঘন।- সংশয় পড় অভি। সার
—(গোবিন্দদাস)

আহিরিণী কুরূপিণী। গুণহিনী অভাগিনী। কাহে লাগি তাহে বিষ। পিয়বি।
চন্দ্রাবলী মুখ। চন্দ্রসুধারস। পিবি পিবি যুগে যুগে। জিয়বি। (চন্দ্রশেখর)
৭+৯+৮+৪ অথবা—৩—নরেন্দ্রবৃত্তের চরণ।

নরেন্দ্রবৃত্তে তাঁহারা পৃথক পদ রচনা না করিয়া অধিকাংশ স্থলে মরহট্টা বা চউপইআর সঙ্গে নরেন্দ্রবৃত্তের চরণ মিশাইয়াছেন। প্রাকৃত পিঙ্গলে নরেন্দ্রবৃত্তের দৃষ্টান্ত—

৭+৯+৮+৪—ফুল্লিঅ কেসু। চন্দ তহ পঅলিঅ। মঞ্জরি তেজ্জউ। চূআ।
দক্খিণ বাউ। সী অ ভউ পবহই। কম্প বিয়োইণি। হীআ।
কেঅই ধুলি। সব্ব দিস পসরই। পীঅর সব্বউ। ভাসে।
আউ বসন্ত। কাই সহি করিঅই। কন্ত ন থক্কই পাশে।

ইহার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—ঐ ছন্দে।

কিংশুক ফুল্ল। চন্দ্র এযে প্রকটিত। মঞ্জরী ত্যজে সহ। কায়ে॥
দক্ষিণ পবন। শীতল হয়ে প্রবাহিত। বিরহিণী কাঁপে বারে। বারে।
কেতকীর পরাগে। ভরিয়া গেল দশদিশ। পীতবাসে তারা যেন। হাসে।
বসন্ত আইল। কি করি বল সখি আজ। কান্ত যে নেই মোর। পাশে।

গগনাঙ্গ ছন্দেও এইরূপ ৭-৯ মাত্রায় পর্ব্বার্দ্ধ গঠিত। পর্ব্ববিভাগ—(১) ভংজিঅ মলঅ। চোল বই ণিবলিঅ। (২) মালব রাঅ। মলঅ গিরি লুক্কিঅ—এইরূপ। ইহাতে নরেন্দ্রবৃত্তের মত দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের ধ্রুব বিন্যাস নাই। বৈষ্ণব কবিরা এই প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে—রবীন্দ্রনাথ প্রাঃ দীঃ ত্রিপদীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

নীল আকাশে। তারক ভাসে। যমুনা গাওত। গান।
পাদপ মরমর। নির্ঝর ঝর ঝর। কুসুমিত বল্লী বি। তান।

এই পদে কবি পর্ব্বে পর্ব্বে মিলও দিয়াছেন। কিন্তু বিনা মিলের চরণেই অধিকাংশ বৈষ্ণব পদ রচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা ধরিয়া অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম পালন করিয়াছেন।

কবিবর রাজ- । হংস জিনি গামিনী চলিলহুঁ সংকেত- গেহা।
অমলা তড়িত- । দণ্ড হেম মঞ্জরী । জিনি অতি সুন্দর। দেহা। (বিদ্যাপতি)
অভিমত কাম। নাম পুন শুনইতে। রোখই গুণদর- । শাই। (কবিশেখর)
লহু লহু মুচকি। হাসি হাসি আয়সি। পুন পুন হেরসি। ফেরি (জ্ঞানদাস)
আঘণ মাস। নাহ হিয় দাহই। শুনইতে হিম কর। নাম।
অঙ্গন গহন। দহন তেল মন্দির। সুন্দরি তুঁহু ভেলি। বাম—(বলরাম)

এই দৃষ্টান্তগুলি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে—বৈষ্ণব কবিরা সুবিধামত কখনও দীর্ঘস্বরকে দু'মাত্রা ধরিয়াছেন—কখনও একমাত্রা ধরিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে হ্রস্বস্বরকেও কোথাও কোথাও দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে পর্ব্বে পর্ব্বে মিলও আছে—এ মিল অবশ্য বাধ্যতামূলক নয়। শেষ পর্ব্বে তিনটি লঘুমাত্রারও সমাবেশ করিয়াছেন। যে চরণে দীর্ঘস্বর বেশি, সেই চরণে ছন্দহিল্লোলের সৃষ্টি হইয়াছে। যে চরণে হ্রস্বমাত্রার সংখ্যা বেশি সে চরণে অক্ষর-বাহুল্য ঘটিয়াছে—ছন্দহিল্লোলের অভাব হইয়াছে। এই ছন্দের চরণে অক্ষর-বাহুল্য ঘটিলে এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণকে উপেক্ষা করিলে ইহা প্রচলিত দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত অংশে ছন্দহিল্লোলহীন প্রচলিত দীর্ঘত্রিপদী ও ছন্দঃস্পন্দময় প্রাকৃত দীর্ঘত্রিপদীর চরণ একসঙ্গে গুম্ফিত হইয়াছে। একমাত্রায় ব্যবহৃত যুক্তাক্ষর না থাকায় ঐ গুম্ফন সম্ভব হইয়াছে।

না দেখিলে প্রাণ কাঁদে। দেখিলে না হিয়া বাঁধে অনুখন মদন ত- । রঙ্গ।
হেরইতে চাঁদমুখ। উপজে চরম সুখ। সুন্দর শ্যামর। অঙ্গ।
চরণে নূপুরধ্বনি। সুমধুর শুনি শুনি। রমণীক ধৈরজ। অন্ত।
ওরূপ সায়রে মন। হিলোলে নয়ন মন। আটকিল রায় ব- । সন্ত।

এই ছন্দের চরণের শেষার্দ্ধকে এক-একটি চরণ ধরিয়া নব ছন্দের রূপ দেওয়া হইয়াছে। যেমন—

এই ছন্দে তিনি খাঁটি বাংলায় গানও লিখিয়াছেন। তাঁহার একটি বিখ্যাত গানের দুই চরণ—

পতন অভ্যুদয়। বন্ধুর পন্থা। যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির-সারথি। তব রথচক্রে। মুখরিত পথ দিন। রাত্রি॥

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে তিনি এই ছন্দে স্তবক-বন্ধনও করিয়াছেন—

মরণ রে—তুঁহু মম শ্যাম স। মান।

মেঘ বরণ তুঝ। মেঘ জটাজুট। রক্তকমল কর। রক্ত অধর পুট।
তাপবিমোচন। করুণা কোর তব। মৃত্যু অমৃত করে। দান।

গণইতে মোতিমা। হারা॥ ছলে পরশিবি কুচ। ভারা। (বিদ্যাপতি)
হাম করলু পরি। হাস॥ তাকর বিরহ হু-। তাশ। (যদুনন্দন)

এই ছন্দকে প্রাকৃত পিঙ্গলে **আভীর** ছন্দ বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—

সুন্দরি গুঞ্জরি। নারী॥ লোঅন দীশ বি-। সারি॥
পীন পওহর। ভার॥ লোলই মোতিম। হার॥

এইরূপ চরণের সঙ্গে পজ্ঝটিকার পুরা চরণের মিল দেওয়াও হয়।

মানয়ে তব পরি-। রম্ভ। প্রেমভরে সুবদনি। তনু জনু স্তম্ভ॥
তোড়ল যব নীবি-। বন্ধ। হরিমুখে। তবহিঁ ম-। নোভব মন্দ॥

এই আভীর ছন্দের চরণই হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-বৈষম্য হারাইয়া দশাক্ষরী লঘু পয়ারে পরিণত হইয়াছে।

আজু কেগো মুরলী বা-। জায়॥ এতো কভু নহে শ্যাম। রায়॥
চণ্ডীদাস মনে মনে। হাসে। এরূপ হইবে কোন। দেশে॥

প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষ পর্ব্বে ৩ বা ৪ মাত্রার স্থলে ৬, ৭ বা ৮ মাত্রা থাকিলে তাহাকে **প্রাকৃত দীর্ঘ চৌপদী** বলা যায়। * মাত্রা-নির্ণয়, মাত্রা-বিভাগ ইত্যাদি প্রায় দীর্ঘ ত্রিপদীর মতই।

ভুজপাশে তব। লহ সম্বোধয়ি। আঁখিপাত মম। আসব মোদয়ি।
কোর উপব তুঝ। রোদয়ি রোদযি। নীদ ভবব সব। দেহ।
তুহুঁ নহি বিসরবি। তুহুঁ নহি ছোড়বি। রাধা হৃদয় তু। কবহুঁন তোড়বি।
হিয় হিয় রাখবি। অনুদিন অনুখন। অতুলন তোঁহাব। লেহ।

ইহা পজ্ঝটিকার অন্তরার সঙ্গে প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর স্তবক বন্ধন।

* এই দীর্ঘ চৌপদীর বিবিধরূপ প্রাকৃত পিঙ্গলে বিভিন্ন নামে অভিহিত। সব মাত্রাগুলিকে লঘুস্বরে পরিণত করিলে এবং দুইমাত্রা অতিপর্ব্ব যোগ করিলে হয় জলহরণা।

চলু—দমকি দমকি বলু। চলই পইক বলু। ধুলকি ধুলকি করি। করি চলিআ।
বর—মনু সঅল কমল। বিপখ হিঅঅ সল। হমীর বীর জব। রণ চলিআ।

প্রত্যেক পর্ব্বার্দ্ধ দীর্ঘস্বরের দ্বারা আরব্ধ হইলে চউবোলা।

রে ধনি মত্ত ম। তংগজগামিনি। খংজন লোঅণি। চন্দ্রমুহী।
চংচল জুব্বণ। জাত ণ জানহি। ছইল সমপ্পহি। কা ই নহী।

দুইটি অতিপর্ব মাত্রার সঙ্গে নিয়মিত দীর্ঘমাত্রার ঘন ঘন প্রয়োগের ফলে হয় পদ্মাবতী

ভঅ—ভংজিঅ বংগা। ভংগু কলিঙ্গা। তেলঙ্গা রণ। মুক্কি চলে।
মর—হট্টা ধিট্টা। লগ গিঅ কট্টা। সোরট্টা ভঅ। পাঅ পলে।

৮+৮+৮+৬, ৭+৯+৮+৬, ৭+৯+৮+৭, ৮+৮+৮+৭, ৮+৮+৮+৮

অধর সুধা ঝরু। মুরলী তরঙ্গিণী। বিগলিত রঙ্গিণী। হৃদয় দুকূল।
মাতল নয়ন। ভ্রমর জনি ভ্রমি ভ্রমি। উড়ত পড়ত শ্রুতি। উতপল ফুল॥
গোরোচন তিলক। চূড়ে বনি চন্দ্রক। বেঢ়ল রমণী মন। মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাস চিতে। নিতিনিতি বিহরই। ইহ নাগর বর। তরুণ তমাল॥
নীল সুলাবণি। অবনী ভরল রূপ। নখমণি দরপণি। তিমির বিনাশে।
রায়বসন্ত মন। সেবই অনুখন। ঐছন চরণ ক। মল-মধু আশে॥

এই ছন্দের চরণের সহিত আভীর, পজ্ঝটিকা ও প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর মিল দেখা যায়।

(১) গোবিন্দদাস মতি। মন্দে
এত সুখ সম্পদে। রহইতে আনমন। যৈছন বামন। ধরলহি চন্দে॥

(২) সে সুখ সম্পদে। শঙ্কর ধ্বনিয়া
সো সুখ সার। সরবস রসিকই। কণ্ঠ হি কণ্ঠ প-। রায়ল বনিয়া॥

(৩) বলয় বিশাল কনক কটি কিঙ্কিণী নূপুর রুনু রুনু বাজে।
গোবিন্দ দাস পহুঁ নিতিনিতি ঐছন বিহরই নবঘন বিপিন-সমাজে॥

এই ছন্দগুলিকে সাধারণভাবে প্রাকৃত চৌপদী নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রাকৃত চৌপদীতে রচিত পদে ঐ সকল বিশিষ্টরূপেব চরণের অবাধ মিশ্রণ থাকে। সেজন্য এই শ্রেণীর ত্রিভংগী ছন্দের সহিত বৈষ্ণব কবিদেব অবলম্বিত ছন্দের মিল বেশি।

শির—কিজ্জিঅ গংগং। গৌরী অধ'গং। হণিঅ অনঙ্গং। পুরদহনম্।
কিঅ—ফণি বই হারং। তিহুঅণ সারং। বন্দিঅ ছারং। রিউমহণম্॥
সুর—সেবিঅ চরণং। মুনিগণ সরণং। ভবভয় হরণং। সূলধরম্।
সা—নন্দিঅ বঅণং। সুন্দর ণ অণং। গিরিবর সঅণং। ণমহ হরম্॥ (ত্রিংগী)

'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে' শ্রীচৈতন্য-স্তবের ছন্দটিও ইহারই বাংলারূপ।

এই ছন্দই অক্ষরমাত্রিক হইয়া অথবা স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হারাইয়া বাংলার দীর্ঘ চৌপদীতে পরিণত হইয়াছে। যেমন—রবীন্দ্রনাথের—

কেদারার পরে চাপি। ভাবি শুধু ফিলসাফি। নিতান্তই চুপিচাপি। মাটির মানুষ।
লেখাত লিখেছি ঢের। এখন পেয়েছি টের। সে কেবল কাগজের। রঙিন ফানুষ।

এই ছন্দের স্তবক-বন্ধনের নিদর্শনও বৈষ্ণব কাব্যে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরহরি চক্রবর্তীর একটি পদ হইতে নিদর্শন উদ্ধৃত করি—

পঞ্চমাত্রার ছন্দ*—পূর্ব্বালোচিত ছন্দগুলিতে যে ভাবে মাত্রা-বিচার হইয়াছে, সেই ভাবের ৫ মাত্রায় ৪টি পর্ব্ব এই ছন্দের প্রত্যেক চরণ।

৫+৫+৫+৫—হরি চরণ। শরণ জয়। দেব কবি -। ভারতী।

বসতু হৃদি। যুবতিরিব। কোমল ক-। লাবতী (জয়দেব)

ইহার স্তবকিত রূপ—জয়দেবের—৫+৫+৫+৫-৫+৫+৪

বদসি যদি। কিঞ্চিদপি। দন্তরুচি-। কৌমুদী॥ হরতি দর। তিমির মতি। ঘোরম্।
স্ফুরদধর। সীধবে। তব বদন। চন্দ্রমা। রোচয়তি। লোচন-চ-। কোরম্॥

বৈষ্ণবকবিগণ এই স্তবকিত রূপেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এ ছন্দের প্রধান কবি শশিশেখর। বৈচিত্র্যের জন্য ৫+৪+৫+৪--৫+৫+৪ মাত্রাতেও স্তবক গঠিত হইয়াছে, অন্তরায় স্থলে স্থলে মিলও দেওয়া হইয়াছে।

১। গ্রাম্যকুল। বালিকা সহজে পশু-। পালিকা।
হাম কিয়ে। শ্যাম উপ-। ভোগ্যা।
রাজকুল-। সম্ভবা। সবসিরুহ-। গৌরবা।
যোগ্যজনে। মিলয়ে জনু। যোগ্যা॥

২। প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি মরিলে হাম করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডাববি অনলে নাহি দাহবি রাখবি দেহ এই বরজ মাঝে।

৩। কান্ত সঞে কলহ করি কঠিন। কুল-কামিনী।
বৈঠি রহু আসি নিজ ধামে।
তবহি পিক পাপিয়া শুক সারী উড়ি আওত
বদন ভরি রটত শ্যাম নামে॥

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন। নিত্যানন্দ বিপদভয়ভঞ্জন,
কঞ্জ নয়ন জিতি খঞ্জন গঞ্জন। চাহনি মনমথ গরব হরে।
ঝলকত দুহুঁ তনু কনক ধরাধর। নটনঘটন পদ ধরত ধরণী পর।
হাস মিলিত মুখ লরত সুধাকর। উচাব বচন জনু অমিয় ঝরে।

গোবিন্দদাস দুই একটি পদে এই দীর্ঘ চৌপদীকে একটি অভিনব রূপ দিয়াছেন। একই মিলের বার বার আবির্ভাবে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

কুঞ্চিত-কেশিনী। নিরুপম-বেশিনী। আবেশিনী। ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী। অঙ্গ তরঙ্গিণী। সাজলি নব নব। রঙ্গিণী রে।

* প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ৫ মাত্রার স্তবকিত ছন্দকে ঝুল্লনা বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই ছন্দের ২য় ও ৪র্থ চরণে দুইটি করিয়া পর্ব্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। ঝুল্লনা—

সাতমাত্রার ছন্দ *—একই রূপ মাত্রাবিচারে সাত মাত্রায় গঠিত তিন পর্ব্ব এবং ৩, ৪ বা ৫ মাত্রায় গঠিত শেষ পর্ব্বের দ্বারা এই ছন্দ রচিত। পর্ব্বের ৭ মাত্রাকে ৩+৪ মাত্রায় উপরিভাগ করা চলে। জয়দেবের—৭+৭+৭+৩।

কিং করিষ্যতি। কিং বদিষ্যতি। সা চিরং বির। হেণ।
কিং জনেন ধ-। নেন কিং মম। জীবিতেন গৃ-। হেণ॥

৭+৭+৭+৪—শ্রীসনাতন। চিত্তমানস। কেলিনীপ ম-। রালে।
মাদৃশাং রতি। রত্র তিষ্ঠতু। সর্ব্বদা তব। বালে॥
নব—মঞ্জ মঞ্জুল। পুঞ্জরঞ্জিত। চূত-কানন। শোহই।
রসা—লাপ কোকিল। কোকিলাকুল। কাকলী মন। মোহই॥

৭+৭+৭+৩—নবীন নীরদ। নীল নীরজ। নীলমণি জিনি। অঙ্গ।
যুবতিচেতন। চোর চূড়হি। মোর পিঞ্ছ বি। ভঙ্গ॥

বিদ্যাপতির 'গেলি কামিনী গজহুগামিনী বিহসী পালটি নেহারি।'

সহস মঅ। মত্ত গঅ। লাখ লখ। পকখরিঅ॥ সাদি দহ। সাজ্জি থে। লস্ত গিং। ছ॥
কোপ্পি পিঅ। জাহিতহি। যাপ্পি জসু। বিমল মহি। জিণই ণহি। কোই তুঅ।
তুলক হিং। দু॥

শিখা—ছন্দও পাঁচ মাত্রায় গঠিত—ইহার সহিত বৈষ্ণব কবিদের ছন্দের মিল আরও ঘনিষ্ঠ।

কুলিঅ মহু। ভমর বহু। রঅণি পহু। কিরণ লহু। অব অব ব-। সন্ত।
মলয় গিরি। কুসুম ধরি। পবন বহ। সহব কহু। সুনুহি সখি। ণিঅল ' হি। কন্ত॥

ভানুসিংহ প্রত্যেক ২য় পর্ব্বে একটি করিয়া মাত্রা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যেমন—

আজু সখি মুহু মুহু। গাহে পিক কুহু কুহু। কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু। দোঁহার পানে চায়।
যুবনপদ বিলসিত। পুলকে হিয়া উলসিত। অবশ তনু অলসিত। মুরছি জনু যায়।

রবীন্দ্রনাথ (১) পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী, (২) একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে, মরি মরি অনঙ্গ দেবতা, (৩) শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে, (৪) আবার মোরে পাগল করে দিবে কে, (৫) মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে—ইত্যাদি কবিতায় এই পাঁচ মাত্রার ছন্দকে নানা বিচিত্ররূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

* প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ছন্দ (১) চর্চরী, (২) মনোহংস, (৩) গীতা, (৪) হরিগীতা।

চর্চরী—পাঅ নেউর ঝংঝণকই। হংস সদ্দ সু। সোহনা॥
খুর থোর থ-। ণগংগ ণচ্চই। মোত্তিদাম ম-। নোহরা॥

গীতা—জহ—ফুল্ল কেঅই। চারু চম্পঅ। চুতমঞ্জরি। বঞ্জুলা।
সব—দীস দীসহ। কেসু কাণণ। পাণ বাউল। ভম্মরা॥

গোবিন্দদাসের 'নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ', রায়শেখরের 'গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই।' কবিশেখরের (বিদ্যাপতির?) 'ঈ' ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' সিংহভূপতির 'মোর বন বন শোর শূনত বাঢ়ত মনমথপীড়'—ইত্যাদি বিখ্যাত পদ এই ছন্দে রচিত।

এই ছন্দের স্তবকিত রূপ—৭+৭, ৭+৭, ৭+৭, ৭+২ (কিংবা ৭+৫)

যবহুঁ পিয়া মঝু। আওনে আওব। দূরে রহি মুঝে। কহি পাঠাওব।
সকল দূখন। তেজি ভূখন। সম্যক সাজব। রে।
লাজ নতি ভয়ে। নিকটে আওব। রসিক ব্রজপতি। হিয়ে সন্তায়ব।
কাম কৌশল। কোপ কাজব। তবহুঁ বাজব। রে। (সিংভূপতি)

নরহরি চক্রবর্ত্তী, ঘনশ্যাম এইরূপ স্তবকগঠনের প্রধান শিল্পী। দৃষ্টান্ত—

গৌর বিধুবর। বরজ সুন্দর। জননী পদধূলি। ধরত শির পর।
করত বিজয় বি-। বাহে ভূসুর। বৃন্দ বলিত সু-। শোহরে।
চরত চৌদল। নাহি ঝলকত। অরুণ বিরণ স-। মুদ্র উচ্ছলত।
মদন মদভর। হরণ সরস শি-। ঙার জনমন। মোহয়ে॥

কেবল দুই মাত্রা অতিপর্ব্ব ছাড়া দুই ছন্দে কোন ভেদ নাই।

হরিণীতা—গগ—গহহি টুক্কিঅ। তরণি লুক্কিঅ। তুরয় তুর অহি যুজ্ঝিয়া
বহ—বহসি মীলিঅ। ধরণি পীলিঅ। অপ্প পরি ণহি। বুঝিয়া॥

পর্ব্বের প্রথমে দীর্ঘস্বরের বদলে ইহাতে হ্রস্বস্বর ইহাই প্রভেদ।

মনোহংস—জহি—ফুল্ল কেসু অ। সোত চম্পঅ। মংজুলা।
সহ—আর কেসর। গন্ধ লুদ্ধউ। ভম্মরা।

ইহাতে একটি পর্ব্বই কম। রবীন্দ্রনাথ ৭এর সহিত ৫ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। (১) বেলা যে প'ড়ে এল জলকে চল, (২) পরানে ভালবাসা কেন গো দিলে রূপ না দিলে, যদি বিধি হে, (৩) এমন দিনে তারে বলা যায়, (৪) গাহিছে কাশীনাথ, নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি ইত্যাদি কবিতায় ৭এর সঙ্গে ৫ মাত্রার সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

চলি—চুঅ কোইল। সাব॥ মহু—মাসপঞ্চম। গাব
মণ—মজ্ঝ বম্মহি। তাব॥ ণহ—কন্ত অজ্জবি। আব

প্রাকৃত পিঙ্গলে তোমর ছন্দের এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। ২—৭+৩

শচীনন্দন দাস ও ঘনশ্যাম দাস বারমাস্যা পদে তোমর ছন্দকে সাত মাত্রার সহিত মিশাইয়া স্তবক গঠন করিয়াছেন।

দেখ—পাপি আঘন। মাস জনু—বিরহতাপ-হু। তাপ।
দর—পাই সুখবিহি। পেল। হিয়ে—কৈছে সহইব। শেল॥

লঘু ত্রিপদী ও চৌপদী *—একই নিয়মে ৬টি মাত্রায় এক এক পর্ব্ব গঠন করিয়া ৩ পর্ব্ব ও একটি ২ বা ৩ মাত্রার উপপর্ব্বে প্রাকৃত লঘু ত্রিপদী চরণ ও ঐরূপ তিন পর্ব্ব ও ৪ বা ৫ মাত্রায় গঠিত এক এক উপপর্ব্বে প্রাকৃত লঘু চৌপদীর চরণ গঠন করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত—

৬+৫+৬+৩—বসতি বিপিন। বিতানে×। ত্যজতি। ললিত। ধাম
৬+৬+৬+৩—লুঠতিধরণি। শয়নে বহু। বিলপতি তব। নাম। (জয়দেব)

৬+৬ } কুর্ব্বতি কিল। কোকিল কুল। উজ্জ্বল কল। নাদম্।
৬+৬ } জৈমিনিরিতি। জৈমিনিরিতি। জল্পতিসবি-। ষাদম্। (সনাতন)

৬+৬+৬+৪ (১) আওত পর। বঞ্চক শঠ। নাগর শত। ঘরিয়া।
রমণী পদ-। যাবক পরি। সব বক্ষসি ধরিয়া॥

৬+৬+৬+৪ (২) স্ফুটচম্পক। দলনিন্দিত। উজ্জ্বল তনু। শোভা।
পদপঙ্কজে। নূপুর বাজে। শেখর মনো। লোভা॥
(শেখর)

হিয়ে—কৈসে সহইহ। শেল ভেল মঝু। প্রাণ পিয়া পর। দেশিয়া।
জনু—ছুটল ফুলশর। ফুটল অন্তর। রহিল তহি পর। বেসিয়া॥

তোমর ছন্দ হইতে গীতাচ্ছন্দে ৪টি শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা অভিসরণ সঙ্গীত মাধুর্য্য বাড়াইয়াছে। শচীনন্দন দাসও ঠিক এইভাবে ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন।

* ইহার অরূপ ছন্দ প্রাকৃত পিঙ্গলে হীর ও ধবলাঙ্গ।

হীর ছন্দে শেষ পর্ব্বে পাঁচ মাত্রা এবং ধবলাঙ্গ ছন্দে দুই মাত্রা। অতএব হীর লঘু চৌপদীর এবং ধবলাঙ্গ লঘু ত্রিপদীর অরূপ। এই দুই ছন্দে দীর্ঘস্বরের নিয়মিত বিন্যাস আছে—বৈষ্ণব কবিদের পদে মোটের উপর পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রাসাম্য রাখা হইয়াছে।

হীর—৬+৬+৬+৫—ধুলি ধবল হক্ক সবল পক্খি পবন পত্তিএ।
কম্প চলই কুম্ম ললই ভূমি ভরই কীর্ত্তিএ।

রবীন্দ্রনাথ ঘন ঘন যুক্তাক্ষর প্রয়োগে হীরছন্দের ছন্দোহিল্লোল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।
কভু—কাষ্ঠলোষ্ট্র ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া কভু—ভূতলজল অন্তরী লঙ্ঘনে লঘুমায়া॥
তব—খনিখনিত্র নখ বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র। তব—পঞ্চভূত বন্ধন কর পঞ্চভূততন্ত্র

ধবলাঙ্গ—৬+৬+৬+২—তরুণ তরণি তবই ধরণি। পবণ বহ খ রা,
লগ ণ হি জল বড় মরু থল। জণ জিঅণ হ। রা॥

এই ৬ মাত্রার ছন্দ ৩ ভাবে বাংলায় রূপ লাভ করিয়াছে। (১) একটি রূপে প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরের জন্য দুই মাত্র ধারা হইয়াছে। যেমন—

৬+৬+৬+৫ (৩) চন্দ্রকোটি। কমল ছোটি। ঐছে বদন। ইন্দুয়া।
মুকুতা পাঁতি। দশন কাঁতি। বচন অমিয়া। সিন্ধুয়া।
(মাধব)

৬+৬+৬+৩ (৪) নব রঙ্গিম। পদ ভঙ্গিম। অঙ্গুলে নখ। চাঁদ।
মাধব ভণ। রমণীমন-। চকোর নিকর। ফাঁদ।

স্তবক—আজু বিপিনে আওত কান। মুরতি মুরত কুসুম বাণ।
জনু জলধর রুচির অঙ্গ ভাঙ নটবর শোহণী।
ঈষৎ হসিত বদন চন্দ। তরুণী নয়ন বয়ন ফন্দ।
বিম্ব অধরে মুরলী খুরলী। ত্রিভুবন মনমোহিনী।

বৈষ্ণব কবিগণ কোথাও অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রায় ধরিয়াছেন—কোথাও কোন কোন দীর্ঘস্বরে হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়াছেন। কোথাও তাঁহারা পর্ব্বের প্রথমাংশে দীর্ঘ মাত্রা, কোথাও দ্বিতীয়াংশে দীর্ঘ মাত্রার ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়—যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বস্বরকে সর্ব্বত্রই দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে। ক্রমে এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বস্বর, ঐকার, ঔকার ছাড়া কোন দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব স্বীকার করা হয় নাই। পরে কোন দীর্ঘস্বরকেই দুই মাত্রা ধরা হয় নাই অর্থাৎ ছন্দ অক্ষর-মাত্রিক হইয়া পড়িয়া একেবারে ছন্দোহিল্লোল হারাইয়াছিল।

পয়ার—পজ্‌ঝটিকা শেষপর্ব্বের দুই মাত্রা এবং হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রার বৈষম্য হারাইয়া চতুর্দ্দশ অক্ষর-মাত্রায় পয়ারে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বেই কতকগুলি চরণ তুলিয়া দেখাইয়াছি—সেগুলি পজ্‌ঝটিকার পদে যেমন সুসমঞ্জস, পয়ারের পদেও তেমনি। চণ্ডীদাস, কবিশেখর, যদুনন্দন ইত্যাদি কবিগণ এবং চৈতন্য-চরিতকারগণ পয়ারে কাব্য রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পয়ারে যুক্তাক্ষরের আতিশয্য নাই—সেজন্য ইহা পজ্‌ঝটিকারই কাছাকাছি।

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিল তব ভেরী আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

(২) কেবল যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বস্বর ও ঐকার ঔকারকে দুই মাত্রা ধরিয়া, যেমন—
পৌষ প্রখর শীত জর্জর ঝিল্লী মুখর রাতি নির্জ্জন গৃহ নিদ্রিত পুরী নির্বাণ দীপ বাতি।

(৩) সকল প্রকার দীর্ঘ স্বরকেই উপেক্ষা করিয়া অক্ষর মাত্রিক ভাবে। যেমন—
বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ ক্ষীরসম স্বাদু নীর।

১। কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী। কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী।

২। এ কবিশেখর কয় না করিহ ডর। গোপনে ভুঞ্জিবে সুখ না জানিবে পর।

ক্রমে এক-এক মাত্রার স্থলে দলে দলে যুক্তাক্ষর পয়ারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পয়ারকে পজ্ঝটিকা হইতে বহুদূরে লইয়া গেল। যেমন—

ভাবাদি অঙ্গজা তিন বৈমুগ্ধ্য চকিত।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত। যদুনন্দন।

তার পর পয়ারের মধ্যে আর একশ্রেণীর চরণ প্রবেশ করিল। এ শ্রেণীর চরণে পাদকমাত্রা (Syllablic) এক এক মাত্রার স্থান অধিকার করিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত হসন্তবর্ণের মিলনে অথবা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে এক একটি পাদকমাত্রা গঠিত। পয়ারের মধ্যেই পাই—

পিঠে দোলে সোনার ঝাঁপা তাহে পাটোর্থোপা।
গলে দোলে বকুল মালা গন্ধরাজ চাঁপা॥ (রামানন্দ)

ইহা যে পয়ার তাহা নিম্নলিখিত রূপ হইতেই বুঝা যাইবে—৮+৬, ৮+৬—

পিঠে দোলে সোনার্ঝাঁপা তাহে পাটোর্থাপ্যা।
গলে দোলে বকুল্মালা গন্ধরাজ চাঁপা॥

এই শ্রেণীর চরণ পয়ারের মধ্যে কিরূপ চলিয়া গিয়াছে, তাহা কৃত্তিবাসের ছন্দোবিশ্লেষণে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এই শ্রেণীর চরণের আতিশয্য কোন পদে ঘটিলেই তাহাকে ধামালী বলা হয়। পয়ারের এই ধামালী-রূপের সূত্রপাত বড়ু চণ্ডীদাস হইতেই হইয়াছে।

কে না বাঁশী। বাএ বড়ায়ি। কালিনী নই। কূলে।
কেনা বাঁশী। বাএ বড়ায়ি। এ গোঠ গো। কূলে।

রবীন্দ্রনাথ অন্তরার পর্ব্বে দুই মাত্রা বাড়াইয়া লিখিয়াছেন—

(১) শুনহ শুনহ বালিকা। রাখ কুসুম মালিকা।
কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুম মঞ্জরী ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি।
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে॥

(২) তুমি—চক্রমুখর মন্দ্রিত। তুমি—বজ্রবহ্নি-বন্দিত।
তব—বস্তুবিশ্ব বক্ষদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।
তব—দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী বিঘ্নবিজয় পন্থ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে লোচনদাস এই ধামালী ছন্দের প্রধান প্রবর্ত্তক।* তারপর ক্রমে এই ছন্দই রামপ্রসাদের রচনার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বাংলা কবিতার প্রধান ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত—

৪+৪+৪+২—রূ-পের্ না-গর্। র-সের সা-গর। উ-দয় হলো। এসে।
না-গ-রী লো-। চ-নের্ মন্ যে। তাইতে গেল। ভেসে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী—পজ্ঝটিকা যে ভাবে পয়ারে পরিণত হইয়াছে, প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীও সেইভাবে সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘ স্বরের মাত্রাগৌরব হারাইয়াও ইহা কেবল অযুক্তাক্ষরের ভূরি প্রয়োগে প্রাকৃত ছন্দের কাছাকাছি ছিল। যেমন—

গোকুল নগর মাঝে। আরো কত নারী আছে।
তাহে কোন না পড়িল। বাধা।
নিরমল কুলখানি। যতনে রেখেছি আমি।
বাঁশী কেন বলে রাধা। রাধা॥

ক্রমে এক একটি মাত্রার স্থলে যুক্তাক্ষরের অবাধ প্রবেশে ইহা প্রাকৃত হইতে দূরবর্ত্তী হইল। যেমন—

মোর নেত্র ভৃঙ্গ পদ্ম। কি কান্তি আনন্দ সদ্ম। কিবা স্ফূর্ত্তি কহত নিশ্চয়।
কহিতে গদ্গদবাণী। পুলকিত অঙ্গখানি। এ যদুনন্দন দাস কয়।

শুধু যুক্তাক্ষর নয় ক্রমে পাদকমাত্রা (স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন+হসন্ত ব্যঞ্জনে গঠিত মাত্রা) প্রবেশ করিয়া ইহার রূপ আরও বদলাইয়া দিল। যেমন—

ইহা অনেকটা বিদ্যাপতির—যব—গোধূলি সময় বেলি।
ধনি—মন্দির বাহির ভেলি;
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।
—ইত্যাদির অনুরূপ।

* চাইলে নয়ন বাঁধা রবে মনচোরা তার রূপ।
হাস্যবয়ান রাঙা নয়ন এই না রসের কূপ॥
চাইলে মেনে মরবি ক্ষেপি কুল সে রবে নাই।
কুলশীল তোর রাখবি যদি থাক না বিরল ঠাঁই॥
কুল খোওয়াবি বাউরি হবি লাগবে রসে। ঢেউ
লোচন বসে রসিক হ'লে বুঝতে পারে কেউ॥

অক্রূর করে তোর দোষ। আমায় কেন কর রোষ।
ইহা যদি কহ দুরা-+চার।
তুই অক্রূর মূর্ত্তি ধরি। কৃষ্ণ নিলি চুরি করি।
অন্যের নয় ঐছে ব্যব-+হার।

পাদকমাত্রার সংখ্যা বাড়িয়া এই ছন্দ ধামালীর দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপ ধরিল।

এমন কেউ ব্যথিত থাকে। কথার ছন্দে খানিক রাখে।
নয়ান ভরি দেখি। রূপ খানি।
লোচনদাসে বলে কেনে। নয়ান দিলি উহার পানে।
কুল মজালি আপনা আ। পনি।

ইহারই বর্ত্তমান রূপ (রবীন্দ্রনাথ)—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে এলাম আমি কোথায় থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে॥
মা তারে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে॥

১৮। পদাবলীর অলঙ্কার

কবিশেখর কালিদাস পদাবলীব ছন্দের মত অলঙ্কার লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাব প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অলঙ্কার লইয়া আলোচনা আছে। আমি গোবিন্দদাসেব অলঙ্কারই গ্রহণ কবিলাম। বাঙ্গালী পদকর্ত্তাদিগেব মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগে গোবিন্দদাস বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পদে প্রায় সমস্ত রকম অলঙ্কাবেব উদাহরণ আছে।

রূপক-মূলক কাব্যলিঙ্গ—

যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু বোপলি শ্যাম জলদরস আশে।
সো অব নয়ন নীব দেই সীঞ্চহ কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥
তব অগেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন অব সুপুরুষ বধ জান।
উচ কুচ চুম্বক সবস পরশ দেই উদ্ঘাটহ নিঠি বাণ॥

শ্লেষ—'কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি·········পূজহ পশুপতি নিজ তনুদান···' ইত্যাদি পদটি শ্লেষের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ—

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি কনকলতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলি কোরে আগোরল কুঞ্জে ভুজঙ্গম রাজ।

শ্লেষ—

যা কর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢল সোই।

অতিশয়োক্তি—

এসখি শ্যাম সিন্ধু করি চোর
কৈছে ধরলি কুচ কনয় কটোর।

মালারূপক—

অধর পঙার দশন মণি মোতি
রোচন তিলক মৈনাকক জোতি।

শ্লেষমূলক বিষমালঙ্কার—

যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু কৃশ কটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
সুন্দরি, ভালে তুহুঁ হরিণ নয়ানি
সো চঞ্চল হরি হিয়া পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি সেয়ানি।

সূক্ষ্ম অলঙ্কার—

বিঘটি মনোরথ আন চলল হরি তাহিঁ দুহি সঙ্কেত রাখি,
কুসুম হার অরু মুকুলিত সরসিজ গোবিন্দদাস এক সাখী।

মালোপমা—

তনু তনু মীলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছন বেড়ল হেম॥
কনকলতায় জনু তরুণ তমাল। নব জলধরে জনু বিজুরি রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ। দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥

সামান্য—

চান্দনি রজনি উজোরোলি গোরি। হরি অভিসার রভসরস ভোরি।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই।
হেরইতে পরিজন লোচন ভুর। রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর।

[জ্যোৎস্নার মধ্যে ধবলবসনা গৌরাঙ্গী রাধিকাকে চেনা যাইতেছে না। যেন রাঙের পুতুল পারদের মধ্যে ডুবিয়াছে।]

রূপক—

(১) বেণুক ফুকে বুকে মদনানল কুল ইন্ধন মাহাজারি।
দরশ পানি দুহুঁ পরশে সোহাগল শ্রমজল জোরন বারি॥
(২) কিয়ে করব কুল দিবস দীপ তুল প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত লাজক জালে আগোল॥
(৩) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাবকদম্ব॥

... ...

চঞ্চল চরণ কমলদলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর।

সাঙ্গরূপক—

'মাধব মনমথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জরজর পন্থ নেহারত তেরা॥'

—ইত্যাদি পদ।

শ্লিষ্ট রূপক—

কিসলয় দহন শেজ অব সাজহ আহুতি চন্দন পঙ্কা।
দ্বিজকুল নাদমন্ত্রে তনু জারব দুরে যাউ প্রেম কলঙ্কা॥

পরম্পরিত রূপক—

অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু॥

ভ্রান্তি—

হরি হরি বোলি ধরনি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে বিহি সঞে মাগয়ে পাখ॥

সমুচ্চয়—

কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল তাহে পুন কুল মরিষাদ।
তাহে পুন হরি সঞে নেহ ঘটালয় তাহে বিঘটন পরমাদ॥

পর্য্যায়োক্ত—

এতহুঁ বিপদে জিউ রহয়ে একান্ত। বুঝলুঁ নেহারত লাজক পন্থ॥

বিশেষোক্তি—

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ। কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম।
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥

ব্যাজস্তুতি—

(১) পুর নাগরি সঞে রসিক শিরোমণি পূরহ মনমথ কেলি।
বনচরি নারি তোহারি গুণ গাওব পূতনিক সঞে মেলি॥

(২) ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দূর।
অযতনে ধনিক মনোরথ পূর॥—ইত্যাদি।

সন্দেহ—

(১) সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরীত॥

গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সংবাদ।
তনু জিবন দুহুঁ ধনিক বিবাদ ॥

(২) ঘন ঘন চুম্বন লুবধ ভেল দুহুঁ বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল কো বিধুমণি কো ইন্দু ॥

মীলিত—

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই ॥

উৎপ্রেক্ষামূলক ব্যতিরেক—

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফান্দ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশি-ষোলকলা ॥

বিনোক্তি—

তনুমন জোরি গোরি তোহে সোঁপল কনয়া জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভনে কনয়া বিহনে মণি কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ ॥

ধ্বনিগর্ভ সামান্য অলঙ্কার—

যাবক চীত চরণ পর লীখই মদনপরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল কানুক আরকত হাত ॥
[রক্তবর্ণ হস্তে আলতার দাগ বুঝা যাইবে না।]

নিদর্শনা—

রসিক শিরোমণি নাগর-নাগরী লীলা স্ফুরব কি মোয়।
জনু বাঙন করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চরব কিয়ে শিখরে ॥
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খোঁজব মিলব কল্পতরু নিকরে।

ব্যতিরেক—

(১) জলদহি জল বিজুরি দিঠিতাপক মরকত কনয় কঠোর।
এ দুহুঁ তনু মন নয়ন রসায়ন নিরুপম নওল কিশোর ॥

(২) ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন মোহন অভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতিলাজ ॥

পরিণাম—

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হউ মঝু গাত॥
যো দরপনে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হউ তছু মাহ॥…ইত্যাদি।

পকাত্মক পর্য্যায়—

মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর মঝু মানস ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার-তটিনি তট কুচ ঘট উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল নাভি সরোবর মাহ।
তাহি লোমাবলি ভুজগি সঙ্গ ভয়ে ত্রিবলি বেণি অবগাহ॥

উপমাত্মক—

নীল অলকাকুল অনিলে হিলোলত নীলতিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শামর সায়রে লখই না পারই কোই॥

শ্লিষ্ট বিরোধাভাস—

তৈখনে দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম।

সংসৃষ্টি—

অব কিয়ে করব উপায়।
কালভুজগ কোরে ছোড়ি মুগধি সখি গমন যুগতি না যুয়ায়॥
চন্দ্রকচারু ফণাগণ মণ্ডিত বিষ বিষমারুণ দীঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে দশনক দংশন মীঠ॥
[বিশেষোক্তি, বিভাবনা, অপহ্নুতি ইত্যাদি অলঙ্কারের মিশ্রণ।]

পুনরুক্তবদাভাসযুক্ত বিরোধাভাস—

বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী স্থরসরিৎ স্রবে নয়নে।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল সোই নয়নবর বয়নে।

উৎপ্রেক্ষা—

ঘনঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর হাসি হাসি তহি পুন হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি মুহরি রাখল কত বেরি॥

ধ্বনিগর্ভ অতিশয়োক্তি—

(১) কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ তুহুঁ পাতুক করি নেল।

(২) আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলুঁ কান।
কতশত কোটি কুসুমশরে জরজর রহত কি যাত পরাণ।

বিষমালঙ্কার—

(১) চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই কৈছে করব অভিসার।
যতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমির পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ ততহিঁ উড়ি যাওত উতপত দীর্ঘ নিশাসে।

(২) যো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ হার ভুজঙ্গম ভেল।

অসঙ্গতি—

পদনখ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি।
অধরহিঁ কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি রাতি। তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
হামারি রোদন অভিলাষ। তুহুঁ কহ গদগদ ভাষ।

একাবলী—

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়য়ই প্রেম করই জনি জান।

রূপকাতিশয়োক্তিমূলক উৎপ্রেক্ষা—

'সো মুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ নয়ন দহন ভেল চন্দ'—ইত্যাদি পদটি।

ভ্রান্তি—

সুন্দরি জানলি তুয়া ভুরভান।
হরিউর মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি তাহে সৌতিনি করি মান। *

---

* এইসঙ্গে আছে—কাহে মিনতি করু কান। তুহুঁ হাম এক পরাণ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন দেখিয়া শ্রীরাধার রোষের অবধি নাই।—এই দুই চরণে কি দারুণ শ্লেষই না ব্যক্ত হইয়াছে কাব্যপ্রকাশে এই অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ আছে—গোবিন্দদাস তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস রচনার উপাদান, উপকরণ, পদ্ধতিরীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সংস্কার অনুসরণ করেন নাই যে তাহা নয়। রূপবর্ণনায় তিনি প্রচলিত উপমান-গুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, অভিসারের আয়োজন-উপকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনা হইতেই লইয়াছেন, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতি-প্রকৃতি বিষয়েও নূতনত্ব কিছুই দেখান নাই; মানভঞ্জন, সম্ভোগ ও বিরহের বর্ণনায় যে মামুলি রীতি আছে তাঁহার রচনায় তাহার বৈতথ্য দেখি না। গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই,—পুরাতন উপাদান উপকরণ লইয়া তিনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। অধিকাংশ পদেই তাঁহার নিজস্ব শক্তির একটা মুদ্রাঙ্ক আছে। তিনি অন্যান্য অনেক কবির মত অনুসারক বা অনুকারক মাত্র নহেন—তিনি একজন স্রষ্টা। পুরাতন উপকরণে তিনি অভিনব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পড়িলে চিরপুরাতন বিষয়বস্তু ও উপাদান যে কি রমণীয় রসঘন রূপ ধরিতে পারে—তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে উপমানগুলি সংস্কৃত কবিরা প্রয়োগ করিয়াছেন—গোবিন্দ-দাস সেই উপাদানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে মামুলী ব্যতিরেক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারা রূপবর্ণনা করিতেন, গোবিন্দদাস তাহা না করিয়া ঐগুলি লইয়া নানা কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বিরহিণী রাধার প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

এত দিনে গগনে অখিণ রহু হিমকর জলদে বিজুরি রহু থীর।
চামরি চমরু নগরে পরবেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফীর॥
মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
এক বিয়াগে বহুত সিধি সাধলি অতয়ে উপখলি রাই॥
কুমুদিনি বৃন্দ দিনহি অব হাসউ বান্ধুলি ধরু নব রঙ্গ।
মোতিম পাঁতি কাঁতি ধরু উজর কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ॥

গোবিন্দদাস বিয়োগের কথা বলিয়া এখানে অবশ্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন —বিদ্যাপতি এখানে বিরহিণী রাধিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কান্তি শোকে দুঃখে ম্লান

জস্‌সেঅ বণো তস্‌সেঅ বেঅনা ভণই তং জণো অলিঅম্
দন্তক্খঅং কবোলে বহুএ বেঅনা সবত্তীণম্॥

[লোকে বলে যার ব্রণ তাহারি বেদনা,—কাজে দেখি ইহা মিথ্যা কথা।
বধুর অধরে হেরি দশনের ক্ষত তবে কেন সপত্নীর ব্যথা?]

হইয়া গিয়াছে—এই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া উপমেয় অপেক্ষা উপমানের প্রাধান্যজনিত ব্যতিরেক অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা শিষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

শরদক শশধর মুখরুচি সোঁপলক হরিণক লোচন লীলা।
কেশ পাশ লয়ে চমরীকে সোঁপল⋯—ইত্যাদি

চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥—ইত্যাদি পদে বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস একটি কৌশলের প্রয়োগ করিয়াছেন। রূপকাত্মক পর্য্যায় অলঙ্কারের সাহায্যে 'মনমথ মকর ডরহিঁ ডর কাতর'—ইত্যাদি পদটিতে কৌশলে মনোমীনের নানা অঙ্গে আশ্রয়ের উল্লেখচ্ছলে রূপবর্ণনার একটি কৌশল দেখাইয়াছেন। 'ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন। নিমগন কতহুঁ রমণি মনোমীন,'—এই রূপকাত্মক পদে কৌশলে কবি কতকগুলি উপমাকে গাঁথিয়াছেন অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনার জন্য। গোবিন্দদাস অনেক সময় বক্তব্যকে জোরালো ও রসালো করিবার জন্য Antlthesis-এর প্রয়োগ করিয়া Emphasis দিয়াছেন। বিদ্যাপতির অনুসরণ হইলেও এই ধরণের রচনারীতি তাঁহার নিজস্ব। ভীতচকিত ভূজগ হেরি,⋯কুলমরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ—ইত্যাদি পদ ইহার দৃষ্টান্ত।

১। যাহে বিনু নিমিখ আধ কত যুগ সম সোঅব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অবহুঁ নাকি নিকসয়ে পুন কিষে দরশন পাব।
২। আনন্দনীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে তবহি পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন সুরতজলধি অবগাহ॥

এগুলিও আলঙ্কারিক কৌশলের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কবি প্রত্যেক পংক্তিকে অলঙ্কৃত ভাবগর্ভ করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনা রসঘন হইয়াছে, অবান্তর কথা একেবারে নাই, তরল সুলভ বাক্যের পদে স্থান হয় নাই—বক্তব্যের ব্যাখ্যান বা বিশদ বিবৃতি পদের মধ্যে নাই—চরণগুলিতে ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন আছে—বাগ্‌বিন্যাসে আতিশয্য নাই—দীনতাও নাই। ইহাতে স্থলে স্থলে প্রসাদগুণের অভাব হয়ত হইয়াছে—কিন্তু রচনা হইয়াছে গাঢ়বন্ধ,—শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিদের ঘনগুম্ফিত শ্লোকের ন্যায়।

কবি চাতুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়ও ঘটাইয়াছেন। এই শ্রেণীর পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতার সহিত মাধুর্য্য-সৃষ্টি এক সংস্কৃত কবিদের মধ্যেই দেখা যায়।

১৯। কীর্ত্তনে বাদ্য

নামকীর্ত্তনে অথবা লীলাকীর্ত্তনে খোল এবং করতালই প্রধান অবলম্বন। কীর্ত্তনে প্রাচীন কালে অন্য অন্য যন্ত্রও ব্যবহৃত হইত। ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এবং পদাবলীর মধ্যে বিবিধ যন্ত্রের উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে, শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গীগণ বিবিধ যন্ত্র সহযোগে গান করিতেছেন, নাচিতেছেন, সুতরাং মৃদঙ্গ ভিন্ন অন্য যন্ত্র ব্যবহার অশাস্ত্রীয় নহে। মৃদঙ্গ নাম শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়—ইহার অঙ্গ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। মৃদঙ্গেরই অপর নাম খোল। পাখোয়াজ এবং মাদল ও মৃদঙ্গ প্রায় এক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। পাখোয়াজ কাষ্ঠনির্ম্মিত। মাদল কাঠেরও হয়, মাটিরও হয়।

আনন্দ মর্দ্দলশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গাখ্যা তার।
কাষ্ঠ মৃত্তিকা নির্ম্মিত এদ্বয় প্রকার॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ

পূর্ব্বে কাঠের খোল ছিল কিনা জানি না। শ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতেই খোল মাটিতেই তৈরী হইতেছে। খোলের দেহটা মাটির, দুই মুখে চর্ম্মের আচ্ছাদন থাকে এবং সমস্ত দেহটা চর্ম্মের দলে ঢাকা থাকে। করতাল কাংস্যনির্ম্মিত হয়। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্প মাল॥
শ্রীচন্দন মালা শোভে সর্ব্ব মর্দ্দলেতে।
নিরন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা বৈসে যাতে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ

সংকীর্ত্তনারম্ভে খোল করতালে মাল্য চন্দন অর্পণ করিতে হয়। খোল করতালে মাল্য চন্দন দিয়া আসরে উপস্থিত পূজনীয় আচার্য্যগণকে ও কীর্ত্তনীয়াগণকে মাল্যাদি দিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে।

খোলের সুর বাঁধা সুর, যে কোন যন্ত্রের সঙ্গে বাজাও, নূতন করিয়া সুর বাঁধিতে হয় না। সকল সুরেই সুর মিলিবে। কীর্ত্তনে যেমন সুরের চারিটি

ধারার উদ্ভব ঘটিয়াছে, খোলেও তেমনি এই চারিটি ধারার অনুরূপ পৃথক পৃথক বাদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যের ভিন্ন ভিন্ন তাল। এই সমস্ত তালের আবার সঙ্গম, লয়, লহর, মাতান্, তেহাই, ফাঁক এবং তাহার পৃথক পৃথক বোল আছে। কীর্ত্তনে যেমন আখর আছে, খোলেও তেমনি কাটান্ আছে। গায়ক যেমন আখরের পর আখর দিয়া অথবা সুরের বিভিন্ন ভঙ্গিতে একই আখরের পুনরাবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে রসের তরঙ্গ সৃষ্টি করেন, বাদকও তেমনি কাটানে সুরের অনুরূপ বাজনার ঢেউ তুলিয়া আসরে ধ্বনির অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বীরভূম, ময়নাডালের নিকুঞ্জ মিত্র ঠাকুর, পায়র গ্রামের জটে কুঞ্জ দাস এবং তাঁহার ছাত্র ইলামবাজারের নিকুঞ্জ বাইতি, মুলুকেব সূর্য্য পাতব, ঠিবে গ্রামের অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-প্রবাসী নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী প্রভৃতি মৃদঙ্গবাদকগণেব নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছি।

২০। কীর্ত্তনে নৃত্য

সংকীর্ত্তনে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মনোহর নৃত্যের কথা বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শ্রীবাস-অঙ্গনে নামসংকীর্ত্তনে, কাজী দলনের দিনে নবদ্বীপের রাজপথে, সন্ন্যাস-গ্রহণের পর অদ্বৈত আচার্য-গৃহে, পুরীধামে রথযাত্রা মহোৎসবে মহাপ্রভুর নৃত্য ধরণীকে ধন্য করিয়াছিল। পদাবলী-সাহিত্যে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। নবদ্বীপে এবং পুরীধামে কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে যাঁহারা নৃত্য করিতেন, তাঁহাদের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ॥

তাঁহার নৃত্যে আনন্দিত মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাঙ আর পাখা॥

মহাপ্রভুর অপর একজন অন্তরঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥

আচার্য্য অদ্বৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই কীর্ত্তনে ও নৃত্যে সমান নিপুণ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র, অদ্বৈতপুত্র অচ্যুত, গোপাল ও কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনঠাকুর এবং খেতরীর ঠাকুর নরোত্তম, যাজী গ্রামের আচার্য্য শ্রীনিবাস প্রভৃতি কীর্ত্তনে ও নর্ত্তনে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রাসনৃত্যের দুইটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অভিজ্ঞ মৃদঙ্গবাদকের মনোহর বাদ্যের সঙ্গে মধুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠে এই পদ এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

খাদারবাটীর বিপিন দাস কীর্ত্তনীয়া নর্ত্তন রাসের সিদ্ধ গায়ক ছিলেন। কাশীমবাজার রাজবাটীতে বৈষ্ণব-সম্মেলনে তাঁহার গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

॥ কানাড়া, মিশ্র—ঝাঁপতাল ॥

চাঁদবদনী নাচত দেখি।
তা তা থোই থোই তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ।
দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ
থোই দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমিকী দ্রিমিকী দ্রিমি
তাক তাক গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি
গড়ি গড়ি তত্তা দ্রিমিত্রা তাতা থোই তিনিকিটি ঝাঁ ॥
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর ;
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচুলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥
যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমনই নাচেন রাই।
মুরলী লুকায় শ্যাম চারিপাশে চাই ॥
সবাই বলে রাইএর জয় নাগর হারিলে।
দুঃখিনী কহিছে গোপীমণ্ডলী হাসালে ॥

॥ কানাড়া, মিশ্র—ঝাঁপতাল ॥

শ্যাম তোমারে নাচতে হবে।
দিগে তা ঝিনে কেটা থোর নাগ ঝিগ ঝাঁ ॥
উড় তাড়া থোই ঝনুর ঝনুর ঝনু
ঝনু ঝনু ঝনু ঝনু।
ধোই ধোই ধোই গিড় গিড় গিড়
গিড গিড গিড গিড় ॥

গিড় ভিত্তা দ্রিমিতা তানা খোরি কাটা ঝাঁ।॥
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল॥
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বায় সপ্তস্বরা রাই রেখে রঙ্গ॥
তুঙ্গবিদ্যা কপিনাস তম্বুরা রঙ্গ দেবী॥
ইন্দুরেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী॥
উদ্ভট তালে যদি হার বনমালী।
চূড়া বাঁশী কেড়ে নিব দিব করতালি॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে রাখিব দুঃখিনী শুনে হাসি॥

বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি প্রাচীনসাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি সেকালে পল্লীসমাজে উৎসবে-পার্ব্বণে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে নৃত্যের প্রচলন ছিল।

সমাপ্ত